স্বাধীনতা যুদ্ধের আলোকে

জিয়া ▪ খালেদা ▪ বিএনপি

অধ্যাপক খোন্দকার মকবুল হোসেন

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতা যুদ্ধের আলোকে

জিয়া : খালেদা : বি. এন. পি.

অধ্যাপক খোন্দকার মকবুল হোসেন

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতা যুদ্ধের আলোকে

জিয়া : খালেদা : বি. এন. পি.

অধ্যাপক খোন্দকার মকবুল হোসেন

জ্ঞান বিতরণী ❑ ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকাল ঃ একুশে বইমেলা ২০০২

প্রকাশক ❑ মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম ❑ জ্ঞান বিতরণী ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) ঢাকা-১১০০ **কম্পিউটার** ❑ বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ☎ ৭১১১৯৯৩ **মুদ্রণ** ❑ স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৪, বাসা বাড়ী লেন, নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০ **প্রচ্ছদ** ❑ মোবারক হোসেন লিটন **স্বত্ব** ❑ লেখক

মূল্য ❑ ২০০ টাকা

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

স্বাধীনতা সংগ্রামের অজেয় সৈনিক

এ দেশের জনগণকে

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

অধ্যাপক খোন্দকার মকবুল হোসেন আমাদের ছেড়ে গেছেন। অনেকটা অসময়ে। একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি হিসেবে এসময়ে তার বড়ো প্রয়োজন ছিল এ সমাজে। চিন্তাভাবনার স্পষ্টতায়, যুক্তিবাদিতার সাহসিকতায় এবং জাতীয়তাবাদী ধারণার অভিভাবকত্বে তার জুড়ি মেলা ভার। তিনি ছিলেন আমাদের আদর্শস্থানীয়।

আমার সাথে তার পরিচয় স্বল্পকালের। এ অল্পসময়ে অবশ্য তাকে চিনতে ভুল হয়নি। খাঁটি সোনা সব কিছুকে ছাড়িয়ে আবির্ভূত হয় আপন গৌরবে। তাই আমার সাথে তার হৃদ্যতা গড়ে উঠে অল্প সময়ে। যে বইটি দেখে তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন তা প্রকাশিত হল তার অবর্তমানে। এ বইটি বাংলাদেশের রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী চেতনার এক স্মারক তূল্য। এ বই-এর মধ্য দিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন এ সমাজে চিরদিন। এ ভূমিকা তার পূণ্যস্মৃতির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ মাত্র। আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের শ্রেষ্ঠস্থানে তাকে অধিষ্ঠিত করুন।

এমাজউদ্দীন আহমদ

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

উপক্রমণিকা

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ কারো সৃষ্ট নয়। জিয়ার ভাষায় : "জাতীয়তাবাদের সৃষ্টিকর্তা জনগণ। এর উত্তরাধিকারীও জনগণ।..... এটা গড়ে উঠেছে শতসহস্র বছর ধরে।" এটা হাজার হাজার বছরের পুরোনো ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে এবং এর সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ধর্ম ও রাজনীতিকে ধারণ করে তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। বৃদ্ধি করেছে তার কলেবর। শক, হূন-দল, পাঠান, মোগল ও ইংরেজ এক কলেবরে লীন হয়ে একে প্রবাহিত ও গতিশীল করেছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে লুট করতে চেয়েছে বাঙালি জাতীয়তা ও একজাতিসত্তার ধূয়া তুলে। অপরদিকে পাকিস্তান- দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে আমাদের চিরন্তন জাতীয়তাবাদকে বিলীন করে দিতে চেয়েছে তারা। এ জাতিসত্তাকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ যুদ্ধ করেছে ১৯৭১ সালে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা। একজাতি বা দ্বিজাতিতত্ত্ব নয়, ভারতে অবস্থিত বহুজাতিতত্ত্বের এক প্রকাশিত রূপ আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ। আমাদের দেশের কোনো কোনো দল দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা তুলে এদেশকে পাকিস্তান বা পাকিস্তানের আদলে আর একটি পাকিস্তান বানাতে চান। আবার এদেশেরই অন্য দল একজাতিতত্ত্ব বা বাঙালি জাতীয়তার নামে বাংলাদেশকে সিকিমের মত ভারতের অঙ্গরাজ্য বানানোর খায়েশ পোষণ করেন। এদেশের একজাতিতত্ত্বের পূজারীর বাঙালি জাতীয়তার নামে ভারতের শাসনাধীনে যাবার জন্য একপায়ে খাড়া হয়ে আছে। আওয়ামী লীগ ও তাদের অনুগত এসব বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত বিজয়কে ও এর জয়কে ভারতের গলায় ও '৭১-এ বন্দীত্ব বরণকারী মুজিবের গলায় তুলে দিতে চায়। আমি আমার এ গ্রন্থে তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে প্রমাণ করেছি, তাদের ভাষণ সত্য নয়। এ ইতিহাস বিকৃতিকে বহু অকাট্য প্রমাণ দিয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছি। অবশ্য রাষ্ট্রপতি জিয়া এ সম্পর্কে বলেছেন যে আমরা যদি স্বাধীনতা না চাইতাম, তবে ভারত কিভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিত, আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধ না করতাম তাহলে আমাদের হয়ে কেউ কি মুক্তিযুদ্ধ করে দিত ? দিত না। তিনি আরো বলেছেন যে সব আওয়ামী লীগের ভাই সাহেবরা বুঝলেন দেশে তো আর কনফেডারেশন হবে না পাকিস্তানের সঙ্গে, তখন ভারতকে বললেন বড়দা তোমরা যুদ্ধ ঘোষণা করে তাড়াতাড়ি দেশটাকে আমাদের হাতে তুলে দাও, তা না হলে দেশটা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে চলে যাবে। আমি এখানে জিয়াউর রহমানের 'স্বাধীন জাতির স্বাধীন উপলব্ধি' হতে কিছু অংশ উদ্ধৃতির মাধ্যমে তার সত্যতা প্রমাণ করতে চাই। "আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা গড়ে

www.nagorikpathagar.org

উঠেছে শত সহস্র বছর ধরে। ... আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের রাজনীতি ছিল না। সেখানে তারা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। আসল কথাটা হল, আওয়ামী লীগ কেবলমাত্র পাকিস্তানের ক্ষমতার গদিতে বসতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, ছাত্রগোষ্ঠী তারা স্বাধীনতা চেয়েছিল। .... মার্চ মাস (১৯৭১) থেকে আওয়ামী লীগের মধ্যে দুটো ডিভিশন হয়ে গিয়েছিল। যারা যুব সমাজের প্রতিনিধি (তাজউদ্দীন, নজরুল, কামরুজ্জামান, ক্যাপটেন মনসুর) তারা বলেছিল স্বাধীনতার কথা। .... আওয়ামী নেতারা চেয়েছিল ক্ষমতার আসন (মুজিব, মোশতাক)।.... চরম অবস্থা মানে স্বাধীনতা যুদ্ধ। আমরা কিন্তু মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম তার জন্য। যুদ্ধকালে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে (দুটো ডিভিশনের মধ্যে স্বাধীনতা বিরোধী ও পাক-ক্ষমতা লোভী শেখ মুজিব, মোশতাক, ফজলুল হক মনি) বারবার চেষ্টা করা হয়েছিল পাকিস্তানীদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে ক্ষমতায় আসার এবং ভারতও সেটাই চেয়েছিল। ভারতেরও চেষ্টা ছিল, অন্ততপক্ষে আমি যতদূর জানি, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে একটা কনফেডারেশনের মত করা, যার মধ্যে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এবং তাদেরই একজন যিনি আজকে (খন্দকার মোশতাক) ইসলামকে বগলদাবা করে চলেছেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত এর মধ্যে ছিলেন।"

সেজন্য ভারত যুদ্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছে, যে কাজ আমরা আর একটু দেরীতে করতে পারতাম তা একটু আগেই হয়েছে। মুজিব সরকার ও হাসিনা সরকার সে ঋণ পরিশোধ করেছে ২৫ বছরের গোপন চুক্তির মাধ্যমে নতজানুনীতি গ্রহণ করে। হাসিনা ঢোল পিটিয়ে বলছে : ভারতই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। তাই আমাকে মুখ্যমন্ত্রী বলুক, দেশকে অঙ্গরাজ্য করুক— তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমি তাদের এ কুৎসিত চরিত্রকে ইতিহাসের আলোকে বর্ণনা করেছি এবং তাদের বিরুদ্ধে জিয়া-খালেদার অবস্থান ও দেশের প্রয়োজনে তারা যেসব ব্যবস্থা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন, এ গ্রন্থে তাও তুলে ধরা হয়েছে। যুদ্ধক্লান্ত পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হতনা। প্রতিরোধের মুখে ও অনাহারে থাকলে এমনিতেই আত্মসমর্পণ করত তারা। তা না করে জয়ের টিকা পরিয়ে দিল ভারতকে মুজিবের আওয়ামী লীগ। এসবও "মুক্তিযুদ্ধের আলোকে জিয়া : খালেদা : বি. এন. পি."–গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

আগেই বলেছি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হাজার বছরের পুরোনো ও বহু জাতিধর্ম দ্বারা পুষ্ট। তাই জিয়া বলেন, "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন শত শত বর্ষ ধরে এ দেশের আপামর জনগণের অন্তরে চির জাগরূক রয়েছে। যুগযুগান্তরের দেশপ্রেমিকদের হৃদয়ের মর্মমূলে নিহিত তাদের সর্ব উৎসাহ, উদ্যোগ ও প্রেরণার উৎস এ দর্শন।" এ দর্শনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে এ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজ কাঠামো হতে ক্লেদ, ময়লা দূর করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজতন্ত্রভিত্তিক তা সমতার মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করে সমাজের কল্যাণ সাধন। জিয়ার

www.nagorikpathagar.org

কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। হয়তো বা তারা এর মাঝেই এক জাতিতত্ত্বের দর্শন খুঁজেছেন এবং সেখানেই স্থিত হতে চেয়েছেন। যেমন, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে দ্বিজাতিতত্ত্বের দর্শনের আলোকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছায় কখনও একা, আবার কখনও দলীয় সঙ্গী নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে দিনের পর দিন বৈঠক করেছেন এবং সাংবাদিকদের তাঁদের অগ্রগতির পক্ষে নানা কথা বলেছেন। তখন তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনকারী বা স্বাধীনতার পক্ষের ছাত্র, কর্মী ও জনগণকে ভাল নজরে দেখেন নি। কখনও বলেছেন ওরা আমাকে ডুবিয়ে মারবে, কখনওবা বিরক্ত হয়ে কর্মীদের পাঞ্জাবী ছিঁড়ে ফেলেছেন। পরিশেষে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে স্ব-ইচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করে নিয়েছিলেন। সে কারণে ৭ মার্চ বক্তৃতা শেষে 'জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান' বলে ভাষণের সমাপ্তি ঘটান মুজিব।

আমার মতে, জয় বাংলা একজাতিতত্ত্বকে সমর্থনকারী, জয় পাকিস্তান-পাকিস্তানের সমর্থনকারী। তাই এ দু'টো শ্লোগানেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান ছিল না। একটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত, অপরটি অখণ্ড পাকিস্তানের সমর্থনসূচক। তার এ দর্শনের সঙ্গে জিয়ার দর্শনের এখানেই কোন মিল ছিল না। সে কারণে জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা দিতে পারেন নি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রবল বাসনাকারী মুজিব তাই স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন নি। আমি এসব আলোচনা করেছি "স্বাধীনতা যুদ্ধের আলোকে জিয়া : খালেদা : বি. এন. পি'–গ্রন্থে। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পলাশীর আম্রকাননের যুদ্ধে পরাজিত সিরাজদ্দৌলা জীবন দিয়ে অনাগত আগ্রাসীদের হাত থেকে সাবধানে থাকার উপদেশ দিলেন, বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন তিনি। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্রাহ্মণ রাজা সেনরা দু'শো বছর ধরে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা বন্ধ করে দেন। সেন রাজাদের হাত থেকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতিকে রক্ষার মশাল নিয়ে ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খিলজী এসে মাত্র ১৭ জন সেনা নিয়ে জনসমর্থনহীন রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করেন। সেনরাজত্ব বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে। সেজন্য ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠার মোহে যখন গাওয়া হয় "হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে", তখন তার মধ্যে আমি সেন রাজাদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ দেখতে পাই, একজাতিসত্তার বিষাক্ত তীর যেন আমাকে তাড়া করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে নিয়ে রাজনীতি শুরু হলো। একজাতিতত্ত্ব বা সর্বভারতীয় জাতীয়তার ধ্বজা নিয়ে একসময়ের বাংলাদেশ আক্রমণকারী বর্গী প্রধান শিবাজীকে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের নায়ক হিসেবে বাংলাদেশে আমদানীর চেষ্টা করেন কুটকুশলী বালগঙ্গাধর তিলক। তখন নটরাজ গিরিশচন্দ্র ঘোষের "নবাব সিরাজদ্দৌলা" নাটক দিয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা" সঙ্গীত দিয়ে তাকে প্রতিহত করা হয়। আমাদের এ দেশেরই একটি দল প্রধানের খায়েশ ডি. এল. রায় রচিত শাজাহান নাটকের "ধনধান্যে

www.nagorikpathagar.org

জীবনীতে এসব আদর্শকে ভিত্তি করে তিনি যে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন— তা আলোচনা করেছি আমি আমার "স্বাধীনতা যুদ্ধের আলোকে জিয়া : খালেদা : বি. এন. পি."-তে। স্বাধীনতার ঘোষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তক, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে স্থায়িত্বদান ও এ-চেতনার আলোকে বাংলাদেশকে পরিচালনা এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শনকে সমাজ, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিযুক্ত ছিলেন রাষ্ট্রপতি জিয়া। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এবং মৃত্যু অবধারিত জেনেও স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রথম ১৫ দিন (প্রবাসী সরকার গঠনের পূর্বপর্যন্ত) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও দেশ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জিয়া ও তার সঙ্গী-সাথীগণ। প্রবাসী সরকার ও জেনারেল ওসমানীর নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে জিয়া মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং তিনটি সামরিক বিভাগের একটি জেড ফোর্সের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন এবং দীর্ঘ নয় মাস বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরিচালনা করেন তিনি। স্বাধীনতার পর এবং '৭৫ সালের আগস্ট পূর্ববর্তীকালে মুজিব সরকারের দুঃশাসনে দেশ যখন যন্ত্রণাকাতর, মৃত্যু, বিভীষিকা, দুর্ভিক্ষ ও আতঙ্কগ্রস্ত জনগণের সমস্ত মৌলিক অধিকার হরণ করে তখন একদলীয় বাকশাল সরকার প্রবর্তন করেন মুজিব। ৪টি পত্রিকা বাদে সব পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং বিচার ব্যবস্থাকে তাঁর অধীনে নেন তিনি। অতঃপর '৭৫-এ কয়েকটি ক্যু, বিদ্রোহ ও বিপ্লব সংঘটিত হয়। মুজিব সরকারের পতন ঘটে। খালেদ মোশাররফ জিয়াকে বন্দী করে বাংলার মসনদে বসেন। সিপাহী জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি পরাজিত হন ও মৃত্যু বরণ করেন। ৭ নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসেন। এ সবই ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে উত্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে আমার এ গ্রন্থে। বি. এন. পি-র প্রতিষ্ঠা ও এর কার্যক্রমকে উদ্ভাসিত করা হয়েছে একই সঙ্গে।

জিয়াউর রহমানের সুরে সুর মিলিয়ে আমিও বলতে চাই জাতীয়তা কারো সৃষ্ট নয়। জিয়াউর রহমান ও তার দল বি. এন. পি. এবং জিয়ার আদর্শে উজ্জীবিত বুদ্ধিজীবিগণ এটি স্বীকারও করেন, বিশ্বাসও করেন। কিন্তু শেখ মুজিবের বাঙালি জাতীয়তায় বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ এটি মুজিব সৃষ্ট বলে মনে করেন। তাঁদের মধ্যে সব কিছুই মুজিবের সৃষ্ট অথবা মুজিব সেসবের স্বপ্ন দ্রষ্টা ছিলেন— এ হীনমানসিকতা কাজ করছে ওঁদের মধ্যে। আমরা জানি, মুজিব উচ্চারিত বাঙালি জাতীয়তার দর্শন ভুল ও বিভ্রান্ত। কারণ বাঙালি জাতীয়তা বাংলাদেশকেই শুধু ধারণ করে নি, এর বিস্তৃতি বহুদূর পর্যন্ত। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত এর সীমানা। তাই বাঙালি জাতীয়তা মুজিববাদীদের অনুভূতিজাত বিষয় হলেও তা সার্বজনীন অনুভূতি নয় এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় দর্শনতো নয়ই। এ হতে পারে না। আমার মনে হয়, মুজিবের এটি একটি বিভ্রান্তি। আমরা উদারভাবে মুজিবের এ বিভ্রান্তিকে মেনে নিলেও তাঁর ভারতের প্রতি অনুগত কর্মকাণ্ড এবং ২৫ বছর মেয়াদী ভারতের সঙ্গে "গোপন উপহার"–নামক গোপন নতজানু চুক্তি

www.nagorikpathagar.org

পুষ্পে ভরা আমাদের এ বসুন্ধরা"—গানটি জাতীয় সঙ্গীত হোক। সেই দিল্লী সম্রাট শাজাহান নাটকের গানটিতেও ছিল সর্বভারতীয় চেতনাবোধ। আমি নিজেই কৌশলে তা পরিহার করে "আমার সোনার বাংলা" সম্পাদনা করি এবং জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও অধ্যাপক ড. মযহারুল ইসলাম তা সমর্থন ও অনুমোদন করে প্রবাসী সরকারকে তা জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করার সুপারিশ করে পাঠিয়ে দেন। আজও ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদীর সমর্থকরা এমনিভাবে আমাদের সার্বভৌমত্বকে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতা ও কেন্দ্রীয় দলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম, ভাসানী, শরৎবসু, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা ও অবিভক্ত বাংলাদেশকে স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৭-এ এনিয়ে আন্দোলন করেন। কিন্তু এ দেশের নেতা শ্যামাপ্রসাদ ও তার দল হিন্দুমহাসভা কংগ্রেস এবং মুসলিমলীগ দলের অধিকাংশ সদস্যের কারণে এদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি— ষড়যন্ত্রই বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। দ্বিখণ্ডিত বাংলাদেশের পূর্বাংশ তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এখন— ১৯৪৭ সালের মার্চে ও ১৯৭১ সালের পূর্বে।

সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম, ভাসানী, শরৎবসু, চিত্তরঞ্জন দাস যে ভূমিকা পালন করেছিলেন— তাজউদ্দীন ও তাঁর সমর্থক একই দলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও সেই ভূমিকা পালন করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য। স্বাধীনতার জন্য অগ্রগামী সেনা স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষক মেজর জিয়া, প্রবাসী সরকারপ্রধান তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকেও দেখেছি আমরা একই ভূমিকা পালন করতে। ইতিহাসকে কেউ লুট করে নিতে পারবে না— তা মিথ্যে করে যে যাই প্রচার করুক না কেন। এ সবই ঘটনা ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা হয়েছে। একই দলের মুজিব যা চাননি, তাজউদ্দীন তাই চেয়েছেন।

শত শত বছরের এদেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতিজাত ও জীবনধারণ প্রণালীজাত একটি মতবাদ যার নাম জাতিসত্তা। এ জাতিসত্তার সঙ্গে সর্বভারতীয় বা নিখিল পাকিস্তানী জাতিসত্তার কোনরূপ মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাকিস্তানী আমলে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, এ্যাডভোকেট মনসুর, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো অনেকেই আন্দোলন করলেন। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন অলি আহাদ, ভাষা মতিন, গাজীউল হক সহ অনেকেই। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন করা হল এবং '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করা হল স্বাধীনতার জন্য। ৬ দফা ১১ দফা আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণে এল স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ। শেখ মুজিবের বন্দীত্ব বরণ, শেখ হাসিনার ১৫০০/= (পনের শত) টাকা বৃত্তি নিয়ে পিতার ৩২ নং ধানমণ্ডিতে

www.nagorikpathagar.org

একাত্তরে কালযাপনের কথা ঘটনাচক্রে লিখতে হয়েছে এ গ্রন্থে। এসে গেছে এসব। মেজর জিয়ার কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা— এসবই আমার গ্রন্থে আভাষিত হয়েছে। কাজেই এদেশের জনগণ সকলেই স্বাধীনতা ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অগ্রসেনা। এঁদের সংখ্যা ২০/২৫ জন হতে পারেন। শেখ মুজিব তাঁদের মধ্যে একজন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই মুজিবকে দেখতে হবে। সকলেই এঁরা জাতীয়তারূপী গাভীকে লালন করে বড় করেছেন। কোন একজন বা মুজিব একা এ দায়িত্ব পালন করেন নি। সকলের পালিত গাভীর দুগ্ধই স্বাধীনতা— যা জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার ফল। এসবকে সঙ্গত কারণেই তুলে ধরতে হয়েছে আমার এ-পুস্তকে। কাজেই কেউ এককভাবে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না এবং অগ্রসেনার তালিকা করে অনেকের সঙ্গে আছে তাঁর নাম— এটি ঐতিহাসিক সত্য। এ সত্য মেনে নিলে কোন বিরোধ থাকে না।

শেখ হাসিনা সমস্ত জয়কে তাঁর পিতা মুজিব ও নিজের বলে ঘোষণা করে বাকশালী স্টাইলে দেশ শাসনের মাধ্যমে দেশের যন্ত্রণা এতই বাড়িয়ে দিয়েছেন যে তাঁর হাত থেকে এখন সকলে মুক্তি চায়। একাত্তর ও একাত্তর পরবর্তিকালের জিয়ার, খালেদার বি. এন. পি.-র সমস্ত জয়কে ছিনিয়ে নিয়ে তিনি তা পিতার গলায় ও নিজের গলায় পড়ে জনগণকে ধোঁকা দিতে চান। তাজউদ্দীনদের জয়মালাকে ভূলুণ্ঠিত করে দিতে চায় তারা। মর্যাদার আসনে না বসিয়ে তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়িত করা হয়। এভাবে জনগণকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে। এতে তাঁর দল ও দলীয় বুদ্ধিজীবী (সকলে নয়) মিথ্যা যুক্তি ও ইতিহাসকে বিকৃত করে তাঁদের গলায় "মিথ্যা জয়ের মালা" পরাতে চাচ্ছেন।

সেজন্য সঠিক ও ইতিহাস সত্য ঘটনার আলোকে সকলের মূল্যায়ন হওয়া উচিত বলে আমি শ্রদ্ধেয় স্যার প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, (প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর)-এর সঙ্গে এ নিয়ে কয়েক দফা আলোচনা করি। ড. এমাজউদ্দীন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সমর্থক একজন বুদ্ধিজীবী এবং মুক্তিযুদ্ধকালে একজন শব্দসৈনিক। স্বাধীনতা উত্তরকালে '৭৫ পূর্বপর্যন্ত মুজিবের শাসন তিনি দেখেছেন, দেখেছেন '৭৫-এর নভেম্বর পরবর্তী জিয়ার শাসন, এরশাদের স্বৈরাচারী শাসন, খালেদার উন্নয়নমূলক ও গণমুখী শাসন। এখন তিনি দেখছেন শেখ হাসিনার নির্যাতনমূলক বাকশালী স্টাইলে ঐক্যমত সরকারের শাসন। এখন দেখছেন তিনি (হাসিনার) ইতিহাস বিকৃতি, দেখছেন তিনি জাতীয় নেতা-কর্মীর অবমূল্যায়ন— সেজন্য মুক্ত বুদ্ধির লেখক ও চিন্তানায়ক ড. এমাজউদ্দীন কলম হাতে তুলে নিয়েছেন। অবশ্য তিনি তাঁর জীবনকালের প্রথম থেকেই একজন জ্ঞানতাপস শিক্ষক ও সুলেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী চেতনা এবং সে কারণে বি. এন. পি. ও খালেদা জিয়ার আদর্শে বিশ্বাসী একজন বলিষ্ঠ সৈনিক। ড. এমাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন, জিয়া, খালেদা ও বি. এন. পি. নিয়ে বহু গ্রন্থ লিখেছেন এবং এলক্ষ্যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের একত্রিত করার জন্য কমিটি, সঙ্ঘ, সংগঠন গড়ে তোলেন তিনি।

www.nagorikpathagar.org

এছাড়া তাঁদের নিয়ে এসব ব্যাপারে আলোচনা, কর্মসূচী প্রণয়ন, মতবিনিময় ও প্রয়োজনীয় পরামর্শদান করে থাকেন। সে কারণে প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আমাদের জাতীয় আদর্শের একজন অগ্রগামী সেনানায়ক। সেজন্য আমি তাঁকে আমাদের আদর্শে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের পথ প্রদর্শক হিসেবে গণ্য করি। তিনি আর পাঁচ জনের চেয়ে বেশি পরিমাণে বি. এন. পি-র প্রতিষ্ঠাতা জিয়া ও খালেদাসহ অনেক নেতা-কর্মীর আদর্শকে লেখনীর মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরে জনমত সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। ড. এমাজউদ্দীন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা, প্রবন্ধ সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এদেশের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হন এবং বি. এন. পি. এবং তার নেতা-কর্মীদের এসব রচনার মাধ্যমে পথ প্রদর্শনও করে থাকেন।

শুধু তাই নয়, আমাদের মত একই আদর্শের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের নিরন্তর উৎসাহদান, তাদের নিয়ে এই আলোকে কাজ ও এসব বুদ্ধিজীবীদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি। তাই তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। জিয়ার ও খালেদার রাজনীতি, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, অর্থনীতি, স্বনির্ভর বাংলাদেশ সম্পর্কে এবং এ নিয়ে লেখার ব্যাপারে আমাদের উৎসাহিত করে যাচ্ছেন ড. এমাজউদ্দীন। তাঁর সঙ্গে বসে এ নিয়ে কথা বললেই বোঝা যায়, লেখনীর মাধ্যমে এ সমাজ, এ দেশ ও বি. এন. পি.-কে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহ দেন তিনি। তাঁর আলোচনার কৌশলই এমনি, আলোচনার মধ্যেই লেখার প্রেরণা সৃষ্টি হয়, সত্যিই তাঁর কারণেই এ ধরনের একটি গ্রন্থ লেখার প্রেরণা বোধ করি। তিনি আমাকে উৎসাহিত করার জন্য তাঁর পারিবারিক পাঠাগার থেকে অনেক গ্রন্থ উপহার দেন। তাঁর নিজের সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থও তার মধ্যে অনেক। সেই গ্রন্থগুলো পড়তে পড়তে এবং নাড়াচাড়া করতে করতে গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা আমার প্রবল হয়, গবেষণাধর্মী মন নিয়ে পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ পড়তে থাকি। এভাবেই সৃষ্টি হয় "স্বাধীনতা যুদ্ধের আলোকে জিয়া : খালেদা : বি. এন. পি."- নামক গ্রন্থটি। ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এর কলেবর। ফলে কয়েক শ পৃষ্ঠার মত একটি গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। এজন্য বলছি, এ গ্রন্থ রচনা ড. এমাজউদ্দীন-এর প্রেরণার এক ফসল। তবে এর ভাল-মন্দ জনগণ তথা জিয়ার আদর্শের সৈনিকদের উপর নির্ভর করছে। আমার এ লেখা ইতিহাসভিত্তিক। তাই এ দেশের জনগণ যদি এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর আলোকে ইতিহাস বিকৃত রচনা, প্রবন্ধ ও তার লেখকদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সত্যকে গ্রহণ করতে পারেন, তাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলেই নিজেকে ধন্য বলে মনে করব।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এবং জিয়া-খালেদার আদর্শ ও কর্মে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবিগণ তাঁদের স্বকীয় লেখনী ও রচনা দ্বারা এ আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং বি. এন. পি. (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল Bangladesh Nationalist Party– B.N.P.)-কে দিক নির্দেশনা দানের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং যেসব গবেষক, গ্রন্থলেখক, প্রবন্ধকার ও পত্র-পত্রিকা এ দায়িত্বপালনে এগিয়ে এসেছেন এটি একটি জাতীয়

www.nagorikpathagar.org

কর্তব্য বলে। এঁদের রচনাশৈলীর আলোকে এবং তথ্য ও তত্ত্ব গ্রহণের মাধ্যমে আমার রচিত এ-পাণ্ডুলিপিকে সমৃদ্ধ করেছি, আলোকিত করেছি, প্রসারিত করেছি, পুষ্ট করেছি। ইতিহাস সমৃদ্ধ ঘটনাগুলোকে আমার রচনার মাঝে উদ্ধৃত করার মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছি। তথাকথিত বিকৃতিকারিগণ তা যেন অস্বীকার করার সাহস না পায় সেজন্য আমার পুস্তকে এসব উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে হয়েছে। জনতার আদালতে একজন আইনজীবী আইনের ধারা, বিষয় ও ঘটনা বুঝিয়ে দিয়ে বিচারককে সঠিক বিষয় জানিয়ে দিয়ে সপক্ষে তাঁর রায় আদায়ের চেষ্টা করেন যেন জনতা সঠিক বিষয় জানতে ও বুঝতে পারেন— একই কারণে আমাকেও প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে হয়েছে। কারণ ইতিহাস ও ঘটনার আলোকে পুষ্ট গ্রন্থসমূহ ও রচনা সম্ভারই পারে স্বকীয় দল, দলনেতা ও দলীয় আদর্শকে তুলে ধরতে। আমরা সত্য সন্ধানের পথে এগিয়ে যাচ্ছি, বিকৃতির ঘোলাজলে মাছ শিকার করতে চাই নি, চাই নি অসত্যের জয় মালা আমাদের গলায় পরতে। অপসংস্কৃতি, পরকীয়াপ্রেমজাত সংস্কৃতি-সাহিত্য, নতজানু চেতনাসম্পন্ন সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী দল ও সুবিধাভোগী ব্যক্তিরাই পারে ইতিহাস বিকৃত রচনা দ্বারা জনতাকে বিপথে চালিত করতে। জিয়ার আদর্শের সৈনিক তা কখনও পারে না। এ সত্য প্রত্যয় তাদের মাঝে জাগিয়ে তুলতে হবে এটিই আমাদের কামনা এবং এ কামনা শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদসহ আমাদের সকলের। আমার সম্পাদিত গ্রন্থ "স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী আমরা" এবং "স্বাধীনতা যুদ্ধের আলোকে জিয়া : খালেদা : বি. এন. পি."-গ্রন্থ দু'টি রচনা এ পথের এক ক্ষুদ্র প্রয়াস। বর্তমান (২০০০) ঘটনা ও হাসিনা সরকারের রাজনীতির ও শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট জনগণ তাদের হাত থেকে মুক্তির জন্য আকুল, সার্বভৌম বাংলাদেশ পাবদা মাছের মত হাঙ্গরের মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে— মহান দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেই হাঙ্গরের মুখ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য ফারাক্কা চুক্তি, ট্রানজিট চুক্তি, তথাকথিত পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তিসহ, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই, লুটপাটসহ নানা নির্যাতন, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও দলীয়করণ এবং ক্ষুধা-অনাহারের বিরুদ্ধে রাতদিন লড়ে চলেছেন। সে কারণে তিনি দেশ-জনগণ ও দলীয় কর্মী ও বুদ্ধিজীবীর আশার প্রদীপ। "স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া" এ-নামে সঙ্গত কারণেই তাকে আখ্যায়িত করেছি আমার উক্ত দু'টি গ্রন্থে। তবে আমার সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থ দু'টি প্রকাশ বেদনায় অস্থির হয়ে আত্মপ্রকাশের দিন গুনছে। কবে এরা মুক্তি পাবে কে জানে।

আওয়ামী বুদ্ধিজীবিগণ হাসিনা ও পরদেশের মদদপুষ্ট হয়ে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করে বিকৃত অসত্য বিবরণ দিয়ে প্রকাশনা জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করে মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেয়ার সবরকম ব্যবস্থা করেছে—অর্থযোগান দাতাগণ তাদের বিকৃত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য অকৃপণ হাতে সরবরাহ করছে তাদের অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। তার সঙ্গে গুছিয়ে দিচ্ছে সেসব বুদ্ধিজীবীদের সংসার, ঘর-বাড়ি, গাড়ি ও বিলাস উপকরণ, দান করছে সরকারী ও বেসরকারী খেতাব ও

www.nagorikpathagar.org

মর্যাদা এবং বি. এন. পি.-র মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, মুক্তিযুদ্ধের শব্দ সৈনিক ও জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের অমুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করা হচ্ছে। রাজাকার বুদ্ধিজীবীদের তাদের দলে আসার জন্য মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচয় দেয়া হচ্ছে— তার প্রমাণ নওগাঁ। নওগাঁর একজন মুক্তিযুদ্ধকালীন চাকুরীজীবী ও পাকহানাদারদের সমর্থনকারী বুদ্ধিজীবী তাদের দলে যোগদান করায় এখনকার তরুণরাই তাকে নিবেদিত প্রাণ মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে জানে, এখানে এসে শিক্ষিত তরুণদের বললে তারা তাই বলবে। অথচ আওয়ামী লীগ তরফ থেকে আমাকে এতই অবাঞ্ছিত ঘোষণা ও অপপ্রচার দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের কোনো অবদান নেই। আমাকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু এখানে আমাদের দলেরই অনেকে তা জানেন না। এ যদি হয় আমাদের অবস্থা, তাহলে মিথ্যের কাছে, বিকৃতির মাঝে শুধু আমিই হারিয়ে যাব না, হারিয়ে যাবে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া, অলি আহমদ, মীর শওকত আলী, ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, ড. বদরুদ্দোজা চৌধুরীসহ সকলেই হারিয়ে যাবেন খালেদা। তা থেকে বাচার একমাত্র পথ সত্যভিত্তিক প্রচুর পরিমাণ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা, প্রকাশ ও তা প্রচারণা এবং সরবরাহের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। ওদের ইতিহাস বিকৃতিকে প্রতিহত করা। এজন্য বুদ্ধিজীবীদের জন্য জাতীয়তাবাদী দল বি. এন. পি.-সহ সকল সমমনা ব্যক্তিদের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এ প্রয়োজন প্রকাশনার ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে। অনেক রাজনৈতিক নেতৃত্ব লেখায় সিদ্ধহস্ত ও বিপ্লব সৃষ্টিকারী; তাঁদের উভয়ক্ষেত্রেই মর্যাদা দান করা কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

সে কারণে আমার বিনীত অনুরোধ বি. এন. পি.-র রাজনীতিতে কিছু বুদ্ধিজীবীকে নেতৃত্বদান ও সকল জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীকে লেখা ও রচনায় উৎসাহিত করার পরিবেশ, আর্থিক সহযোগিতা ও এসব রচনা প্রকাশের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সেগুলো ইতিহাসের সত্য-মিথ্যার ঘোলাজলে হারিয়ে যাবে—যা জাতি ও দলের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এসব তথ্যকে তখন হারামণির সন্ধানে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ খুঁজে বের করলেও, ইতিহাসের যে জঞ্জাল বিকৃতির স্তূপ সৃষ্টি করবে তা থেকে তথ্যগুলো খুঁজে পাওয়া গেলেও সেগুলো আর আপন মহিমায় উজ্জ্বল থাকবে না। তাই এখনই সময়, সেগুলো ধরে রাখার ও সার্বজনীন করার। তার জন্য যা করণীয় তাই করতে হবে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সমর্থকদের যেকোনো মূল্যে একাজ করতে হবে। এতে দ্বিবিধ ফল ফলবে। (১) আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের সেসব কর্ম মিথ্যা প্রমাণিত হবে, ফলে তার দল জনসমর্থন থেকে দূরে সরে যাবে এবং (২) জাতীয়তাবাদী সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতিজাত রচনা ও গ্রন্থাদি সত্য ও ইতিহাসের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে জনসমর্থন লাভে সক্ষম হবে— ফলে বি. এন. পি. জনগণের সমর্থন আগের তুলনায় বেশি পেয়ে সার্বজনীন রূপ লাভ করবে এবং রাজনীতিতে তারা এগিয়ে যাবে অনেক অনেক বেশি। আমি এসব উপদেশ দেয়ার জন্য বলি নি— এটিই বাস্তব. সেজন্য একথাগুলো বলা প্রয়োজন মনে করেছি। তাই বলি, বি. এন. পি.-

www.nagorikpathagar.org

র আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে দু'ধারায় অর্থাৎ দলীয় সংগঠনের মাধ্যমে এবং বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের লেখা ও তা প্রকাশ এবং তাদের আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে এগোতে হবে। সেজন্য এ দু'ধারাকেই ওদের মত অর্থ যোগান ও আনুষঙ্গিক সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন। কারণ আমরা হারিয়ে যেতে পারি না, সত্য প্রকাশের পথে দলীয় রাজনীতিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে, সব অঙ্গনে এর প্রসার ঘটাতে হবে, জাতীয় সংসদে, হাটে-মাঠে, শহরে-বন্দরে গড়ে তুলতে হবে সংগ্রামী দুর্গ। অর্থ বিভবের দিকে নয়, যোগ্য লোকদের যোগ্য স্থানে বসাতে না পারলে আমরা এগিয়ে যেতে পারব না। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের কষ্ট হবে অনেক বেশি। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের আলোকপুষ্ট জিয়ার আদর্শকে এবং স্বাধীনতা ও স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসকে সামনে রেখেই আমাদের এসব কাজ করতে হবে। অন্যথায় আমরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। এখানে একটি কথা বলা দরকার ইসলাম ও ধর্ম-বর্ণ এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই— এ চিন্তা-চেতনাকে সামনে রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতাযুদ্ধের কৃতিত্ব বিনা পরিশ্রমে অন্যে ছিনিয়ে নেবে, এ হতে পারে না।

বুদ্ধিজীবীদের কার্যকরণের অগ্রনায়ক, আমার ও অনেকের বিচেনায়, প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ। তাই বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করার দায়িত্বও তাঁকেই নিতে হবে। আমরাও সবসময় তাকে সহযোগিতা দান করতে প্রস্তুত। ড. এমাজউদ্দীন সাহেবকে আমাদের দলীয় সহযোগিতা ও সাহায্য অবশ্যই করতে হবে— তা না হলে তিনি বা বুদ্ধিজীবিগণ এগিয়ে যেতে পারবেন না। এ কথা মনে রেখে এবং আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের অপসংস্কৃতির দিকে তাকিয়ে তা প্রতিরোধের জন্য আমাদের এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আসন্ন সংসদ নির্বাচনে বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে বিশেষত যেসব বুদ্ধিজীবী ও লেখক রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এখনও সক্রিয় আছেন, তাদের মধ্য থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে কিছু মনোনয়ন দান করা উচিত বলে আমি মনে করি। দেশ ও জনতা সে আদর্শবান ব্যক্তিকে পেয়ে খুশী হবে এবং বিপ্লবী সংগঠক, বাগ্মী ও ইতিহাস সমৃদ্ধ সেসব আদর্শবান ও ত্যাগী ব্যক্তিদের এ যন্ত্রণা কাতর ও অর্থের প্রতি লালসাকাতর যুগে জনগণ তাঁদের সমর্থন করবে এবং বি. এন. পি. বিরোধী দলের ব্যক্তি যদি পরাক্রমশালী হয়, তাহলে তার চেয়েও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বদের সেখানে প্রদান করা উচিত বলে আমি মনে করি। এসবই দলীয় ও জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে করা উচিত।

অবশ্য জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের আলোকে এবং ইতিহাসকে রক্ষা করার প্রয়োজনে এ ব্যাপারে জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়া অত্যন্ত বেশি সচেতন সেকথা উদ্ধৃতির মাধ্যমেই প্রমাণ করতে চাই। প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ তাঁর *রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ* নামক সম্পাদিত গ্রন্থের মুখবন্ধ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, "১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে হাসান হাফিজুর রহমানকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগদান করে এবং ড. মফিজুল্লাহ কবীরকে সভাপতি, ড.

www.nagorikpathagar.org

সালাউদ্দিন আহমদ, ড. আনিসুজ্জামান, ড. এনামুল হক, ড. সফর আলী আখন্দ, ড. কে এম মহসিন, ড. শামসুল হুদা হারুণ ও ড. এম. এ. করিমকে সদস্য নিয়োগ করে জিয়াউর রহমানই এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রায় পাঁচ বছরে সংগৃহীত হয় প্রায় তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিলপত্র। সেগুলো যাচাই-বাছাই করে ১৬ খণ্ডে এসব দলিল প্রকাশিত হয়। জিয়াউর রহমানের এ দূরদর্শিতা ও দেশপ্রেমের তুলনা নেই।"

একই গ্রন্থের ভূমিকায় বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "আমাদের দুর্ভাগ্য এই মহান জাতীয় নেতার কার্যক্রম ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা-সমৃদ্ধ গ্রন্থের স্বল্পতা অত্যন্ত প্রকট, অথচ তাঁর চিন্তা-ভাবনা এবং আদর্শই জাতিকে সুখী ও সমৃদ্ধ হবার সাহস যোগাতে পারে। শক্তিশালী করার উদ্যোগের উৎস হতে পারে। এই লক্ষ্যে আলোচ্য গ্রন্থটি একটি মূল্যবান সংযোজন। আমি এর ব্যাপক প্রচার কামনা করি।"

এ থেকেই জাতীয়তাবাদী সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ ও এ আদর্শের বিবরণ ও তার অগ্রপথিকদের নিয়ে লেখাকে তারা যে উৎসাহিত করেছেন তা বোঝা যায়। সত্যি কথা বলতে কি ড. এমাজউদ্দীনের প্রেরণা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ *জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ* গ্রন্থে খালেদা জিয়া রচিত 'ভূমিকা' হতেও আমি উৎসাহ পেয়েছি। এ কারণে তিনিও জিয়ার মত, বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল জিয়া ও খালেদা দু'জনেই বুদ্ধিজীবী ও তৎসঙ্গে এ আদর্শে বিশ্বাসী লেখকদের রচনাকর্মে উৎসাহিত করেছেন এবং বেগম খালেদা এখনও তা করে যাচ্ছেন। পুনরায় বলি, আমাদের অগ্রপথিকের এ উৎসাহের পথ ধরে জিয়া ও বি. এন. পি.-র আদর্শে বিশ্বাসী রাজনীতিবীদ, ব্যবসায়ী ব্যক্তি ও সচেতন জনগণকে সহযোগিতা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া দরকার। তা না হলে বুদ্ধিজীবী ও লেখকগণ নিজেদের মেধা ও অর্থ খরচ করে বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারবে না।

আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে শ্রদ্ধেয় স্যার প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে একটি ব্যাপারে আংশিকভাবে দ্বিমত পোষণ করছি। তিনি তাঁর উক্ত সম্পাদিত গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন, "আজকের যাঁরা স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে জাতীয় ঐক্যে ভাঙ্গন ধরিয়েও বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না, স্বাধীনতার পরপর তাঁরাই (মুজিব-হাসিনার আওয়ামী লীগ) ছিলেন দেশের কর্ণধার। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের দলিল সংগ্রহ ও সংকলন করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পর্যন্ত তাঁদের দৃষ্টিতে আসেনি।"

প্রফেসর এমাজউদ্দীন একজন আদর্শবান বুদ্ধিজীবী এবং ইতিহাসের সমর্থক। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন গবেষক হিসেবে সহজ সরল মন নিয়ে অনুভব করেছেন যে মুজিব সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধের দলিল সংগ্রহ ও সংকলন করলে হারিয়ে যাওয়া অনেক ঐতিহাসিক সত্যই বেরিয়ে আসত। এখানেই তিনি মনে

www.nagorikpathagar.org

হয় ভুল করেছেন। তাঁরা জানতেন, সেসময় ইতিহাসের দলিল রচনা করলে মুজিব ও মুজিব সমর্থিত আওয়ামী লীগ, ইতিহাসের কষ্টি পাথরে উজ্জ্বল হতে পারত না, স্বাধীনতা বিরোধী অনেক কলঙ্কের ছাপই তাদের গায়ে এসে লাগত। অন্যের জয়ের মালাও তেমনি ছিনিয়ে নিয়ে নিজের গলায় পরতে পারতেন না। জনগণ ইতিহাসের চাক্ষুস বিকৃতি দেখে ও শুনে ঘৃণায়, লজ্জায় তাদের পরিত্যাগ করত। সেজন্য ভাবের মধ্যে থেকে তাঁদের কথা বলেছেন, কৌশলে নিজেদের জয়গান গেয়েছেন। অনেক সময় ও বছর গড়িয়ে যাওয়ার কারণে মিথ্যাকে সত্য বলে চালাতে চাচ্ছেন তাঁরা ও তাঁদের বুদ্ধিজীবীরা। সে কারণে তখন তাঁরা ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের দলিল রচনায় মন দেন নি। এটিই হলো তাদের অভিপ্রায়। এখন যা বলছেন, তখন তা বলা সম্ভব ছিল না। এখন তাঁরা জয়কে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের পিছনে তাঁরা ও তাঁদের পরাশক্তি কোটি কোটি টাকা ঢালছেন— তখন তা পারতেন না। শ্রদ্ধেয় প্রফেসর এটিই এড়িয়ে গেছেন বলে ওকথা বলেছেন। আমার সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন এ বিষয়ে। আর এ কারণেই তখন আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি নি। এজন্য তাঁর কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আমার এ গ্রন্থের নামানুসারে জিয়া, খালেদা ও বি. এন. পি. দল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও দলগুলোর নাম এসেছে আমার আলোচনার পরিধির মধ্যে। এছাড়া যেসব গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও রচনার আলোকে আমার এ বইটি লেখা হয়েছে তাদেরও নাম এসেছে স্বাভাবিক নিয়মে। এসেছে ১৯৭১ সালের চট্টগ্রামে কর্মরত বাঙালি ও ধিকৃত অবাঙালি অফিসারদের নাম ও তাদের ভাল-মন্দ কার্যক্রম। সেখানকার স্বাধীনতার পক্ষের সামরিক অফিসারগণ জানতেন, এ স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁদেরকেই নানাভাবে নেতৃত্ব দিতে হবে। সেজন্য তাঁরাই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এর সঙ্গে যোগ দেন অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টের অফিসারগণ। কাজেই নাম এসেছে জিয়ার সঙ্গে কর্ণেল চৌধুরী, অলি আহমদ, মীর শওকত আলী, রফিকসহ অনেকের। আমার এ গ্রন্থে সঙ্গত কারণে তাঁদের অবদানের কথা বলতে হয়েছে। ভাসানী এসেছেন আলোচনায়, এসেছে তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা ও স্বাধীনতার কথা। এসেছে মুজিবের কথা, হাসিনার কথা— ইতিহাসের আলোকে যাঁর যা আসা দরকার তাঁদের সেভাবেই আনা হয়েছে।

আজকাল মুজিব ও মুজিবের আওয়ামী লীগকে স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি হিসেবে এমনভাবে প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে— যার ফলে স্বাধীনতার ইতিহাস ও ইতিহাসজাত ঘটনা নিয়ে মানুষের মাঝে দ্বিধা ও ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। এত বড় ইতিহাস বিকৃতি আর হয় না। আমি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এসব ঘটনার সঠিক চিত্র তুলে ধরেছি। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী ও শরৎবসু গং যথাক্রমে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সদস্য ও নেতা হওয়া সত্ত্বেও অবিভক্ত বাংলার স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছিলেন; তেমনি একাত্তরে মুজিবের

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে তাজউদ্দীন গং স্বাধীনতার পক্ষে সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সরকার গঠন করে স্বাধীনতা যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেন। কাজেই যার যা প্রাপ্য তাকে সেভাবেই মূল্যায়ন করা হয়েছে।

কাজেই এ গ্রন্থটি ইতিহাসকে অবলম্বন করে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে রচিত। এতে সময় ও ঘটনাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সেজন্য পাকিস্তান সৃষ্টি, তার পূর্বকাল ও পরবর্তিকালের ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, গণঅভ্যুত্থান '৭০-এর নির্বাচন, একাত্তরের মার্চের ঘটনাবলী ও স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারাকে ধারণ করা হয়েছে এতে।

এ সবই আমি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি বিভিন্ন প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার আলোকে। তাছাড়া একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি ও একজন বুদ্ধিজীবী লেখক হিসেবে আমি যুক্ত ছিলাম ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন, '৭০ সালের নির্বাচন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তিকালের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। সেজন্য আমার বাস্তব ও দৃশ্যমান ঘটনাবলীকে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছি। সে কারণে আমার দেখা ঘটনাগুলোও আমার লেখায় এসেছে।

আমার এ রচনায় এদেশের সরকার ও সরকারপ্রধানদের রাজনৈতিক নীতি ও সংস্কৃতি তুলে ধরেছি। সরকার ও সরকারপ্রধানের রাজত্বকাল, রাজনৈতিক কৌশল, পররাষ্ট্রনীতি, রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকর্ম, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, তাঁদের রাজত্বকালের সামাজিক অবস্থা, গণতন্ত্র, গণতন্ত্র হত্যা, সুখ-দুঃখ, দলীয়করণ, নতজানু পররাষ্ট্রনীতি, জোট নিরপেক্ষতার রাষ্ট্রনীতি, উন্নয়ন, দুর্ভিক্ষ ও তাদের দলীয় কর্মসূচী ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে অবলোকন করে উপস্থাপন করেছি এ গ্রন্থে। আলোচনা করা হয়েছে সপ্তভুজ বা সার্ক এবং চতুর্ভুজ পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত নানা চুক্তি ও চুক্তির সুফল- কুফল নিয়ে।

দীর্ঘদিন ধরে বহু পরিশ্রম করে এ গ্রন্থ রচনার প্রয়াস পেয়েছি আমি। তবু এতে নানা ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। সেজন্য পাঠকদের নিকট থেকে সৎপরামর্শ পেলে এবং ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে, সম্ভব হলে, পুনঃপ্রকাশের সময় তা সংশোধন করা যাবে। প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ এ গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি পাঠ ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে গ্রন্থটিকে মানসম্পন্ন করেছেন, সেজন্য তাঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। যাঁদের লেখা পড়ে আমি এ গ্রন্থকে আরো সুন্দর করতে পেরেছি, তাঁদেরও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

আমার এ গ্রন্থের উপক্রমণিকা শেষ করার পূর্বে ড. এমাজউদ্দীন আহমদের মুখ-বন্ধ হতে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করে আমার এ পর্যায়ের বক্তব্যের সমাপ্তি টানতে চাই, "এই মৃত্যুঞ্জয়ী জাতীয় নেতার জীবনের বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা সমৃদ্ধ"–গ্রন্থটি লেখার চেষ্টা করেছি নিম্নবর্ণিত লেখক ও বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার বিষয় ও ঘটনাবলীর আলোকে। সংশ্লিষ্ট লেখকদের নাম যথাসম্ভব

www.nagorikpathagar.org

সংগ্রহ করে এবং ড. এমাজউদ্দিন আহমদের প্রবন্ধ হতে উদ্ধার করে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল।

জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা, ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, ওলি আহমদ, অলি আহাদ, রফিকুল ইসলাম, জাহানারা ইমাম, কাদের সিদ্দিকী, অধ্যাপক খন্দকার আব্দুল করিম, এ্যাডভোকেট মনসুর আলী, খান আতাউর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, শামসুল হক, জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান আজরফ, প্রফেসর ড. রশীদুল আলম, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, খন্দকার আব্দুল হামিদ, কর্ণেল আকবর হোসেন, অধ্যাপক খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ, অধ্যাপক মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন, অধ্যাপক হারুণ-অর-রশীদ, অধ্যাপক আবদুন নূর, অধ্যাপক সাঈদউর রহমান, অধ্যাপক আবু সাঈদ, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা, মাহবুব আনাম, রিয়াজ উদ্দিন আহমদ, আখতার উল আলম, সাদেক খান, আমানুল্লাহ কবীর, লে. জে. (অব:) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মেজর জেনারেল (অব:) জেড এ খান, মেজর (অব:) আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক জসীম উদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার, কাজী সিরাজ, এম রেজাউল করিম, অধ্যাপক তারেক শামসুর রহমান, সৈয়দ আবদাল আহমদ, হোসেন মাহমুদ, ঋদ্ধি আকতার নওয়াজ, মুন্সি আব্দুল মান্নান, তারেক রহমান, কবি আবদুল হাই শিকদার, অধ্যাপক আসকার ইবনে শায়েখ, অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সৈয়দ আলী আশরাফ, অধ্যাপক কে এ এম শাহাদত হোসেন মণ্ডল, ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, সামাদ সরকার, শেখ নূরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম মিশা, আনোয়ার জাহিদ, খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ, এ কে এম শামসুল বারী মিঞা মোহন, অধ্যাপক খোন্দকার মকবুল হোসেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

www.nagorikpathagar.org

ভারতে একাধিক জাতি ও বহুজাতিসত্তার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সেখানকার রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক দল হিন্দু মহাসভা— বর্তমানে বি. জে. পি. (এক) জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতা নেয়ার জন্য যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে তা সঠিক ছিল না, ইতিহাসই তা প্রমাণ করেছে। পরবর্তিকালে মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে এ. কে. ফজলুল হক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে বহু জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য প্রস্তাবনা পেশ করে। এ দাবী ছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর, শরৎবসুর, আবুল হাসিমের এবং মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর। কিন্তু কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও পরিশেষে মুসলিম লীগের বিরোধিতার কারণে তা হয়ে ওঠেনি সেটাও আমরা জানি। বরং তখন মুসলিম লীগের চেয়ে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা এর বিরোধিতা করে অনেক বেশি, এটিও ইতিহাস স্বীকৃত সত্য। তবে ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলো দেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেও, ১৯৭১ সালে একজাতি বা দ্বিজাতিতত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণিত করে বহুজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম হয়। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই এদেশ আত্মপ্রকাশ করে। এ ছাড়া ভারতের উত্তর পূর্বাংশ আসাম প্রদেশসহ আসাম সংলগ্ন ৭টি ভারতীয় প্রদেশ ১৯৭১ সালের পূর্ব থেকেই স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে রত এ ইতিহাসও আমরা জানি। তাছাড়া ভারতের কাশ্মীর, পূর্ব পাঞ্জাব, দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ তাদের স্বস্ব জাতিসত্তার ভিত্তিতে তাদের স্বাধীনতা দাবী করে আসছে, বলতে গেলে ১৯৪৭ সালের পর থেকেই। ভারতের এসব স্বাধীনতাভিত্তিক আন্দোলন, সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ এবং বর্তমানে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বভারতে বা ভারতের সকল অংশে প্রভাব বিস্তারে অক্ষমতাই প্রমাণ করে একজাতিতত্ত্ব বা দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রাচীন ভারত ও বর্তমান ভারত প্রত্যাখ্যান করে আসছে। কারণ পূর্বেও ভারতে একজাতিভিত্তিক একরাষ্ট্র ছিল না, বর্তমানেও নেই। এমনকি ইংরেজ আমলেও ছিল না; থাকলে হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, গোয়া, দমন, দিউ, ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চল পৃথক দেশ হিসেবে অবস্থান করত না। সেজন্য সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম, শরৎবসু, ভাসানী সমগ্র বাংলাদেশকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই একটি স্বতন্ত্র স্বাধীনরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু মহাসভা, সর্বভারতীয় কংগ্রেস ও পরিশেষে মুসলিম লীগও তা হতে দেয়নি।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট হয়েছিল ভারত এবং পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালে তা গ্রহণ করেছিল সকলে। ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শরৎবসুরাও তখন তা গ্রহণ করেন। এমনিভাবে একজাতিতত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করে দ্বিজাতিতত্ত্বকে স্বীকার করে নিল এদেশের জনগণ। এতে অবশ্য কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মৌলবাদী ব্রাহ্মণ্য সমাজ তাদের সাম্প্রদায়িক

www.nagorikpathagar.org

চেতনার ভিত্তিতে এ বিভক্তি মেনে নিতে পারেনি তখন, এখনও তারা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে এ বিভক্তিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি, ভারতের বহু গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় এর প্রমাণ মেলে। আবার ১৯৭১ সালের দ্বিজাতিতত্ত্ব ও একজাতিতত্ত্বের সমাধি রচনা করে জন্ম নিল বাংলাদেশ। পাকিস্তান ও এদেশের পাকিস্তানে বিশ্বাসী মানসিকতার লোক আজও মেনে নিতে পারছেন না এদেশকে, এদেশের স্বাধীনতাকে। অপরদিকে ভারত আমাদের সহযোগিতা করে মনে করেছিল আমরা তার তাঁবেদার হয়ে থাকব। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধস্নাত বি. এন. পি. ও এর প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং এ দলের বর্তমান চেয়ারপার্সন স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী খালেদা জিয়া এ দল ও এ দেশের হাল ধরে থাকার কারণে ভারতের সে আশা পূর্ণ হয়নি। এজন্যই তাদের ক্ষুব্ধতা ও আচরণ এতটা মারমুখী যে দু'দিক থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে রক্ষা করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে খালেদাকে। তদুপরি ভারতপন্থী আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ ভারতমুখী। তাঁরা ভারতের একজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে ইসলাম ধর্মীয় চেতনাকে অস্বীকার করে হিন্দুমৌলবাদী সাহিত্য সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশ্বাসের আলোকে নতজানু হয়ে ওই দেশের সংস্কৃতিকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে কাজ করে যাচ্ছেন। এসবই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী। তাঁদের কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করছে বি. এন. পি. ও তার চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ও সহযোগী অন্যান্য দল। বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে এসব অন্যায়কে শামাল দিতে নিরলস সংগ্রাম করে যাচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, পাক-ভারতের বহু অঞ্চলই স্বজাতিসত্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত আছে। আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে জানতে পারি, ভারতরূপ উপমহাদেশ কোনোদিনই একশাসনের অধীনে ছিল না। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারত একশাসনের অধীনে ছিল বলে মনে করা হলেও একথা সত্য যে সমস্ত অঞ্চল ঔরঙ্গজেবের রাজ্য সীমার মধ্যে ছিল না। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ, বিপ্লব লেগেই থাকত। শিবাজী দক্ষিণ ভারতকে অস্থির করে রেখেছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সময় নাকি সমস্ত ভারত একত্র ও এক রাজার অধীনে ছিল। এটিও সম্পূর্ণ ইতিহাস সম্মত সত্য নয়। অনুমান ভিত্তিক বক্তব্য। কারণ সে সময়ে এতবড় ভারতের সীমানা চেতনায় ছিল না। কাজেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বহুজাতিসত্তার চেতনায় এক স্বাধীনতা যুদ্ধ। তৎকালীন ভারত সরকার তাঁদের রাজনৈতিক সুবিধালাভের কারণে পাকিস্তানকে বিভক্ত করতে চাইলেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ, আসাম, কাশ্মীর, পূর্ব পাঞ্জাব, দক্ষিণ ভারত আমাদের সমর্থন করেছিল তাদেরই স্বার্থে। এ দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে তারা স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাবে এ অভিপ্রায়ে। আমি নিজে একাত্তরে আমার রক্ত শপথ নাটক শিলিগুড়িতে মঞ্চায়নের অনুমতি লাভের জন্য সেখানকার শিখধর্মপালনকারী জেলা প্রশাসক (তাঁর অফিস 'দার্জিলিং')-এর নিকট যা শুনেছি, তখন তা বলতে না পারলেও, বর্তমানে তাঁর কথার সূত্র ধরে বলা চলে: তাঁরাও তাঁদের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সমর্থন করেছিলেন। আসাম....অঞ্চলের ৭টি প্রদেশের জনগণও একই উদ্দেশ্যে আমাদের সহযোগিতা করেন। দিল্লী-উল্‌ফা-ঢাকা ট্রায়াংগাল, হারুনুর রশীদ, ১৪ই জানুয়ারী ১৯৯৮, দৈনিক ইনকিলাব হতে এর সমর্থনে কিছু উদ্ধৃতি দিলাম।

www.nagorikpathagar.org

ঃ এদিকে ৭ই জানুয়ারি (১৯৯৮) উল্‌ফা সভাপতি অরবিন্দ রাজখোয়াও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত এক ফ্যাক্সের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুপচেটিয়াকে মুক্তিদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। উল্লিখিত ফ্যাক্সে অরবিন্দ রাজখোয়া বলেছেন, "ভারতের বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৫৮ (আসাম, মনিপুর)-এর ভিত্তিতে ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাস থেকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী আমাদের দেশটি (অর্থাৎ আসাম) দখল করে আছে।" তিনি আরো বলেছেন, "আসামে এখন হুবহু আপনাদের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেরই অবস্থা। হানাদার বাহিনীর নামটাই শুধু ভিন্ন, কিন্তু চরিত্র হুবহু এক।" বিবিসির কাছে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে উল্‌ফা সেনাবাহিনী প্রধান পরেশ বড়ুয়াও অনুপচেটিয়াকে ভারতের কাছে হস্তান্তর না করে মুক্তিদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আসামের জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি নিঃশর্ত সহায়তা ও আশ্রয় দিয়েছিল। এসব কথা মিথ্যা কি? এছাড়া ভারতের রেভল্যুশনারী পিপল্‌স ফ্রন্ট (আর পি এফ) ও অনুপচেটিয়ার মুক্তি দাবী করেছে। বস্তুতঃ অনুপচেটিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ভারতের সকল বিপ্লবী, মুক্তিকামী জনগণ ও সংস্থারই সুস্পষ্ট দাবী। ঃ

এছাড়া উক্ত প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে—

এটা সত্য যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অনেক আগে থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের জনগণ তাদের মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। মিজো ও নাগাদের মুক্তি সংগ্রাম তো শুরু হয়েছে বলতে গেলে বৃটিশের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই। এখন কার্যতঃ এই অঞ্চলের ৭টি রাজ্যের জনগণই দিল্লীর কাছ থেকে মুক্তি চাইছে। ঃ

তাহলে দেখা যাচ্ছে বহুজাতিসত্তার চেতনা পাক-ভারতের সর্বত্রই ছড়িয়ে যাচ্ছে। এ ফসল বা স্বাধীনতা অন্য কেউ ঘরে তুলতে না পারলেও আমরা তুলেছি। যা মেজর জিয়ার স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধমেই সম্ভব হয়েছে। তাজউদ্দীন, ওসমানী সহ আমরা সকলে তাকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছি। এ ছিল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ঐক্যজাত চেতনা। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে তা সফল হয়েছে। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অন্য দেশের বিশেষ কোনো দলের বা ব্যক্তির দয়ার দান নয়।

একথা সত্য যে শেখ মুজিব সমর্থিত আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগের একাংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে। তার এত বেশি প্রমাণ রয়েছে যে তা এখানে বিস্তারিত তুলে দিলে ভিন্ন একটি গ্রন্থই হতে পারে। সেজন্য আমরা এ নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করেই অন্য প্রসঙ্গে চলে যাব। আওয়ামী লীগের তাজউদ্দীনসহ অপর অংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছেন, স্বাধীনতা চেয়েছেন মওলানা ভাসানী। স্বাধীনতা চেয়েছেন এদেশের জনগণ।

এখানে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সম্পর্কে বলার আগে ভাসানীর স্বাধীনতার চেতনা ও শেখ মুজিবের বিরূপ মানসিকতার কিছু চিত্র এখানে তুলে ধরতে চাই।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাবার পর ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী) মাঠে গণসংবর্ধনা দেয়া হয় এবং আসন্ন গোলটেবিল বৈঠকে ছাত্রদের

www.nagorikpathagar.org

১১ দফা দাবী উত্থাপনের জন্য শেখ মুজিবকে অনুরোধ করা হয়। ১১ দফায় স্বাধীনতার রূপরেখা আভাসিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর বক্তব্য শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী—৪র্থ খণ্ড পৃ. ৫৪ হতে উৎকলন করা হল।

ঃ সেই বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব বক্তৃতার মধ্যে এক জায়গায় বলেছিলেন, ইন্দোনেশিয়ায় কতকগুলো দ্বীপ থাকতে পারলে, পাকিস্তানের দুই অংশ একত্রে কেন থাকতে পারবে না। ঃ

এতে ছেলেরা বিক্ষুব্ধ হলেও স্বাধীনতার পক্ষে তখন কিছু বলতে পারেননি তাঁরা।

১৯৭০-এর নির্বাচনে সকল দল জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও দূরদর্শী ভাসানী সাহেব দেখলেন, ভোটে দাঁড়ালে নিজেদের মধ্যে ভোট ভাগাভাগি হয়ে যাবে। ফলে মুসলিম লীগই জিতে যাবে। সে কারণে "ভোটের আগে ভাত চাই" শ্লোগান তুলে মাঠ গরম করে রাখলেন তিনি এবং ভোটের জন্য মুজিবের পক্ষে কথা বলতে শুরু করলেন ভাসানী—

ঃ মাঠ খালি রাখলেন মুজিবের জন্য। মওলানা সাহেব নির্বাচন বানচাল হোক তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন না। ঃ শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী, পৃ. ৯০

শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী (পৃ. ১০৮) গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে দিয়ে প্রমাণ করতে চাই, ভাসানী সাহেব ক্রমান্বয়ে তাঁর কথায়, বক্তব্যে ও কাজকর্মে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি মুজিবকে হুশিয়ার ক'রে দিয়েছিলেন।

ঃ ১৯৭০-এর ৪ঠা ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী সাহেব ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দিলেন। তিনি সেই ভাষণে লাহোর প্রস্তাব মোতাবেক পাকিস্তানের সংবিধান রচনার জন্য জনগণের দাবীর কথা নির্বাচন প্রার্থীদের স্মরণ করিয়ে দেন। ঃ

এ লক্ষ্যে তিনি ৯ই জানুয়ারি ১৯৭১-এ সন্তোষে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করেন। দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় তা প্রকাশ পায়। তিনি স্বাধীনতার পথে যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তা এসব কর্মকাণ্ডই শুধু নয়, বহুপূর্ব হতেই তাঁর বক্তৃতা ও কর্মকাণ্ডে সে কাজ শুরুও করে দেন। সন্তোষের সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে এদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের উপস্থিতিতে তিনি বলেন–

ঃ পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি তাঁর শেষ রক্তবিন্দু দানে প্রস্তুত রয়েছেন এবং যাঁরা এ কঠোর সংগ্রামে তাঁর সাথে শরীক হবেন, তাঁদেরও স্বার্থত্যাগের সংকল্পে উদ্বুদ্ধ করেন। ঃ

ভাসানী সাহেব ৯ই জানুয়ারিতে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করেন, তা দৈনিক পাকিস্তানের ১০ই জানুয়ারি ১৯৭১-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ঃ লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটিতে ন্যাপের সভাপতি মসিউর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী কাজী জাফর আহমদ এবং অন্যান্য দল থেকে শাহ আজিজুর রহমান, আতোয়ার রহমান খান, এ. এস. এম. সোলাইমান এবং আগরতলার

www.nagorikpathagar.org

ষড়যন্ত্রমামলার অন্যতম আসামী লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। ঃ (পৃ. ১০৫) ঐ

শেখ মুজিব ক্ষমতালাভের জন্য (অবশ্য সেসময় তাঁর ক্ষমতা ন্যায্য পাওনা ছিল) ১৯৭১-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ অধিবেশন ডাকার জন্য অনুরোধ করেন। সে কারণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য ১২ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আসেন। ঢাকার বিমান বন্দরে তিনি নামলে—

ঃ বিমান বন্দরে সাংবাদিকগণ মওলানা ভাসানীর "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান"– দাবী সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, "এ ব্যাপারে মওলানা ভাসানীকেই প্রশ্ন করুন। ঃ (পৃ. ১১৬) ঐ

অতঃপর শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ১০০ মিনিটকাল অন্তরঙ্গ আলাপ করেন এবং উভয়ে পাকিস্তান সরকার গঠনে সম্মত হন। ১৪ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাবার পথে বিমান বন্দরে ইয়াহিয়া হাসিমুখে সাংবাদিকদের বলেন—

ঃ শীগ্গিরই শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। ঃ (পৃ. ১১৬) ঐ

মওলানা ভাসানী যে স্বাধীনতা সংগ্রামকে জনগণের দুয়ারে নিয়ে গিয়ে তাদের মানসিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছিলেন নিম্নবর্ণিত ঘটনাগুলো থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমি এর তথ্যভিত্তিক বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করব। ভাসানী ১৩ই জানুয়ারি নওগাঁর এক জনসভায় বলেন—

ঃ পাকিস্তানের দুই অংশের নির্বাচিত পরিষদসদস্যদের পৃথকভাবে বসে আলাদা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সুযোগ দেয়া উচিত। কারণ গত নির্বাচনে (১৯৭০) উভয় অংশের জনগণ আলাদা রায় দিয়েছে। ২০শে জানুয়ারি গাইবান্ধার এক জনসভায় মওলানা সাহেব বলেছিলেন— আমি একজন মুসলমান হিসেবেই মরব। কিন্তু তার আগে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করব। ২৬শে জানুয়ারি চাঁদপুরের এক জনসভায় মওলানা সাহেব বলেছিলেন— স্বাধীনতার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে শেষ রক্ত বিন্দু দেব। স্বাধীনতার সংগ্রাম কামান-বন্দুক দিয়ে দাবীয়ে রাখা যাবে না। মওলানা সাহেব শেখ মুজিবের উদ্দেশে বলেছিলেন— দীর্ঘদিন রাজত্ব করুন ক্ষতি নেই; কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে ক্ষমা নেই। ঃ (পৃ. ১২৭) ঐ

আমরা জানি ১৯৭১ সনের ২৭শে জানুয়ারি মুজিব-ভুট্টো অন্তরঙ্গ বৈঠক হয় এবং ৩০শে জানুয়ারি তাঁরা পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী নৌবিহারে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং পরদিন ভুট্টো তাঁর দেশে ফেরার পথে ঢাকার বিমানবন্দরে সমাবৃত সাংবাদিকদের হাস্যোজ্জ্বল নয়নে বলেন, "আমি নিরাশ হয়ে ফিরছি না।" আমি নিজে ভুট্টোকে খুবই ভীতির চোখে দেখতাম। তাঁকে বোঝা খুবই কঠিন। কুশলী ভুট্টোকে সে কারণে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। আমার কয়েকটি একাত্তরের লেখায়ও এ অবিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। লাহোর বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের নিয়ে ভাসানী ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে এক সপ্তাহব্যাপী চট্টগ্রাম, সিলেটসহ ৬টি জনসভায় বক্তব্য রাখেন এবং এ বক্তব্যে "স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জনগণকে তৈরী থাকতে নসিয়ত করছিলেন।" ঐ

www.nagorikpathagar.org

কেউ কেউ ভাসানী সাহেবকে দোষ দিয়ে বলে থাকেন, "১৯৭১-এর রাজনৈতিক সংকটকালে ভাসানী-মুজিব পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।" আমিও এক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে একমত, তবে এ বিরোধিতা ছিল দু'টি বিপরীতধর্মী অবস্থানের কারণে। ভাসানী চাইতেন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আওয়ামী লীগের বৃহৎ অংশও তাই চাইতেন। কিন্তু ৭০-এর নির্বাচনের পর এরা মুজিবের সামনে স্বাধীনতার কথা বলতে পারতেন না। আর মুজিব যে তা বুঝতে পারতেন না তা নয়, কিন্তু মুজিব চাইতেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব এবং ২৫-শে মার্চ পাক সরকার কর্তৃক বন্দীত্ব বরণের পূর্বপর্যন্ত তিনি তাই চেয়ে এসেছেন। ইতিহাস থেকে বেরিয়ে আসা এ-সত্যকে আমরা কেউ ঢাকতে পারব না। মনে রাখতে হবে, পিতলকে সোনা বলে চালান যায় না, আর সোনাকে যতই পিতল বলুন না কেন, সে সোনাই থেকে যায়। ইতিহাসের কথাও তাই।

একাত্তরের ৩রা মার্চ জাতির উদ্দেশে ইয়াহিয়ার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে তার প্রতিক্রিয়া ব্যাপকভাবে প্রতিভাত হল। শেখ মুজিবের ৫ দিনব্যাপী অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনের আহ্বানে বাংলাদেশের সমগ্র কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব শেখ মুজিবের হাতে চলে আসে। ভাসানীর পথ ধরে শুধু দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়াই বাকী ছিল তখন। কিন্তু তিনি এ সুযোগ কেন হাতছাড়া করলেন তা আমরা জানি। এ সম্পর্কে মনসুর আহমদ বলেন,—

ঃ একলাগা পাঁচদিন পূর্ব পাকিস্তানে, মানে পাকিস্তানের মেজরিটি অঞ্চলে, কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সরকারি–বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের নির্দেশে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত অফিসারও আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মানিয়া চলিতেছিলেন। সামরিক বাহিনী ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে আসা থেকে বিরত ছিল। ঃ (পৃঃ ১২১) ঐ

এখানে মনসুর সাহেব তাঁর বক্তব্যে বলেছেন : পাক-সরকারের আহ্বানে সংসদে বসে স্পীকার নির্বাচন করলেই সংসদ নিজের হাতে চলে আসত। তখন পাকিস্তানের সংসদে বসে মেজরিটির জোরে নিজের পছন্দমত আইন তৈরী করতে পারতেন মুজিব। কিন্তু তিনি ভেবে দেখেননি তা কোনো সময়েই সম্ভব ছিল না। তারা আবার সামরিক শাসন জারী করত। তখন স্বাধীনতার পথেও যাওয়া সম্ভব ছিল না। মুজিবও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাই করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। ভাসানী, আতাউর রহমান, তাজউদ্দীনের চাপের মুখে বা তাঁদের পরামর্শমত মনসুর সাহেবের ভাষায়, "শেখ মুজিব চাপে পড়িয়াই আমাদের পরামর্শ মত কাজ করিতে পারেন নাই"— তা ঠিকই হয়েছে। কারণ ৬ দফা আন্দোলনের পথে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ খোলা ছিল না। শেখ মুজিবও স্বাধীনতার বিপরীত পথে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শেষ রক্ষা হয়নি। বন্দী না হলে এবং মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য অনড় মনোভাব পোষণ করলে, তাঁর এ জেদের কারণে যে কি হত, তা না বলাই ভাল। যদিও বিদেশের পত্র-পত্রিকা এ নিয়েও তখন লিখেছিল, প্রগতিবাদী মু যোদ্ধাগণ মুজিবকে বন্দী করেছে। এটি রাজনীতির গতিধারাই ধরে নিয়েছিল তারা।

www.nagorikpathagar.org

একাত্তরের ৯ই মার্চ '৭১-এ ভাসানীর প্রচার পত্রে বলা হয়, "পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন।" ভাসানী ১১, ১২ ও ১৩ ই মার্চের বিশাল জনসভায় বাংলাদেশের সপক্ষে দরাজ গলায় ঘোষণা করেন, "স্বাধীনতার কথা এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী মহলের প্রতিটি লোকই সেই মিছিলে শরীক হয়ে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবীর ন্যায্যতা প্রমাণ করেছিলেন।"

ভাসানী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব পিয়াসী শেখ মুজিবকে চিনতেন, জানতেন। সেজন্য তিনি তাঁকে বারবার সাবধান করে দিয়েও এ মোহ থেকে তাঁকে ফেরাতে পারেন নি। সুতরাং ভাসানীর মনে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল।

ঃ কিন্তু যখন তিনি (ভাসানী) জানতে পারলেন, ২৫শে মার্চ শেখ মুজিব তাঁর ধানমণ্ডিস্থ বাসভবন ছেড়ে কোথাও সরে যান নাই, ইয়াহিয়া খানের দ্বারা তিনি গ্রেফতার বরণ করেছেন, তখন মওলানা সাহেব আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেছিলেন— আল্লাহ তুমি মেহেরবান।" (পৃ. ১৪০) ঐ

পাকিস্তান বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকাসহ সর্বত্র যুদ্ধ শুরুর নামে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এদেশের জনগণকে হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন করতে থাকে। এমন সময়—

ঃ ৭১-এর ২৭শে মার্চ চট্টগ্রাম রেডিও থেকে শোনা গেল একটি বজ্রনির্ঘোষ আওযাজ, "আমি মেজর জিয়া বলছি। বি. ডি. আর. আর ই. পি. আর. পুলিশ, আনছার আমরা মিলিতভাবে ঘোষণা করছি স্বাধীনতা। যেকোনো মূল্যে আমাদের এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। আপনারা যে যেখানে আছেন, সেই অবস্থাতেই হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করুন। আল্লাহ্ আমাদের সহায় আছেন। সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশীর আজাদী কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।" ঐ

ঃ সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশী নাগরিক সেই বুলন্দ আওয়াজে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। তারপর দেশব্যাপী চলতে লাগল হানাদার বাহিনীর মোকাবিলার ব্যাপক প্রস্তুতি। সে প্রস্তুতির ইতিহাস বিরাট, ব্যাপক। দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী সেই সংগ্রামে বাংলাদেশের কত যে দামাল ছেলে জান দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে 'ফতহুল মুবিন' চরম বিজয়কে ছিনিয়ে এনেছে তার ইতিহাস স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। ঃ শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ড। পৃ. ১৪১।

একথা সুবিদিত যে শেখ মুজিব ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক বন্ধু খন্দকার মোশ্‌তাক আহমদ ও ভাগ্নে যুবলীগ নেতা শেখ ফজলুল মনিকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন। সে কারণে মোশ্‌তাক ও মনি একাত্তরের যুদ্ধকালে আমেরিকাসহ পাকিস্তানের সমর্থক দেশসমূহের সহায়তায় পাকিস্তানের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসার প্রচেষ্টা চালান। শোনা যায়, ভারতও তাদের রাজনৈতিক সুবিধার কারণে পাকিস্তান- বাংলাদেশের মধ্যে confedration-এর প্রস্তাব অনুমোদন করেন। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদ প্রবাসী সরকার প্রধান হয়ে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এ ধরনের স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে মেনে নিতে পারেন নি এবং সে কারণে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, ক্যাপটেন মনসুর, জেনারেল ওসমানী ও জিয়াসহ তিন ব্রিগেডিয়ার, এলাকার সেনা কর্মকর্তাগণ তাদের এ কনফেডারেশনকে সমর্থন দান করেন নি। আর এ কারণে একাত্তরে তাজউদ্দীন সরকারকে

www.nagorikpathagar.org

উৎখাতের চেষ্টা চালানো হয়। শেষপর্যন্ত মুজিবনগর প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টা প্রধান ভাসানী 'খামুশ' শব্দে তাঁদের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে বলেন, এখন যে সরকার আছে তারাই মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে সকলে নীরব থাকতে বাধ্য হন। তারই কাউন্টার এ্যাকশন হিসেবে ১৯৭৪ সালে তাজউদ্দীনকে মুজিবের মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিতে হয় এবং মুজিব প্রথম প্রবাসীসরকার গঠনের স্থান কুষ্টিয়ার মুজিবনগরে আমৃত্যু যাননি। এসবই মুক্তিযুদ্ধের আলোকে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিশ্লেষণ করা দরকার। এসব যে ঐতিহাসিক সত্য— তা উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করব।

ঃ পাকিস্তানে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের দূত কিসিঞ্জার জানালেন যে ইয়াহিয়া খান ভারতে অবস্থিত নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী। কোলকাতায় নিযুক্ত আমেরিকার কন্‌সালকে বলা হয়, নির্বাসিত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাতে। নির্বাসিত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশ্‌তাকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সংসদ- সদস্য কাইউম সাহেবের সঙ্গে কন্‌সালের কয়েক দফা আলোচনা হয়েছিল, এমনকি খন্দকার মোশ্‌তাক সাহেবের সঙ্গে কন্‌সালের দেখাও হয়েছিল। ঃ

জেল হত্যাকাণ্ড – অধ্যাপক আবু সাইদ। পৃ. -২৫

ঃ তাজউদ্দীন ছিলেন মোশ্‌তাকের চিরশত্রু। ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে জনাব তাজউদ্দীনকে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভা থেকে সরানো এবং বঙ্গবন্ধুর কাছ ছাড়া করার পিছনে মোশ্‌তাকের ষড়যন্ত্র সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছিল। ঃ

কিন্তু সাইদ সাহেব একথা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহার করেছেন যে মোশতাক-মুজিব ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সে কারণে দু'জনেই তাজউদ্দীনের শত্রু ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৩০শে জুন তারিখের "আনন্দ বাজার"–পত্রিকায় এ সম্পর্কে নিম্নরূপ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

ঃ জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা (ন্যাপ) মওলানা ভাসানী বলেছেন, "জীবনের সব সম্পদ হারিয়ে, নারীর ইজ্জত বিকিয়ে, ঘরবাড়ি হারিয়ে, দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এবং দশ লক্ষ অমূল্য প্রাণ প্রদান করে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ রাজনৈতিক মীমাংসার নামে ধোঁকাবাজি কিছুতেই গ্রহণ করবে না। তাদের একমাত্র পণ : হয় পূর্ণ স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু। ঃ

এখানে বলা দরকার মুজিবের বন্দীত্ব এবং জিয়ার ঘোষণায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী 'আল্‌হামদুলিল্লাহ' পড়ে বলেছিলেন যে, যাক্‌, আল্লাহ দেশকে রক্ষা করছেন। সে সম্পর্কে ইতিহাস বিকৃতির যে ফোয়ারা ছুটাচ্ছেন শেখ হাসিনা ও তাঁর সমর্থক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা, তা যে কত মিথ্যা তা পরে আলোচনা করব। কিন্তু সে বিষয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ৫নং সেক্টর কমান্ডার মীর শওকত আলীর কিছু বক্তব্য এখানে তুলে ধরতে চাই।

আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধকে তাদের প্রাইভেট লিমিটেড মনে করে। [বিশেষ সাক্ষাৎকারে লে. জে. (অব:) মীর শওকত আলী]

www.nagorikpathagar.org

[মীর শওকত বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের ৫নং সেক্টর কমান্ডার, সাবেক রাষ্ট্রদূত, সাবেক মন্ত্রী, বি. এন. পি. নেতা বীর উত্তম খেতাব ধারী ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব।]

ঃ মেজর জিয়া আমার কাছে এসে বললেন, These Bustards has planed to kill us. I have Revolted. What do you say? আমি বললাম, At this moment you are the commander of us— এভাবেই আমি জড়িয়ে পড়লাম। অবশ্য আগে থেকেই আমরা হানাদার বাহিনীর আক্রমণের ব্যাপারে আশঙ্কিত ছিলাম এবং এ ব্যাপারে একটা প্রস্তুতিও আমাদের ছিল। যাই হোক, এরপর ২৬ মার্চ আমরা কালুরঘাট গেলাম এবং সেখানকার বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া নিজের উদ্যোগে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। এই ঘোষণার পরে মেজর জিয়া স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের খুঁজতে পাঠালেন আমাকে। আমি স্থানীয় একটি বাড়ির মধ্য থেকে কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাকে খুঁজে বের করলাম। তাঁরা তখন এসে মেজর জিয়াকে রীতিমত চার্জ করলেন এই বলে, "আপনি একজন সামান্য মেজর হয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, আপনি ঘোষণা দেয়ার কে ইত্যাদি।" জিয়াউর রহমান তখন শান্ত ভাষায় বললেন—দেখুন আপনারাতো কেউ ছিলেন না। ঘোষণা দেবে কে? এই একজনকে তো দিতে হবে। তাই আমি দিয়েছি। এতে অসুবিধা কোথায়? আপনারা প্রয়োজনে আবার দিন? তারা তখন বলল আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাচ্ছি বলে চলে গেলেন এবং ঘণ্টা খানেক পর ফিরে এসে বললেন, "ঠিক আছে, ঘোষণা আপনিই দিন, আমাদের একটু অসুবিধা আছে।" পরিবার পরিজনদের নিয়ে থাকতে হয় তো তাই, তবে "বঙ্গবন্ধুর" পক্ষে কথাটা বলতে হবে। মেজর জিয়া স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। এরপর ২৭শে মার্চ আবার ঘোষণা দেয়া হল এবং ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এ ঘোষণা রিপিট হল রেডিওতে। ঃ ইনকিলাব, ১৬/১২/৯৮

এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে, ২৫শে মার্চে মুজিব ঘোষণাপত্র কালুরঘাটে পাঠালে তারাতো সেটা নিজেরাই পাঠ করতেন অথবা জিয়ার মাধ্যমে সে পত্র পাঠ করা হত— তা হয় নি। দ্বিতীয়ত আওয়ামী লীগের এসব লোকজন তখনও মানসিকভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হননি বলে নিজেদের নামে ঘোষণা দিতে চাননি অথবা মুজিবের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারটায় তখনও আস্থাশীল ছিলেন বলে এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিলে যে বিপদ আসবে তাতে জড়াতে চাননি বলে। এতো তাঁদের চরিত্র।

আমি এখানে মওলানা ভাসানীর মুক্তিযুদ্ধে যে অবদান তা নিয়ে আলোচনা করছি। সে জন্য তাঁর জীবনী লেখক ও পত্র-পত্রিকায় যে কথাগুলো এসেছে তা নিয়ে আলোচনা করছি এবং প্রয়োজনে সেসব থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এখানে উক্ত প্রবন্ধে মীর শওকত আলী যা তাঁর (ভাসানীর) সম্পর্কে বলেছেন তা এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হল।

ঃ সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে ও পূর্ব বাংলার জনগণের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ধ্বনি উচ্চারিত হল পাকিস্তানের প্রতি মওলানা ভাসানীর 'ওয়ালাইকুম সালাম' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী জারি করল সামরিক শাসন। এভাবে ৬২, ৬৪ এবং ৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলনের পথরেখায় গড়ে ওঠা উনসত্তরের মহান গণঅভ্যুত্থান আমাদেরকে চালিত করল এক অনিবার্য মুক্তিযুদ্ধের দিকে। মওলানা

www.nagorikpathagar.org

ভাসানীর নেতৃত্বে গণমানুষের রুদ্ররোষে জ্বলে ওঠল সমগ্র বাংলাদেশ। অচিরেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার ভিত্তিতে ও নেতৃত্বে গণআন্দোলন রূপ নিল গণঅভ্যুত্থানে। আর ২৫ মার্চ প্রায় মধ্যরাতে আক্রান্ত হল সমগ্র জাতি। জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ধ্বনিত হল মুক্তিযুদ্ধের অমরবাণী। শুরু হল স্বাধীনতা সংগ্রাম। লড়াই চলল দীর্ঘ ৯ মাস। আপামর জনসাধারণ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ছিনিয়ে নিল স্বাধীনতা। আমরা পেলাম একটি নিজস্ব পতাকা, একটি স্বাধীন ভূখণ্ড ও জনগোষ্ঠী। অতএব, স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে কৃতিত্বটা কার তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান। ঃ

উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কয়জন নেতা জাতীয়তাবাদের চেতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন শেখ মুজিব তাঁদের মধ্যে একজন। এ প্রচেষ্টার পূরোভাগে ছিলেন এ. কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবসহ অনেকে। অতঃপর গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন মওলানা ভাসানী ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন শেখ মুজিব। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ-উত্থাপিত ৬ দফা দাবী ও সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দেশকে স্বায়ত্তশাসনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর '৭০-এর গণভোটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য আ: লীগ প্রধান শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করার কথা। কিন্তু তা না দিলে সমগ্রদেশ ও জাতি স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু মুজিব সে পথে না গিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনড় থাকেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেকারণে বলা যায়, তিনি এদেশের স্বাধীনতা চাননি। কিন্তু স্বাধীনতা চেয়েছেন এদেশের জনগণ, সামরিক বাহিনী, পুলিশ, বি. ডি., আর. ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী। শেখ মুজিবের আচরণে অতিষ্ট জনগণ ও স্বাধীনতা পিয়াসী এদেশের ব্যক্তিত্ব ও নেতা-কর্মীরা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেননি। এজন্য যে তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষতি হবে। সেজন্য মুজিব বন্দী হলে ভাসানী বলেছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ। জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন। মেজর জিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পেরেছিলেন, তাজউদ্দীন মন্ত্রিসভা গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জেনারেল ওসমানীকে মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করা সম্ভব হয়েছিল।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, একাত্তরের মার্চে শেখ মুজিবের ক্রিয়াকর্ম যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনুকূলে ছিল না, তেমনি স্বাধীনতা লাভের পর ক্ষমতালোভী শেখ মুজিব তাজউদ্দীনের মত স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন যোগ্য-প্রধানমন্ত্রীক মন্ত্রিপরিষদ থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজের অবস্থান শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশ চালানোর ক্ষেত্রে তিনি যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ঢাকতে কখনও রাষ্ট্রপতি, কখনওবা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয়নি। দেশটাকে তিনি তলাবিহীন ঝুড়ি বানিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে বিদেশ থেকে যত সাহায্যই আসুকনা কেন, তা তলা না থাকায় পড়ে যেত এবং তা কুড়িয়ে নিত তাঁর চারপাশের মোসাহেব নেতা-কর্মীগণ। শত্রুপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি লালঘোড়াস্বরূপ রক্ষীবাহিনী লেলিয়ে দিয়েছিলেন। এ বাহিনীর হাত থেকে তাঁর নিজের দলের লোকও রেহাই পাননি। যদি তিনি তাঁর মোসাহেবদের

www.nagorikpathagar.org

পক্ষে কাজ না করে দেশের জন্য কাজ করতেন, তাহলে দেশের এ দশা হত না। অন্য দলমতের তো কথাই নেই। ফলে সুজলা-সুফলা বাংলাদেশে সংকট ঘনিয়ে আসে, '৭৪-এর দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ বাসন্তীকে প্রাণ দিতে হয়। কলার পাতা পরিধান করে লজ্জা নিবারণ করতে হয় তাদের। উলঙ্গ লজ্জাস্থানের দিকে আবার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে তাঁদের স্নেহপুষ্ট সন্ত্রাসীদের। ফলে হত্যা, সন্ত্রাস, লুট, ধর্ষণ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। ভয়ে সকলের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। কুমারীগণ একাত্তরের মত ধর্ষিতা হবার ভয়ে, কুমারী মাতার লজ্জা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য বনে বাদারে, এবাড়ি সেবাড়ি আত্মগোপন করে থাকতে আরম্ভ করে। তাতেও তারা নিস্তার পায় না। তারা বেদনায় কাঁদে। ভাবে একাত্তরের পাকবাহিনী দ্বারা ধর্ষিত নারীদের তবু একটা অবলম্বন আছে তাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য শত্রু দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। তাঁরা কুমারী-মাতা হতে বাধ্য হয়েছেন। দেশ তাঁদের 'বীরাঙ্গনা'-উপাধিতে ভূষিত করেছে। কিন্তু আওয়ামী-নির্যাতনে নির্যাতিতা মহিলা নিজেদের কি বলে পরিচয় দেবেন? কুমারী-মাতার বলার কি থাকবে? এইতো ছিল ৭২-৭৫ সালের একটি করুন চিত্র গণতন্ত্র থাকলে তাঁকে চিরদিনের জন্য ক্ষমতা হারাতে হবে। জনতার আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি কোনো বক্তব্যই দিতে পারবেন না। জনগণ ঘৃণায় মুখ ফেরাবে।

অতএব মুখ বন্ধ করো। বাক স্বাধীনতা কেড়ে নাও। তখন ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে সংসদে বসে ১৫ মিনিটের মধ্যে বাকশাল আইন পাশ ও বাকশাল গঠন করলেন মুজিব। এটিকে একটি সাংবিধানিক ক্যু বলা যায়। সংবিধানে এ নিয়ে কোন আলোচনারই সুযোগ দিলেন না। একদলীয় বাকশাল শাসন চালুর ফলে সকল দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হল, চারটি পত্রিকা বাদে সকল পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হল। সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাকে খর্ব করে আর একটি আধা-সামরিক বাহিনী, রক্ষী বাহিনী নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হল। এ বাহিনী মুজিবের বাহিনী এবং তাঁর কথায় ও তাঁর মোসাহেবদের কথায় তারা উঠতে বসতে থাকল।

অতঃপর ১৫ই আগস্ট '৭৫-এ শেখ মুজিব, তাঁর পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করা হল নির্মমভাবে। ফলে বাকশালরূপ একদলীয় জগদ্দল শাসন থেকে, অত্যাচার থেকে জাতি মুক্তি পেল। বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ খুলে গেল। মুজিবের মন্ত্রিসভার সদস্য খন্দকার মোশ্‌তাক দেশের প্রেসিডেন্ট হলেন। এটিও ছিল বাকশাল গর্ভজাত, মোশ্‌তাক সরকার। এ সময় আবার মিলিটারী ক্যু হয়। ২রা নভেম্বরের দিবাগত রাতে খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা দখল করেন এবং রাষ্ট্রপতি মোশ্‌তাককে ক্ষমতায় রেখে সেনাপ্রধান জিয়াকে গৃহবন্দী করেন। ঠিক এসময়েই ২রা নভেম্বর রাত তিনটার পর চার জাতীয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অসহায় বন্দী জিয়া ঘরে বসে তা শুনতে পান। তখন স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াকে সিপাহী-জনতা পাল্টা সংগ্রামের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফকে হত্যা করে মুক্ত করেন ও প্রধান সেনাপতির আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। জিয়াও একজন দক্ষ রাজনৈতিক নেতার মত বাকশালের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেন ও বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন : একজন সামরিক কর্মকর্তার হাত দিয়ে গণতন্ত্রে উত্তরণ—এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। মহান নেতা স্বাধীনতার ঘোষক জিয়ার পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। অতঃপর জিয়া রাজনৈতিক অনুশীলনের মাধ্যমে প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী ও

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যশীল ব্যক্তিদের নিয়ে প্রথমে জাগদল ও পরে তারই মধ্য দিয়ে Bangladesh Nationalist Party (B.N.P) বা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি. এন. পি. গঠন করেন। এদেশে এর সঙ্গে সঙ্গে আরো বহুদল গঠিত হয় বাকশাল মুখ থুবরে পড়ে গেলেও তার প্রেতাত্মা নিয়ে শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বাকশাল গর্ভজাত আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। অতঃপর ভারতের ইঙ্গিতবাহী কুচক্রী মহল দেশের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেয়ার মানসে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে নির্মমভাবে হত্যা করে। শহীদ হন বাংলার নব-ইতিহাসের জনক স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষক বীরমুক্তিযোদ্ধা জেড ফোর্সের সর্বাধিনায়ক, বি.এন.পি-এর চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। অতঃপর বি. এন. পি.-র হাল ধরেন চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া— প্রাক্তন বিচারপতি আ: ছাত্তারের অবসর গ্রহণের পর। এ হল জিয়া, খালেদা ও বি. এন. পি.-এর সংক্ষিপ্ত ঘটনাচক্র। এখন আমরা এ নিয়ে আরো কিছু বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই।

রাষ্ট্রপতি জিয়ার জীবনী ও কার্যক্রমের সঠিক মূল্যায়ন হওয়া উচিত, একথা স্বীকার করতেই হয়। অথচ এ বিষয়ে বুদ্ধিজীবিগণ এগিয়ে এলেও গবেষণাধর্মী মন নিয়ে এখনও এগিয়ে আসছেন না কেউ। অবশ্য যে- দু'চারটি গ্রন্থ তাঁকে ও বেগম খালেদাকে নিয়ে রচিত হয়েছে, তাও লেখকের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই করা হয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে বি. এন. পি.-র দলীয় দায়িত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। জিয়াই এসব নেতাদের মূল্যায়ন করে তাঁদের যোগ্যতর আসনে প্রতিষ্ঠা করে যে সম্মান দেখিয়েছে, তা একেবারে তুচ্ছ নয়। কাজেই বুদ্ধিজীবীদের কাজে লাগানোর জন্য যে সহযোগিতা প্রয়োজন— সে ধরনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা তাঁরা পাচ্ছেন না। এদিক থেকে আওয়ামী লীগ অনেক এগিয়ে আছেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাই এদিকে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে বি. এন. পি.-র চেয়ারপার্সন স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ (ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) – সম্পাদিত 'জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় যা বলেছেন, তা এখানে স্মরণ করা যায় :

> ঃ আমাদের দুর্ভাগ্য, এই মহান জাতীয় নেতার কার্যক্রম ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা-সমৃদ্ধ গ্রন্থের স্বল্পতা অত্যন্ত প্রকট, অথচ তাঁর চিন্তা-ভাবনা এবং আদর্শই জাতিকে সুখী ও সমৃদ্ধ হবার সাহস যোগাতে পারে। শক্তিশালী করার উৎস হতে পারে। এ লক্ষ্যে আলোচ্যগ্রন্থটি একটি মূল্যবান সংযোজন। ঃ

বেগম জিয়ার এ বক্তব্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সেজন্য বি. এন. পি. দলের কর্তৃপক্ষ ও বুদ্ধিজীবী মিলে একটি গবেষণা সেল তৈরী করে এ কাজে হাত দিতে পারেন। বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের পুরোভাগে আছেন প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন (ঢাকা), প্রফেসর ড. আনিসুর রহমান (রাজশাহী), প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামানসহ অনেকে। আমি ওয়াদা করছি, এসব ব্যাপারে বা বি. এন. পি.-র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যদি আমাকে প্রয়োজন হয়, আমি সে আহ্বানে সারা দেব। তবে নিবেদিত প্রাণ গবেষক ড. এমাজউদ্দীন ও তাঁর কিছু সহযোগী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নিয়ে এবং জিয়ার আদর্শ ও কর্মকাণ্ড নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন— একথা নিঃসংকোচে বলা চলে। ইতিমধ্যে ড. এমাজউদ্দীন এ নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

বাল্যকাল থেকেই জিয়া ছিলেন ন্যায়-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং স্বদেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল প্রগাঢ়। বাল্যকালের ও তরুণ বয়সের কার্যকলাপের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় পরবর্তিকালে জিয়াউর রহমান-রচিত "একটি জাতির জন্ম"— শীর্ষক প্রবন্ধে। এতে তিনি লিখেছেন :

স্কুল জীবন থেকেই পাকিস্তানীদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা আমার মনকে পীড়া দিতো। আমি জানতাম, অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুল-জীবনে বহুদিনই শুনেছি আমার স্কুল-বন্ধুদের আলোচনা। তাদের অভিভাবকরা বাড়িতে বলত তাই তারা রোমন্থন করতো স্কুল প্রাঙ্গণে। আমি শুনতাম, মাঝে মাঝেই শুনতাম, তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশকে শোষণ করার বিষয়। পাকিস্তানী তরুণ সমাজকেই শেখানো হতো বাঙালিদের ঘৃণা করতে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটি ঘৃণার বীজ উপ্ত করে দেয়া হতো স্কুল-ছাত্রদের শিশু মনেই। স্কুলে শিক্ষা দেয়া হতো তাদের বাঙালিকে নিকৃষ্টতম জাতিরূপে বিবেচনা করতে। অনেক সময় আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। আবার মাঝে মধ্যে প্রত্যাঘাত হানতাম আমিও। সেই স্কুল জীবন থেকেই মনে মনে আমার একটি আকাঙ্ক্ষাই পালিত হতো, যদি কখন দিন আসে, তাহলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানবো। সযত্নে এ ভাবনাটাকে আমি লালন করতাম। আমি বড় হলাম। সময়ের সাথে সাথে আমার সেই কিশোর মনের ভাবনাটাও পরিণত হল। জোরদার হল। পাকিস্তানী পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার দূর্বারতম আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠত মাঝে মাঝেই। উদগ্র কামনা জাগ্রত হতো পাকিস্তানের ভিত্তি ভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্ক্ষাকে।ঃ

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্ম বাংলাদেশের বগুড়া জেলার বাগমারী গ্রামে। জিয়ার বাল্যনাম কমল। পিতা মনসুর রহমান। তিনি উঁচুমাপের একজন রসায়নবিদ ও রসায়ন গবেষক ছিলেন। জিয়া প্রথম জীবনে কলকাতার চাচার বাসায় থেকে কলকাতার হেয়ার স্কুলে লেখাপড়া শুরু করেন। তাঁর ভাইও চাচার বাসায় থেকে একই স্কুলে লেখাপড়া করতেন। ১০/১১ বছর ধরে দু'ভাই সেখানে লেখাপড়া করাকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জাপানী বোমা পড়ে কলকাতায়। আরও কয়েকটি বোমা পড়লে সকলে কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে থাকলে, জিয়ার চাচাও ছেলেমেয়ে নিয়ে বগুড়ায় চলে আসেন। গ্রামের বাড়িতে তাঁদের স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হলে সেখানেই তাঁরা লেখাপড়া করতে থাকেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালের দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে জিয়াদের নিয়ে তাঁর পিতা করাচীতে চলে যান।' সেখানে জিয়া ম্যাট্রিক পাস করে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর ডাক্তারী বা অধ্যাপনা করার ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি।

জিয়ার বাল্যকালের সে-আকাঙ্ক্ষা ক্রমান্বয়ে পুষ্ট হতে থাকে। সে বাসনা মুক্তির পথ খোঁজে। পাকিস্তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য আকুলি-বিকুলি করে তাঁর মন। সামরিক চাকরীতে অবস্থানকালে তা আরও তীব্রভাবে তাকে আঘাত হানে। এ বাঁধন ভাঙতে হবে বলে মন কখনওবা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পাকিস্তানীদের প্রভুত্ব ও অবজ্ঞা বড় বেশি করে জিয়ার মনে বাজে, সুযোগ খোঁজে মুক্তির। অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের সে সুযোগ আসে। মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। আর সকলে

www.nagorikpathagar.org

বিশেষত জিয়া স্বপ্ন দেখেন শিকল ভাঙার। সুযোগ আসে মাহেন্দ্রক্ষণে এক মহান দায়িত্ব পালনের। জিয়া স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে সে শিকল ভেঙে ফেলেন। এ সুযোগ হাত ছাড়া করেন না তিনি, হয়ত ভাবেন মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে আবার মোড় ঘুরে যাবে। পরাধীনতার নিগড়ে আবার আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে আমাদের বাঙালিদের।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পাক-সরকার বাংলাদেশকে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে চিরতরে দাস করে রাখতে চায়। শিক্ষা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অন্ন-বস্ত্র, অর্থনীতি, সরকার গঠন, প্রশাসন পরিচালনা প্রকৃতি সকল ক্ষেত্রে আমাদের দাবিয়ে রাখার মনোবৃত্তি তাদের মধ্যে কাজ করে। পাক-সরকার প্রধান মি. জিন্নাহ সে পথের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রথম আঘাত হানেন, বাংলাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে একেবারে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করেন। তাঁরা সেন রাজাদের মত উর্দুকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এদেশে— ফলে সবক্ষেত্রেই আমাদেরকে পদদলিত করে রাখার কৌশল করে জিন্না ও তাঁর অনুসারিগণ। বেশ আগে থেকেই জিয়া ওঁদের সাহচর্যে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন— তাঁদের আঘাত, তাঁদের ষড়যন্ত্র, তাঁদের পরিকল্পনা কি ছিল। সে কথাটি জিয়াউর রহমান তাঁর প্রবন্ধে সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

> ঃ পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে মি. জিন্নাহ যেদিন ঘোষণা করলেন উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, সেদিন নিজের অজান্তে পাকিস্তানের স্রষ্টা নিজেই অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের ধ্বংসের বীজটাও বপন করে গিয়েছিলেন এ ঢাকার ময়দানেই। এ ঐতিহাসিক নগরী ঢাকাতেই মি. জিন্নাহ অত্যন্ত নগ্নভাবে পদদলিত করেছিলেন আমাদের জনগণের জন্মগত অধিকার। আর এই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতেই চূড়ান্তভাবে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেল তাঁর সাধের পাকিস্তান। ঃ

জিন্নাহর এ ভাষণেই এদেশের মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পেল। বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা এ দাবী ক্রমান্বয়ে সোচ্চার হয়ে উঠল। তাদের অত্যাচারে আমাদের দেশ দরিদ্র ও হীনবল হয়ে পড়ল। এমনিভাবে তারা সম্ভ্রম নষ্ট করল আমাদের। এ সম্ভ্রম হানির চিত্রও একই গ্রন্থের একই প্রবন্ধে জিয়া সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করেছেন।

> ঃ সামরিক একাডেমীতে থাকাকালেও আমি সম্মুখীন হয়েছি শুধু নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতার। সেখানে দেখেছি বাঙালি ক্যাডেটদের প্রতি পাকিস্তানীদের একই অবজ্ঞার ঐতিহ্যবাহী প্রতিচ্ছবি। অবৈধ উপায়ে পাকিস্তানীদের দেখেছি বাঙালি ক্যাডেটদের কোণঠাসা করতে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যেমন, আমি যখন শিক্ষক তখনো তেমনিভাবেই বাঙালি ক্যাডেটদের ভাগ্যে জুটতো শুধু অবহেলা, অবজ্ঞা আর ঘৃণা। আন্তঃসার্ভিস বোর্ডে গ্রহণ করা হতো নিম্নমানের বাঙালি ছেলেদের। ভালো ছেলেদের দেয়া হতো না ক্যাডেট রূপে। রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দরিদ্র পরিবারের নামে প্রত্যাখ্যান করা হতো তাদের। এর সব কিছুই আমাকে ব্যথিত করতো। এ সামরিক একাডেমীতেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করলো। একাডেমীর গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল সব বিষয়ের ভালো ভালো বই।

www.nagorikpathagar.org

আমি জ্ঞানার্জনের এ সুযোগ গ্রহণ করলাম। আমি ব্যাপক পড়াশুনা করলাম ১৮৫ . সালের সিপাহী বিপ্লব সম্পর্কে (বৃটিশ ঐতিহাসিকরা এটাকে আখ্যায়িত করেছিল "বিদ্রোহ" হিসেবে)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্রোহ ছিল না, এটা ছিল এক মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ। ঃ

সামরিক বিভাগের পাক-কর্মকর্তারা শুধু অত্যাচারই করত না বা সুযোগ পেলেই শুধু পর্যুদস্তই করত না, বাঙালিদের দাবিয়ে রাখার দীর্ঘ পরিকল্পনা তাঁরা করছিল। তাদের একটি ব্যাপারে ভয় হয়েছিল খুব। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের সময়ে জিয়াসহ বাঙালি ব্যাটেলিয়ন খেমখারান রণাঙ্গনের বেদিয়ানে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। জিয়া ছিলেন সেই যুদ্ধের সেনাপ্রধান। একই প্রবন্ধে জিয়া বলেছেন।

ঃ এ ব্যাটেলিয়নই লাভ করেছিল পাকবাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্বপদক। ব্যাটেলিয়নের পুরস্কার বিজয়ী কোম্পানী ছিল আমার কোম্পানী "আলফা কোম্পানী"। এ কোম্পানী যুদ্ধ করেছিল ভারতীয় সপ্তদশ রাজপুত, উনবিংশ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি, ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাভাল্‌রীর (সাঁজোয়া বহর) বিরুদ্ধে। এ কোম্পানীর জোয়ানরা এককভাবে ও সম্মিলিতভাবে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে। ঘায়েল করেছে প্রতিপক্ষকে। বহুসংখ্যক প্রতিপক্ষকে হতাহত করে। যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করে এই কোম্পানী অর্জন করেছিল সৈনিকসুলভ মর্যাদা। ঃ

খেমখারানের যুদ্ধে পাকিস্তানের ভ্রম ভেঙে গিয়েছিল। তারা বুঝেছিল এ যুদ্ধে বাঙালি সেনারা তাদের চেয়ে কম নয়। বরং অনেক ভাল। শুধু খেমখারান যুদ্ধে নয়, পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে বাঙালি পাইলটরা অর্জন করেছিল সর্বাধিক সম্মান। এ বীরত্ব বাঙালিদের চোখ খুলে দিয়েছিল। এর ফলে জাতিসত্তার বিকাশ ঘটতে থাকে এদেশের জনমনে, সামরিক বিভাগে। এমনি করে আত্মসচেতনতার সৃষ্টি হতে থাকে ক্রমান্বয়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদপত্রে বাঙালি সেনাদের প্রশংসায় এদেশের সেনাদের মধ্যে উৎসাহ যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, অন্যদিকে তাদের উৎসাহের পরিবর্তে জন্ম নেয় ঈর্ষা। ফলে গোপনে পাকসেনাবাহিনীতে যে-সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা জিয়ার ভাষায় উদ্ধৃত হল :

ঃ এসব কিছুর পরিণতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনী গ্রহণ করলো এক গোপন পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ঠিক করল প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালিদের আনুপাতিক হার কমাতে হবে। তারা তাদের এ গোপন পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করলো। কিন্তু এ গোপনতথ্য আমাদের কাছে গোপন ছিল না। ঃ

ইতিপূর্বেই '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। স্বাধিকারের পথে এগিয়ে চলে এদেশের জনগণ,— বুদ্ধিজীবী, লেখক, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী। চুয়ান্ন সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়ে পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে রায় প্রকাশ করল বাংলাদেশের জনগণ। জিয়াকেও ভাষা আন্দোলন ও চুয়ান্নর নির্বাচন এত বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল যে তাঁর জীবনের একটি ঘটনা থেকে তার প্রমাণ মেলে। তাঁরই বক্তব্যে পাই।

ঃ ১৯৫২ সালে মশাল জ্বললো আন্দোলনের। ভাষা আন্দোলনের সময় আমি তখন করাচীতে। দশম শ্রেণীর ছাত্র। পাকিস্তানী সংবাদপত্র, প্রচার মাধ্যম, পাকিস্তানী

www.nagorikpathagar.org

বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মচারী, সেনাবাহিনী, আর জনগণ সবাই সমানভাবে তখন নিন্দা করছিল বাংলা ভাষার। নিন্দা করছিল বাঙালিদের। তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা এটাকে মনে করেছিল এক চক্রান্ত বলে। এক সুরে তাই তারা চেয়েছিল একে ধ্বংস করে দিতে। আহ্বান জানিয়েছিল এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের। কেউবা বলত বাঙালি জাতির মাথা গুঁড়িয়ে দাও, কেউ বলত ভেঙে দাও শির দাঁড়া। এদের থেকেই তখন আমার ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানীরা বাঙালিদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা চায় বাঙালিদের উপর ছড়ি ঘুরাতে। কেড়ে নিতে চায় বাঙালিদের সব অধিকার। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক রূপে বাঙালিদের মেনে নিতে তারা কুণ্ঠিত।

১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হল নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের বিজয় রথের চাকার নিচে পিষ্ট হল মুসলিম লীগ। বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক যুক্তফ্রন্টের বিজয় কেতন উড়লো বাংলায়। আমি তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্যাডেট। আমাদের মনেও জাগলো তখন পুলকের শিহরণ। যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্যে আনন্দে উদ্বেলিত হলাম আমরা সবাই, পর্বতে ঘেরা এ্যাবোটাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আমরা বাঙালি ক্যাডেটরা আনন্দে হলাম আত্মহারা। খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলাম সেই বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দের তরঙ্গমালা। একাডেমী ক্যাফেটেরিয়ায় বিজয় উৎসব করলাম আমরা। এ ছিল আমাদের বাংলা ভাষার জয়। এ ছিল আমাদের অধিকারের জয়। এ ছিল আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জয়। এ ছিল আমাদের জনগণের, আমাদের দেশের এক বিরাট সাফল্য।

এই সময়েই একদিন কতকগুলো পাকিস্তানী ক্যাডেট আমাদের জাতীয় নেতা ও জাতীয় বীরদের গালাগাল করলো। আখ্যায়িত করল তাঁদের বিশ্বাসঘাতক বলে। আমরা প্রতিবাদ করলাম। অবতীর্ণ হলাম তাদের সাথে এক উষ্ণতম কথা কাটাকাটিতে। মুখের কথা কাটাকাটিতে এ বিরোধের মীমাংসা হল না। ঠিক হল, এর ফয়সালা হবে মুষ্টিযুদ্ধের দ্বন্দ্বে। বাঙালিদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বক্সিং গ্লাভস হাতে তুলে নিলাম আমি। পাকিস্তানী গোঁয়ার্তুমীর মান বাঁচাতে এগিয়ে এল এক পাকিস্তানী ক্যাডেট। নাম তার লতিফ। লতিফ প্রতিজ্ঞা করল সে আমাকে একটু শিক্ষা দেবে। পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে যাতে আর কথা না বলতে পারি সেই ব্যবস্থা নাকি সে করবে।

এ মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে সেদিন জমা হয়েছিল অনেক দর্শক। তুমুল করতালির মাঝে শুরু হল মুষ্টিযুদ্ধ। বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের দুই প্রতিনিধির মধ্যে। লতিফ আর তার পরিষদ অকথ্য ভাষায় আমাদের গালাগাল করলো। হুমকি দিলো বহুতর। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধ স্থায়ী হলোনা ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি। পাকিস্তান পন্থী আমার প্রতিপক্ষ ধুলোয় লুটিয়ে পড়লো। আবেদন জানালো, সব বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য। ঃ

জিয়া পাকবাহিনীতে থেকে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। '৫২ এবং চুয়ান্নর বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন, তাদের চরিত্র ও ব্যবহার সম্পর্কে, তাদের হিংসা, ঈর্ষা

www.nagorikpathagar.org

ও স্বার্থপরতা সম্পর্কে বুঝে নিয়েছেন সব। স্বাধীনতা ছাড়া এদেশ আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। সেটা বুঝেই চট্টগ্রামে সামরিক ও বিডিআর বাহিনীকে নিয়ে রিভল্ট করেছিলেন। I Revolt, একথা এ কারণে প্রথমে তাঁর মুখ দিয়েই বেরিয়েছিল। তিনি পাকিস্তানী মানসিকতা উপলব্ধি করেই মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাকেন ওদের বিরুদ্ধে লড়ার। সুযোগও এসে যায়— তিনিই মুক্তিযুদ্ধের অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেন। জিয়ার বাল্যকাল ও সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও পাকিস্তানের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা তখন থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির এক মানসিক প্রেরণায় জিয়াকে একাত্তরে এত বেশি বিপ্লবী করে তোলে। কেউ যেন আপোষ ফর্মূলায় বসে এ দেশের স্বাধীনতাকে বানচাল করে না দেয় সে কারণেই তাঁর এ দৃঢ়পদক্ষেপ। মীর শওকত আলীর প্রবন্ধের আলোকে বলি, আওয়ামী কর্মীদের প্রশ্নের জবাবে দৃঢ় অথচ নির্লিপ্তভাবে বলতে পেরেছিলেন, স্বাধীনতার ঘোষণা তো একজনকে দিতেই হতো। তাঁর মাথায় অন্য কোনো চিন্তা ছিল না। শুধু তাঁর সমগ্রচেতনায় ছিল এদেশের স্বাধীনতা।

'৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষার দাবী প্রতিষ্ঠা ও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান এবং '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বাঙালিদের বিজয় পাক-সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। গণতন্ত্রের পথে এবং সমতার ভিত্তিতেই যে এই দুই পৃথক স্থানে অবস্থিত পাকিস্তান টিকে থাকতে পারে তা তাঁরা কোনো দিনই ভাবেন নি। জোর করে ক্ষমতায় টিকে থাকার কৌশলকে তাঁদের রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেন। সে কারণে ১৯৫৮ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ ঘোষণা করা হলেও জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারী করে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে দেন। ফলে বাংলাদেশের জনগণ আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয় এবং সেই ধারাবাহিকতার পথ ধরেই ভাসানীর রাজনৈতিক কৌশলের কারণে এবং ভোটে না দাঁড়িয়ে তিনি আওয়ামী লীগকে সহযোগিতা করার কারণে এ দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

আইয়ুব খান সামরিক আইন জারী করে ক্ষমতালাভের পর বাংলাদেশকে দাবিয়ে রাখার এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেন। সাধারণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ইউনিয়ন কাউন্সিল ও পৌরসভার সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম কয়েক বছর পিছিয়ে যায়। সাধারণ মানুষের ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনে শেষপর্যন্ত জনতার জয় হয়। '৭০-এর নির্বাচনে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তারপরই শুরু হয় নতুন করে ষড়যন্ত্র। এখানে বলে রাখা ভাল, জেনারেল আইয়ুবের বেসিক ডেমোক্রেসী এবং মুজিবের বাকশালে আঙ্গিকগত পার্থক্য বিদ্যমান, তবে জনগণকে ধোঁকা দেয়া ও তাদেরকে দাবিয়ে রাখার কৌশলগত দিক একই। দু'টি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই জনগণের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে কায়েমী স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই জনগণের আন্দোলনের মুখেই ওই দুই স্বভাবের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (বেসিক ডিমোক্রেসী ও বাকশাল) টেকেনি। টেকেন নি এর প্রতিষ্ঠাতাগণ।

www.nagorikpathagar.org

বর্তমানে বেগম খালেদা জিয়াকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে এদেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা বিনষ্টকারী দলের বিরুদ্ধে, যারা ভারতের একজাতিতত্ত্বকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাঁকে লড়তে হচ্ছে আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে, যাঁরা বর্তমানে বহু জাতির জন্মলগ্নে দ্বিজাতিতত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করে এবং পাকিস্তান সৃষ্টি ভুল হয়েছিল বলে প্রমাণ করে একজাতিতত্ত্বের স্বপ্নকাতর হয়ে এদেশকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিবেশীদেশের হিংস্র থাবার বিরুদ্ধে ও তাদের অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে ম্যাডাম খালেদা জিয়াকে। চারদিকের ঝড়কে সামলে নিতে হচ্ছে তাঁকেই।

বৈষম্যজাত কারণে পূর্ব পাকিস্তানী তথা বাঙালিদের এ সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র সামরিক বিভাগেও শুরু হয়। যার সূত্র ধরেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাক-বাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা, নির্যাতন, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে করতে থাকে। জিয়া তাদের এ-গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। সে কারণে তিনি বাংলাদেশের মিলিটারী অফিসার ও সাধারণ সেনাদের সঙ্গে গোপনে যোগসূত্র রক্ষা করে চলতেন। জিয়ার অতীত জীবনেও এ-চেতনা লক্ষ্য করি। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে ১৯৬৯ সালে জয়দেবপুরে যোগদানের পর পাক-সরকারের ও পাক সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের সে মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। এ সম্পর্কে জিয়া বলেন :

ঃ ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে নিয়োগ করা হল জয়দেবপুরে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নে আমি ছিলাম সেকেন্ড ইন কমান্ড। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লে: কর্ণেল আবদুল কাইয়ুম ছিল একজন পাকিস্তানী। একদিন ময়মনসিংহের এক ভোজসভায় ধমকের সুরে সে ঘোষণা করলো,— "বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে তাহলে সামরিক আইনের সত্যিকার ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তপাত।" এ ভোজসভায় কয়েকজন বেসামরিক ভদ্রলোকও ছিলেন। তাঁদের মাঝে ছিলেন ময়মনসিংহের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব মোকাম্মেল। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল কাইয়ুমের দম্ভোক্তি আমাদের বিস্মিত করলো। এর আগে কাইয়ুম এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদে পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকদের সাথে সংযোগ ছিল তার। তার মুখে তার পুরানো প্রভুদের মনের কথাই ভাষা পেয়েছে, কিন্তু তাই আমি ভাবছিলাম। পরবর্তী সময়ে আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করি এবং ওর কথা থেকে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সে যা বলেছে তা জেনে শুনেই বলেছে। উপযুক্ত সময়ে তা কার্যকরী করার জন্য সামরিক ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। আর কাইয়ুম সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমি এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পরি। এ-সময়ে আমি একদিন চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দফতরে যাই। জি এস ও-১ (গোয়েন্দা) লে: তাজ আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চায়। আমি তার এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞেস করি। সে আমাকে জানায় যে, তারা বাঙালি নেতাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। আমি বার বার তাকে জিজ্ঞেস করি, 'এসব খুঁটিনাটির প্রয়োজন কি?' এ

www.nagorikpathagar.org

প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, 'ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিধারায় এগুলো কাজে লাগবে।' গতিক যে বেশি সুবিধার নয়, তার সাথে আলোচনা করেই আমি তা বুঝতে পারি। সেই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে চার মাসের জন্য আমি পশ্চিম জার্মানী যাই। এ সময় বাংলাদেশের উপর দিয়ে এক রাজনৈতিক ঝড় বয়ে যায়। ঃ

জিয়া গণঅভ্যুত্থানের কথাই এখানে উল্লেখ করেছেন। গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আসাদ জীবন দিল বাংলাদেশের জন্য। ফলে ভাসানীর নেতৃত্বে আন্দোলন তীব্র হল, জীবন দিলেন আরো অনেকে। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। দেশ ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। পাক মিলিটারীর চলাচলের পথে নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করা হয়। গাছ, কাঁটা, ইট ইত্যাদি রাস্তায় রেখে ওদের যাতায়াতকে প্রতিহত করা হয়।

৭ই মার্চে জাতীয় নেতা শেখ মুজিবের ভাষণে দ্বি-মুখী বক্তব্যে মানুষ হতাশ হয়। ৪টি প্রস্তাব মেনে নেয়ার দাবীতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা লুকিয়ে থাকে তাঁর মনে। 'জয় পাকিস্তান'–এর মাধ্যমে বক্তব্য সমাপ্তির পর লোকে তা বুঝতে পারে। মুজিব স্বাধীনতা চান না, স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চান। ৭ই মার্চের ভাষণের পর মুজিবকে বিতর্কিত করে তুললেও তাঁর নামেই স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তা নেতা-কর্মী ও জনগণ বুঝতে পারেন। অনেকে মনে করেন, প্রয়োজনে তাঁকে বন্দী করেও একাজ করতে হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চালাতে হবে।

'শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ ও একটি বিবৃতি' (শাহ্ আহমদ রেজা দৈনিক ইনকিলাব, ৩রা মার্চ ১৯৯৮) শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "১৯৭১ সালের মার্চে পালিত তাঁর ভূমিকার কোনো কোনো দিক ছিল অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর।"

এ প্রবন্ধে আরো দেখি,—

ঃ ড. কামাল হোসেন আরো জানিয়েছেন, ওয়ার্কিং কমিটি (আ: লীগ)-র সভা চলাকালেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অত্যন্ত উস্কানিমূলক ভাষণটি প্রচারিত হয় এবং তার পরেরটিতে একজন পাকিস্তানী ব্রিগেডিয়ার শেখ মুজিবের সঙ্গে গোপনে দেখা ও বৈঠক করেন। এ ব্রিগেডিয়ার শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্টের একটি বার্তাও পৌঁছে দিয়েছিলেন। দু'জনার আলোচনার এবং বার্তার বিষয়বস্তু জানতে না পারলেও সমগ্র বিষয়কে ড. কামাল হোসেন কৌতূহলোদ্দীপক যোগাযোগ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন । ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৬৪।

এখানে ড. জি ডব্লিউ চৌধুরীর দ্যা লাস্ট ডেইজ অফ ইউনাইটেড পাকিস্তান : ১৯৭৪, পৃ. ১৫৮ হতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।

ঃ ৭ই মার্চ ... জনসভার প্রাক্কালে শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে টেলিফোনে দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং প্রেসিডেন্টের নির্দেশে ড. চৌধুরী তাঁর সামনে উপস্থিত থাকেন। তিনি লিখেছেন, দু'জনের মনোভাবই তখনো আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল, দু'জনই তখন পর্যন্ত সমঝোতায় আসার জন্য আগ্রহী ছিলেন। ঃ

www.nagorikpathagar.org

একই দিনের দৈনিক ইনকিলাব থেকে—

ঃ আগের দিনের বার্তার ভিত্তিতেই শেখ মুজিবের পরবর্তী কৌশল ও কার্যক্রম প্রণীত হয়েছিল বলে ইতিহাস-গবেষকরা মনে করেন। ঃ

মনে হয়, ইয়াহিয়া খানের আশ্বাসের ভিত্তিতেই প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের জন্য ২৫ শে মার্চ '৭১ পর্যন্ত মুজিব ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যান। অন্যদিকে কূটকুশলী ইয়াহিয়া ইতোমধ্যে বাংলাদেশে তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে। অপরদিকে একাত্তরের গোটা মার্চ শেখ মুজিবের আচরণে ও কার্যক্রমে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছাই প্রকাশিত হয় এবং ২৭শে মার্চের হরতাল আহ্বান সেটাকে আরো সুদৃঢ় করে তোলে। তবু এ সংকটকালে তাঁর বিতর্কিত নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে সংকট বাড়াতে চাননি কেউ। শুধু সমগ্র জনতা ও নেতাকর্মী স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে এগিয়ে গেছেন। ভাসানী, আতাউর রহমান খান, কাজী জাফর, তাজউদ্দীনসহ অনেকেই তাঁকে বার বার স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলতে বলেছেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য ইঙ্গিতও প্রদান করেছেন। কিন্তু মুজিব তা করেন নি। সে কারণে বিদেশের কোনো কোনো পত্রিকায় এসেছে প্রগতিশীল তরুণসমাজ মুজিবকে বন্দী করে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। অবশেষে তিনি স্ব-ইচ্ছায় বন্দী হলেন এবং তাঁর পরিবারবর্গ একাত্তরে সরকারি ভাতায় নিজ বাসভবনে দীর্ঘ নয় মাস আরামেই কাটালেন। এ কারণে কোন উপায় না দেখে মেজর জিয়াকেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হল। এসম্পর্কে স্বাধীন বাংলার প্রথম সরকার তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৭১ সালের ১১ই এপ্রিল যে ভাষণ দেন সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে "জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ" গ্রন্থের সম্পাদক ড. এমাজউদ্দীন গ্রন্থের মুখ বন্ধে বলেন।

ঃ একই বক্তৃতায় মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণার কথা উল্লেখ করে তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, "এই প্রাথমিক বিজয়ের সাথে সাথে মেজর জিয়াউর রহমান একটি পরিচালনাকেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর" (স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ২য় খণ্ড) । .... ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে— নভেম্বরে ইন্দিরা গান্ধী.... নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের এক সমাবেশে ৬ নভেম্বর তারিখে বলেন, "The cry for independence arose after Shekh Mujib was arrested and not before. He himself, so for as I know, has not asked for independence even now." ঃ

জার্মানীতে ট্রেনিং শেষ করে ১৯৭০ সালে জিয়াকে নিয়োগ দান করা হয় চট্টগ্রামে। তিনি ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইতোমধ্যে তিনি বেগম খালেদাকে বিয়ে করেছেন এবং তাঁর দুই সন্তানেরও জন্ম হয়েছে। বেগম জিয়াও তাঁর স্বামীর সঙ্গে থেকে বুঝতে পারলেন ক্ষুব্ধ জন্মভূমিকে। ৬ দফা না এক দফা— এক দফা, এক দফা স্লোগানে মুখরিত দশদিক। ১ দফা রূপ স্বাধীনতার দিকেই সকলে ধাবিত। আর মুজিব বৃহৎ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। এতদিন তিনি জনতা যেদিকে তিনিও

www.nagorikpathagar.org

সেদিকে ছিলেন। এবার তিনি জনতার ইচ্ছার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করলেন। স্রোতের বিপরীতে যেতে চাইলেন। প্রধানমন্ত্রী হতে চাইলেন ৭ মার্চের ভাষণে ও তার পরবর্তী আলোচনায়। জিয়া তাঁর বাল্যকালের আঘাত খেয়ে জেগে ওঠা লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে চাইলেন। বন্দী মুজিব জনতার স্রোতকে উল্টা দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন— তার বন্দীত্বের কারণে সে প্রতিবন্ধকতাও রইল না। দেশ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত। বাংলাদেশের মিলিটারী ও তার অফিসারগণ মি. কর্ণেল চৌধুরীর শাহাদাৎ বরণের পর জিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে লাগলেন। জিয়ার মনে উত্তেজনা। এখানে একটি কথা বলা দরকার, জিয়ার সহধর্মিণী বেগম খালেদা, যিনি জিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি. এন. পি.-র চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এ দলের এবং এদেশের হাল ধরে আছেন। পরাশক্তির থাবা থেকে দেশটাকে আগলে রেখেছেন— তিনিও এ স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

জিয়ার এ সব কাজে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা দান করেন ঘরে থেকে এবং বাইরে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন পরামর্শ সভায় যেয়ে— তা আমরা জানি। এছাড়া জাতীয় প্রয়োজনে জিয়া যখন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন বেগম জিয়ার সমর্থন ছিল। তারপর খালেদাকে দীর্ঘ নয় মাস আত্মগোপন, কখনওবা দুই সন্তানকে নিয়ে বন্দী জীবন, কখনওবা সন্তানদের সঙ্গে করে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। তিনি অনেকের আশ্রয়ও পেয়েছিলেন আবার বিতাড়িতও হয়েছিলেন। সমগ্র বাংলাদেশের মানুষদের মত তিনিও সংগ্রাম করেছেন— আজও করছেন। খালেদা জিয়ার একটি বক্তব্যে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠেছে এবং এর সঙ্গে তাঁর হৃদয় বেদনার ও হৃদয় জ্বালার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁর লেখায়, "মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ড থেকে জন্ম লাভ করা বাংলাদেশে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের (মুজিবের কারণে) অনুগত এক জনপদে রূপান্তরিত হয়।" এ বক্তব্যের মধ্যে তাঁর জীবনের কর্মকাণ্ড ও জনগণের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। তাই বেগম জিয়া এদেশের মানুষের হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করে সকলকে সেপথে চলার ইঙ্গিত দান করেন। বেগম খালেদা বলেন—

> ঃ তিনি (জিয়া) কিন্তু বেঁচে রয়েছেন তাঁর কোটি কোটি অনুসারীদের মনের মণিকোঠায় তাঁর দেশপ্রেমের মাধ্যমে। তাঁর আদর্শের মাধ্যমে। বিশেষভাবে তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণার মাধ্যমে। ঃ

থাক সে কথা। একাত্তরের ইতিহাস থেকে উঠে আসে জিয়ার তরুণ মনের উত্তেজনা। আর সব উত্তেজিত মিলিটারী অফিসারদের মধ্যে শলাপরামর্শ, নজরুলের ভাষায় বলি, "বাহিরে অন্তরে ঝড় উঠিয়াছে, আশ্রয় যাবি হয়ে কাহারই কাছে।" যাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া যেত তিনি স্ব-ইচ্ছায় বন্দী জীবন যাপন করছেন। সবচেয়ে কঠিন অবস্থা একাত্তরের সেসময়ে মুজিবকে সমালোচনাও করা যাবে না, তাহলে স্বাধীনতা যুদ্ধকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যাবে। সে কারণে তাঁকে ব্যবহার করেই তাঁর অনুগতদের শান্ত রাখতে হয়। হিন্দুধর্মে আছে কালীকে পূজো দিয়ে কালীকে শান্ত রাখতে হয়। বেগম জিয়া ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমির স্বাধীনতা লাভের জন্য বাংলাদেশের এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন। জিয়ার কার্যক্রম ও তাঁর নেতৃত্বকে সহযোগিতা করতে থাকলেন। তিনি একাত্তরে জিয়ার সঙ্গে এ নিয়ে শলাপরামর্শ করেন।

www.nagorikpathagar.org

জিয়াও 'বিপদে আপনজন জেনে বুকে ভরসা নিয়ে' খালেদার কাছে গিয়ে দাঁড়ান, পরামর্শ নেন, পরামর্শ দেন, মত বিনিময় হয়, প্রয়োজনে যেকোনো কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য দু'জনে প্রস্তুত হতে থাকেন। এ স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্রমান্বয়ে দু'জনেই হয়ে ওঠেন একই স্বত্তার অধিকারী। শুধু স্বাধীনতা লাভই হয় তাঁদের একমাত্র কাম্য। করাচীর তিক্ততা, তাদের আচরণের নির্মম চিত্র জিয়াকে এ কাজে আরও বেশি উৎসাহিত করে। সে কারণে মেজর ও রাষ্ট্রপতি জিয়াকে যেমন পেয়েছি সংকটকালে, স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণায়, স্বাধীনতা যুদ্ধে, ৭ই নভেম্বরের সংহতি ও বিপ্লব দিবসে, দেশ শাসনে, দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে, বি. এন. পি.-গঠনে তেমনি তাঁর কর্মের প্রেরণা দাত্রীরূপে স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন তাঁর পাশে, তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের শরীক হয়ে। সে কারণেই শহীদ জিয়ার আদর্শকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁকেই। তিনিই বি. এন. পি.-র সহযোগিতায়, আগ্রাসী শক্তি ও পরদেশের থাবা থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ কাজ করে যাচ্ছেন; বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আলোকে এবং মুক্তিযুদ্ধের ফসল স্বাধীনতার আলোকে এদেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন বি. এন. পি.-এর নেতা-কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে। জনগণের সমর্থন নিয়ে। বাকশাল পরবর্তী দেশটাকে একদলীয় শাসনের শৃঙ্খল মুক্ত করে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ জিয়া সুগম করে দেন। আর সেই গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাকে সার্থক করে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছেন ক্ষমতায় থেকে ও ক্ষমতার বাইরে থেকে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস বাংলাদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় মাস। এ মাসে শেখ মুজিব ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও দেশের শাসনভার গ্রহণের জন্য আলোচনা করেন দিনের পর দিন, আলোচনার অগ্রগতি হচ্ছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। অপরদিকে রব- মাখন-শাজাহানসহ ছাত্রসমাজ স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন, ৭ই নভেম্বর "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" বক্তৃতা দিয়ে ও তারই মাঝে চার দফা দাবী আদায়ের জন্য যে ধারাবর্ণনা করেন তাতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ারই বাসনা প্রকাশিত হয়। ২৩শে মার্চ নওগাঁয় দশ-এগার হাজার দর্শকের সামনে 'রক্তশপথ'–নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। সে নাট্যসাহিত্যে স্বাধীনতার কথা দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, সমস্ত দেশ এ মাসে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এ মাসেই শেখ মুজিব বন্দীত্ব গ্রহণ করেন এবং সর্বশেষে এদেশেরই এক কৃতী সন্তান মেজর জিয়া ২৭শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। যার ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়, প্রবাসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়। এসব কারণে দেশ স্বাধীন হয়, আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। তাই একাত্তরের মার্চ জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় মাস। অপরদিকে এ মাসেই পাক সেনারা নিষ্ঠুরভাবে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ২৫শে মার্চ রাতে ৫০ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে, লক্ষ লক্ষ মানুষ নির্যাতিত, আহত ও ধর্ষিত হয়। সমস্ত দেশ মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। তাই এমাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা। ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে "স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী আমরা" গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক খোন্দকার মকবুল হোসেন বলেন। (এ গ্রন্থের লেখক)

www.nagorikpathagar.org

ঃ শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলন, ৬ দফার পরিবর্তে ৪ দফা মেনে নিয়ে আপোষ করার ইচ্ছা প্রকাশ, ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে একাত্তরের ৭ই মার্চের পর অগ্রগতির নামে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যাওয়া এবং আলোচনা এগুচ্ছে বলে শেখ সাহেবের সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য দান, ২৭-শে মার্চে সারা দেশে হরতাল আহ্বান এসব কিছুই ইয়াহিয়াকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করার প্রক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। ২৫শে মার্চের রাতে পাকবাহিনী মুজিবকে বন্দী না করলে তাজউদ্দীন, কামরুজ্জামান, ক্যাপটেন মনসুরসহ কেন্দ্রীয় আ: লীগ নেতাগণ ২৬শে মার্চ তাঁকে আলোচনায় যেতে না দিয়ে অন্য পথ অবলম্বন করতেন বলে আমার মনে হয়। তাজউদ্দীন সাহেবের কথায় অবশ্য সে সুরই, সঙ্গত কারণে ফুটে উঠেছিল। ঃ

২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল স্থানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়। তখন থেকেই বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারী, সামরিক বাহিনী, বি. ডি. আর. ও পুলিশ প্রশাসনসহ সকল জনগণ এদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। তৎকালীন বাংলাদেশের নির্বাচনে ভাসানী ন্যাপের সার্বিক সমর্থনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে সর্বাধিক সদস্য নিয়ে বিজয়ী হয়। ফলে স্বাধীনতা পিপাসু বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা দানের মহান দায়িত্ব জাতি শেখ মুজিবের উপর অর্পণ করে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে তিনি সে দায়িত্ব পালন না করে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চান এবং সে আলোচনা তাঁর বন্দীত্ববরণের পূর্বপর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশেষে সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হয় একজন সামরিক অফিসার মেজর জিয়াকে। অবশ্য শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ৫/৭ জন নেতাই মুজিবের অবর্তমানে সে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। সাধারণ নেতার দ্বারা সে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। তবে চট্টগ্রামে সামরিক বিভাগ দেশের স্বাধীনতার জন্য সামরিক বিদ্রোহী বাহিনী গঠন করেন এবং তাঁর নেতৃত্বভার কর্ণেল চৌধুরীর পরই মেজর জিয়ার উপর পরে। সে কারণে মেজর জিয়া সঠিক সময়ে সঠিক দায়িত্বই পালন করেন। কারণ এ সামরিক বাহিনীকেই জনগণকে সঙ্গে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হয়। সেজন্য ফ্রান্সের কর্ণেল দ্যগলের মত তাঁকেই সে দায়িত্ব নিতে হয়েছে এবং দীর্ঘ নয় মাস এ সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে এবং সমগ্র জনগণ এ বাহিনীর অধীনেই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন। প্রবাসী সরকারপ্রধান তাজউদ্দীন সমর্থিত বাহিনীর প্রধানগণই সামরিক বাহিনী। জেনারেল ওসমানী মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ ও মি. শফি উল্লাহই ছিলেন সামরিক বাহিনীর লোক। এছাড়া মুজিব বাহিনী, নকশাল বাহিনী, কাদেরী বাহিনীসহ অনেক বাহিনী প্রবাসী সরকারের সমর্থনপুষ্ট বাহিনী। কিন্তু সরকারি বাহিনী মুক্তিবাহিনী। সেজন্য নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছিল সামরিক বিভাগের উপর। অথচ এ দায়িত্ব পালনের একমাত্র ক্ষমতা ছিল বন্দীত্ববরণকারী শেখ মুজিবের উপর। আমি ড. এমাজউদ্দীনের সে সম্পর্কিত বক্তব্য তুলে ধরে জনসমক্ষে তাঁর কার্যক্রমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চাই।

www.nagorikpathagar.org

ঃ ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত সেই ঐতিহাসিক জনসভায় যে দশ লাখের মতো মানুষ একত্রিত হয়েছিলো তারাও শুনতে চেয়েছিল তেমনি এক ঘোষণা। শুনতে চেয়েছিলো শেখ মুজিবের মুখ থেকে যে, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। জনগণ কিন্তু শেখ মুজিবের মুখ থেকে তেমন কথা শোনেনি। তিনি অবশ্য বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বক্তৃতার শেষে কিন্তু জয় বাংলা বলে জয় পাকিস্তানও বলেছিলেন। তিনি ৭ই মার্চের ভাষণে জাতীয় পরিষদের আগামী অধিবেশনে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসেবে যে চারটি দাবী তুলে ধরেন তাতেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার কোন ঠিকানা ছিল না। চারটি দাবী ছিল নিম্নরূপ :

১। অবিলম্বে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার।

২। সামরিক বাহিনীকে অবিলম্বে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া।

৩। সামরিক বাহিনীর হাতে প্রাণহানির তদন্ত।

৪। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বে নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা অর্পণ।

অন্য কথায়, এই দাবিগুলোর কোনো একটিতে স্বাধীন বাংলাদেশের কথা নেই। বরং বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা গেছে, ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ যে একদফাভিত্তিক আন্দোলনের সূচনা হয় তার রাশ টেনে ধরার প্রতিই ছিল তার বেশি ঝোঁক। অসহযোগ আন্দোলনকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন পাকিস্তানের সামগ্রিক কাঠামোয় ক্ষমতালাভের "প্রেসার কুকার" কৌশল হিসেবে। যেদিন ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়, সেদিন তিনি উত্তেজিত হয়ে তাঁর এক শুভানুধ্যায়ীকে বলেছিলেন, "ওরা আমাকে ডুবিয়ে মারবে।" ২৩শে মার্চ যখন কিছুসংখ্যক ছাত্রনেতা পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে তাঁর বাসভবনে পাকিস্তানের পতাকার বদলে বাংলাদেশের পতাকা তুলে দিয়ে আসেন, তখন তিনি তাঁদের বলেছিলেন, "তোরা ভেবেছিস্ কি?" মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফ্রান্সের নাম-করা পত্রিকা লামন্ডের সাথে এক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব নিজেই বলেছিলেন, "পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গ কি বোঝে না যে, আমি হচ্ছি তাদের শেষ ভরসা? আমি না হলে এখানে কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করে নেবে? তারা কেন আমার সাথে আপোষ রফা করছে না?" এ বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শেখ মুজিবের তখনকার কৌশল। ঐ সময়ে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা যে সম্পাদকীয় রচনা করেছিল, বিশেষ করে ২৩শে মার্চের পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলাদেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে, তাতেও বলা হয়েছিল "পূর্বে শেখ মুজিব বন্দী হয়ে রয়েছেন অতি প্রগতিবাদী ছাত্র-যুবকদের দ্বারা।"

সত্যি এসময় শেখ মুজিবকে চাপ সৃষ্টি করেন ভাসানী, আতাউর রহমান খান, রব, শাজাহান সিরাজ, মাখন গং, কাজী জাফর, তাজউদ্দীনসহ অনেকেই। নাটক, সঙ্গীত, সাহিত্য, পথসভা ইত্যাদিতে স্বাধীনতার কথা বলে চাপ সৃষ্টি করা হয়। তবু তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার শেষ কৌশল হিসেবে ২৭শে মার্চ সারাদেশে হরতাল

www.nagorikpathagar.org

আহ্বান করেন। যেখানে প্রকৃতপক্ষে মুজিবের শাসনই চলছিল বলা যায়, সেখানে আবার হরতাল আহ্বান করে তিনি শেখ মুজিবের (নিজের) শাসনকেই বিতর্কিত করে তুলেছিলেন। এটি বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় যাওয়ার এক কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়।

শেখ মুজিব যে স্বাধীনতা চাননি, তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর আলোচনা ও আলোচনার অগ্রগতি হচ্ছে বলাতে। মার্চের এসময় স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যেখানে দৃঢ় অবস্থান নেয়ার কথা, সেখানে তিনি অন্য চিন্তা-ভাবনায় থেকে স্বাধীনতার মূলপ্রেরণাকে নিস্তেজ করে দিচ্ছিলেন, যা স্বাধীনতার জন্য খুবই ক্ষতিকর এবং আবেগ, উত্তেজনা ও স্বদেশপ্রেমের পরিপন্থী। যেখানে জিয়া, ওলি আহমদ, মীর শওকত, রফিকসহ সকলে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং সকল জনগণ স্বাধীনতার পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে জনসমর্থনের সদ্ব্যবহার করেননি তিনি। এ স্রোতের বিপরীতে ছিল তাঁর অবস্থান। প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ'-গ্রন্থে আলহাজ্জ কর্ণেল ওলি আহমদ রচিত "মেজর জিয়া—স্বাধীনতার ঘোষণা" প্রবন্ধে তার স্বরূপ সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। তার খানিকটা এখানে তুলে দেয়া হল।

ঃ সব কিছুই শেখ মুজিবের হুকুমেই চলত। ঐ সময় তার কোন বিকল্প ছিল না। সমগ্র জাতি শেখ মুজিবুর রহমানের পিছনে ঐক্যবদ্ধ এবং আস্থাশীল ছিল। তখন মেজর জিয়া এবং আমি চট্টগ্রাম শহরের সিডিএ মার্কেট এলাকায় ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলাম। ২০শে মার্চের পূর্বে এবং পরে মরহুম জনাব এম. আর. সিদ্দিকী এবং মরহুম জেনারেল এম এ জি ওসমানীর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে. একাধিকবার বলেছি যে পাক সামরিক সরকার শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এবং এর পিছনে যুক্তিসহ (পাকবাহিনীর কার্যক্রমের আলোকে) আমাদের মতামত জানানো হয়। তিনি আমাদের যুক্তি বা পরামর্শ কোনোটাই গ্রহণ করেন নি। শেষপর্যন্ত তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। মেজর জিয়া ও আমি অত্যন্ত সজাগ ছিলাম এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের দূরদর্শিতার অভাবে ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাক সেনাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হল এদেশের অগণিত সাধারণ মানুষ, শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, কৃষক, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ, আনসার এবং ই পি আর-এর সদস্যরা। ২৫ মার্চ দুপুর ২টার পর থেকে পাকসেনারা প্রকাশ্যে অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাস্তায় নেমে এল। একে একে ঢাকায় তৎকালীন ই পি আর হেড কোয়ার্টার, রাজার বাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার, ঢাকা শহরের সকল টেলিফোন স্থাপনা এবং রেডিও স্টেশন দখল করল। রাস্তায় রাস্তায় পাকসেনারা নিরস্ত্র মানুষের উপর বর্বর হামলা চালাল এবং অনেক বাঙালি অফিসারকে বন্দী করে রাখল। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এ অভিযান শুরু করল। ঐ দিন সন্ধার পর থেকে ঢাকার সাথে দেশের অন্যান্য জেলার টেলিফোন, ওয়্যারলেস এবং অন্যান্য সকল প্রকার যোগাযোগের মাধ্যম তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। দেশে নেমে এল এক ভয়ানক দুর্যোগ। সংবাদ পেলাম শেখ মুজিব

www.nagorikpathagar.org

২৫ মার্চ রাতে পাক সেনাদের হাতে বন্দী হয়েছেন এবং তাঁর সহকর্মীরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পার্শ্ববর্তী ভারতে আশ্রয়ের সন্ধানে গৃহত্যাগ করছেন। কেউ জানত না কোথায় কি হচ্ছে বা এদেশের ভবিষ্যৎ কি? সর্বত্র ভয়ভীতি, চরম হতাশা এবং অনিশ্চয়তা। শহর ছেড়ে অনেকে গ্রামের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে কোনো দিক নির্দেশনা ছিল না। জাতির সেই চরম মুহূর্তে ও বিপদের সময় মেজর জিয়া এবং আমি অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্যান্য বাঙালি অফিস্যারসহ মাত্র তিনশতাধিক বিভিন্ন পদবীর সৈন্যদের নিয়ে ২৫/২৬ তারিখ রাত্রি আনুমানিক ১১টার পর পাক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি এবং সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হই। আমাদের না ছিল প্রয়োজনীয় অস্ত্র, না ছিল গোলা-বারুদ। ঃ

জিয়া শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাই দেননি, তিনি তাঁর ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও সেনাদের নিয়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় জিয়া তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে যে-যুদ্ধ শুরু করেন তা সমগ্র জনগণের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধের রূপ ধারণ করে ও পরিশেষে তা যুদ্ধ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয় এদেশ। অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর বাঙালি অফিসার জিয়ার নেতৃত্বে দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে যে মহান দায়িত্ব পালন করেন, তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং আমার বিবেচনায় ৮ম বেঙ্গলকে নিয়ে গবেষণা করে আরও তথ্য বের করা উচিত। তাহলেই প্রকৃত ইতিহাস বেরিয়ে আসবে। এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম জিয়া সকল সেনাদের একত্র করে মুক্তিযুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। অপরদিকে শেখ মুজিব সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান করে কখনও গোপনে, কখনওবা প্রকাশ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের জন্য অগ্রগতির নামে তাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 'বাংলাদেশ ঃ রক্তের ঋণ' প্রবন্ধের আলোকে বোঝা যায় ভুট্টোর সঙ্গে তিনি শলাপরামর্শ করেই এসেছিলেন— পাকিস্তানের দুই অংশকে এক সঙ্গে রেখে কি করে শাসনকার্য পরিচালনা করা যায়। এথেকে বোঝা যায়, মুজিব তখন বুঝতেই পারেননি (মুক্তির প্রাক্কালে) যে তাঁর দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রদূত বুঝিয়ে দেয়ার পরই তিনি তা বুঝতে পারেন। তারপর ঢাকার জনসভায় তিনি বলেন যে, ভুট্টো তোমার মত তুমি থাক আর আমার মত আমি থাকব। মুজিবের বক্তব্যই গ্রন্থের বক্তব্যকে সমর্থন করছিল। তারপরেও আমরা অন্য চিন্তা করতে পারি না। এথেকে এটিও বোঝা যায় : যারা মুজিবকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বময় কর্মকর্তা বলে মনে করে রেডিও, টেলিভিশন, মাঠ-ঘাট, পত্র-পত্রিকা গরম করছে— তাদের মধ্যে দুটো উদ্দেশ্য বিদ্যমান : (১) শেখ হাসিনার নিকট থেকে রাজনৈতিক সুবিধা লাভ, (২) স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া ও তাঁর দলকে দাবিয়ে রাখতে পারলে তাঁরা চিরদিন ধরে সুবিধা আদায় করতে পারবে এ ধারণা, (৩) একজাতিসত্তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধ্বংস করে সর্বভারতীয় চেতনার সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে তাদের থাবার মধ্যে এগিয়ে দিলে যে এনাম পাওয়া যাবে তা চৌদ্দপুরুষ ধরে উঁমিচাদের মত খাওয়া যাবে। আদতে তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশ চাননি, সেজন্য দু'টি কবিতা, দু'টি প্রবন্ধ পকেটে রাখেন বহুরূপীর মত। 'যখন যেমন তখন তেমন' মনোভাব কাজ করছে তাঁদের মধ্যে। সেজন্য পাকিস্তানও তাঁদের নিকট অনেক প্রিয়। ভারত তার

www.nagorikpathagar.org

চেয়েও বেশি ভালবাসার ধন। একজাতি বা দ্বিজাতিতত্ত্ব সহ্য করা যায়। জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েইতো বহুজাতিতত্ত্বের জন্ম দিল। খুব খারাপ কথা— এটা সহ্য করা যাবে না। বল যা থাকে কপালে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল ছিল, একজাতিতত্ত্বভিত্তিক ভারতে একরাজ্য হওয়া উচিত ছিল। তাহলে দুধ-কলা খুবই খাওয়া যেত। এখন ভারতের চারপাশের দেশগুলো বাংলাদেশের দেখাদেখি স্বাধীন হতে চাচ্ছে— একজাতিতত্ত্বের কথা তুলে তাদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দাও। একজাতিতত্ত্বের কথা তুলে বাংলাদেশকেও যদি ভারতের অঙ্গরাজ্য করা যায় তা-ই সই। কিন্তু খবরদার তোমরা বহুজাতিতত্ত্বের উপর কোন বক্তব্য দেবে না। দ্বিজাতিতত্ত্বকে গাল দিয়ে একজাতিতত্ত্বের দিকে ধাবিত হও। "দে-গরুর গা ধুইয়ে।" তারপর বাঁট হতে যে ছিটে-ফোটা দুধ বের হয় তাই চেটে পুটে খাও। তাই খাচ্ছেন তাঁরা।

জিয়া বহুজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এদেশ যেন কারো অঙ্গরাজ্য না হতে পারে, সেজন্য বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই দেশ শাসন করতে চান। বাঙালি জাতিসত্তা ভারতীয় জাতিসত্তার প্রাদেশিক অঙ্গ। জিয়া এটি ভালভাবেই বুঝেছিলেন— সে কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে এদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য ভারতীয় জাতিসত্তার অধীন বাঙালি জাতিসত্তা অঙ্গীকার করার মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে নষ্ট করতে চাননি। দ্বিতীয়তঃ এ কারণেই স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ ব্যক্তি ও শক্তিকে নিয়ে, স্বাধীনতায় অংশগ্রহণকারী জনগণকে নিয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের আলোকপুষ্ট বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী এসকল ছাত্র, যুবকসহ সকল লোকজনকে নিয়ে অর্থাৎ স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরীদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন। সে দল বি. এন. পি.। সে কারণে আমি বারবার একথা বলেছি, মুক্তিযুদ্ধের এক সাগর রক্ত হতে উদিত হওয়া বি. এন. পি. শুধু মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তিই নয়, এ দলের সর্বাঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ। বি. এন. পি. মুক্তিযুদ্ধের রক্ত সাগরে স্নাত রক্তিম একটি দল। কাজেই বি. এন. পি.-কে মুক্তিযুদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। বিচ্ছিন্ন করতে চাইলে দেশটিকে ও এর জাতীয়তার স্বরূপটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। কাজেই বি. এন. পি. স্বাধীনতার শক্তি নিয়ে (Spirit) জন্ম লাভ করা একটি জাতীয় দল। একে সে কারণে আমাদের জীবনে, আমাদের অস্তিত্বে ধারণ করতে হয়। আর এর প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি জিয়া তাই আমাদের অস্তিত্বে, আমাদের স্বাধীনতায়, আমাদের জাতীয়তায়, আমাদের সত্তায় মিশে আছেন। তাঁকেও আমরা সে কারণে বিচ্ছিন্ন করতে পারি নি, পারব না কোনো দিন।

আমি স্বাধীনতার প্রস্তুতিকাল নিয়ে এখানে কিছুটা আলোচনা করব। অখণ্ড বাংলাদেশী চেতনাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা ও পরিশেষে মুসলিম লীগ বাংলাদেশকে অখণ্ডভাবে স্বাধীন করতে দিল না। বহুজাতিসত্তার চেতনা ভারতের সব অঞ্চলে থাকা সত্ত্বেও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশটাকে দু'ভাগে ভাগ করে দিল তারা। আমার মনে হয় : তখনকার প্রদেশভিত্তিক দেশটাকে যদি তারা ৫/৭টি ভাগে বিভক্ত করত— জাতীয় বা জাতিসত্তার জাগরণের ভিত্তিতে, তাহলে আমাদের আর এ সমস্যা থাকত না। অবশেষে অখন্ড বাংলাদেশকেও বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হয়ে থাকতে দেয়া হল না এ

www.nagorikpathagar.org

কে ফজলুল হকের লাহোর প্রস্তাব অনুসারে। তখনই আমাদের মনে যে সন্দেহ দানা বেঁধেছিল তা-ই জিন্নাহর ঢাকায় 'একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে'—ঘোষণার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। পশ্চিম পাকিস্তান যে আমাদের বন্ধু নয় তা আমরা বুঝতে পারলাম। তখন ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই আমরা এগিয়ে চললাম স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে, মুক্তির পথে। এ দীর্ঘকালীন সংগ্রামের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হননি বলেই তাঁদের রাজনৈতিক উত্তরসুরী স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে যে-দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল তা সম্পাদন করতে পারেননি। এ দায়িত্ব পালন করলেন এদেশের সামরিক অফিসার জিয়া।

দেশের এ গতিধারার এক চিত্রালেখ্য আমি এখানে একটি প্রবন্ধ হতে তুলে দিতে চাই। জিয়া– আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি– লেখক আমানুল্লাহ কবীর।

ঃ পাকিস্তানের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির উপর যে আঘাত আসে, তা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাঝে জন্ম দেয় নতুন চিন্তা-চেতনার। যার যৌক্তিক পরিণতি হিসেবেই সৃষ্টি হয় স্বাধীন বাংলাদেশের। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এ আদিপর্বের নায়ক আর শেষপর্বের নায়ক এক নন। এ আদিপর্বের নায়ক এক নন বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ একাধিক তরুণ। যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর মাধ্যমে। যিনি লাহোর রেজিলিউশনের ভিত্তিতে সে চেতনার অব্যাহত ব্যাপ্তি ঘটান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাঝে। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের মাঝখানে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পর্দার অন্তরাল থেকে আরেক জনের আবির্ভাব ঘটে শেষপর্বে। তিনি মেজর জিয়া। পরবর্তিকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট দ্যগলের সঙ্গে জিয়ার একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্যগল কর্ণেল। ১৯৪০ সালের মে মাসে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি সশস্ত্র প্রতিরোধ (War of Registance) গড়ে তোলার আহ্বান জানান, যা বিবিসি থেকে প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্স যখন রাজনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল, সেই সংকটময় মুহূর্তে তিনি জাতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ডুবন্ত জাহাজের হাল ধরেন। ফরাসী জাতি নতুন দিকনির্দেশনা পায়। ফিরে আসে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। তাঁর ফিফ্‌থ রিপাবলিকই আধুনিক ফ্রান্সের ভিত্তিভূমি। দ্যগলের মত জিয়াউর রহমানও একজন মাঝারি পর্যায়ের সেনা অফিসার ছিলেন, কিন্তু দু'জনেই জাতির চরম সংকটময় মুহূর্তে যে ভূমিকা পালন করেন, ইতিহাসে তা চিহ্নিত হয়ে রয়েছে অনন্য ঘটনা হিসেবে। দ্যগল ফ্যাসিবাদী হামলার বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ইতিহাসে তাঁর স্থান দখল করেন। তেমনি জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে অমর হয়ে আছেন বাংলাদেশের ইতিহাসে। দু'জনই পরবর্তিকালে রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবনের পরবর্তী অধ্যায় বাদ দিলেও ইতিহাসে তাঁদের নাম নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। সামরিক ব্যক্তি হলেও দু'জনই ঘটনাচক্রে সামরিক উর্দি ছেড়ে পরবর্তিকালে পদার্পণ করেছিলেন রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং কেবল সফল রাষ্ট্রনায়কই নন, দু'জনই রাজনৈতিক গতি ধারায় সৃষ্টি করেছিলেন নতুন স্রোতো ধারার। ঃ

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে একথা আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি : স্বাধীনতা সংগ্রাম বা স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁদের অবদানকে স্বীকার করে নিতে হয় তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিবের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা না করাই ভাল, তবে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কয়েকজনের মধ্যে তিনি যে একজন তা স্বীকার করে নিতেই হয়। তার সঙ্গে একথা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে মেজর জিয়া শুধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে ও মুক্তিযুদ্ধ করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি, দেশের দূর্যোগময় ও সংকটময় মুহূর্তে দেশকে রক্ষার জন্য শক্ত হাতে দেশের হালও ধরেছিলেন। জিয়ার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও কর্মময় জীবনের কার্যক্রম ও মানসিক চেতনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি একজন দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন। পরিতাপের বিষয় : শেখ মুজিব স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চাইলেও একাত্তরে তিনি এদেশের স্বাধীনতা চাননি। ইতিহাসের এ সত্যকে যাঁরা প্রচারযন্ত্রের জোরে মিথ্যে প্রমাণিত করে এক বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চান, তাঁরা আসলে আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছেন। উদ্ভাসিত সত্য ও জাতীয় ইতিহাসকে যে কোনো দিনই ঢাকা যাবে না, তা হাসিনা উপলব্ধি করতে পারছেন না বলে এসব বলে যাচ্ছেন। দেশ-বিদেশে ইতিহাসের হাজার হাজার প্রমাণ যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাকে তো ঢেকে ফেলা যাবে না। নতুন কিছু করতে গেলে সেটা হাসির খোরাক ছাড়া অন্য কিছু হবে না। আমি এ সম্পর্কে তৎকালীন ঘটনার আলোকে লিখিত গ্রন্থ হতে কিছু কিছু বিষয় প্রকাশ ও উদ্ধৃত করে ইতিহাসগত সত্যকে প্রকাশ করব। এখানে "স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী আমরা"– গ্রন্থের "আমাদের সংস্কৃতি : আমাদের রাজনীতি : আমাদের কথা" : প্রবন্ধে অধ্যাপক খোন্দকার মকবুল হোসেন (এ গ্রন্থ লেখক) বলেন :

> ঃ শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রদান করে আমরা তাঁকে বাঙালির, বাংলাদেশের সেবক, রক্ষক, নেতা ও প্রহরী করতে চেয়েছিলাম, আওয়ামী লীগের উত্তরসূরিদের দায়িত্বভার তাঁর উপর পড়েছিল বলে। বিভিন্ন সংগ্রাম বা আন্দোলনের ক্রান্তিলগ্নে তাঁকে না পেয়েও এ- মর্যাদা থেকে তাঁকে আমরা বঞ্চিত করিনি। সে কারণে আমাদের আশা ছিল ৭ই মার্চ বা তার দু-একদিনের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তিনি পাকিস্তানীদের এখানে মিলিটারী আমদানীর পথ বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু তিনি তা করেননি; বরং আলোচনা করতে গিয়ে এ দেশে তাদের শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ করে দিয়েছেন। ঃ

বিষয়টি আরো পরিস্কার করার জন্য এখানে 'ঘাদানি নেত্রী' মরহুমা জাহানারা ইমামের গ্রন্থ "একাত্তরের দিনগুলি" হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতে চাই।

ঃ ১০ ই মার্চ '৭১।

ওদিকে আশি বছরের বৃদ্ধ ভাসানী গতকালকার পল্টন ময়দানের মিটিং-এ (৯ই মার্চ '৭১) স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করে বসে আছেন। ঃ

তিনি আরও বলেছেন,

ঃ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (শেখ মুজিব) হওয়ার চেয়ে বাংলার নায়ক হওয়া অনেক বেশি গৌরবের।

www.nagorikpathagar.org

১৬ই মার্চ '৭১।

তুই যা বলিস রুমী, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। আজইতো মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হল। ফয়সালা একটা নিশ্চয়ই হবে।

টিভিতে শেখ মুজিবকে দেখাচ্ছে...... শেখ মুজিবের গাড়িটা প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে আসছে।

১৭ই মার্চ '৭১।

তাঁরা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আড়াই ঘণ্টাকাল আলোচনা করেছেন।

শেখ শুধু বলেছেন তাঁরা দেশের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা কেবল শুরু করেছেন। ঃ

আমাদের কথা হচ্ছে তিনি যে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা করলেন তা কি নিয়ে। "আমাদের স্বাধীনতা দাও" একথা তো বলেন নি, বা ইয়াহিয়া একথাও বলেননি; ভোটের স্বভাব (Nature) দেখে বোঝা যাচ্ছে দুই দেশ একত্রে থাকতে চায় না, আসুন কিভাবে দুই দেশ স্বাধীনতা লাভের পর বন্ধুর মত থাকতে পারি এ নিয়ে আলোচনা করি। এ ধরনের আলোচনা করলে তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় অবশ্যই আসত। কিন্তু তা আসেনি। তাহলে এ আলোচনা ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর এবং মুজিবের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছু হয় নি। ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াল আপনারাই ভাবুন। দেশে স্বাধীনতার কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে— আর মুজিব ক্ষমতা নিয়ে আলোচনায় বসেছেন তখন এটা কেউ মেনে নিতে পারেননি। এখানে কিছু উদ্ধৃতি তুলে দেয়া হল।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থ।

ঃ ২৪শে মার্চেও আলোচনার প্রহসন চলে মুজিব, তাজউদ্দীন ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে নিয়ে। ঃ

একাত্তরের দিনগুলি। ২৫ শে মার্চ '৭১।

ঃ শেখ মুজিব প্রতিদিন প্রেসিডেন্ট ভবনে যাচ্ছেন আলোচনা করতে; বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের বলছেন আলোচনা এগুচ্ছে। ঃ

ঃ বেশ কিছুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে, প্রতিদিন নাকি প্লেনে করে সাদা পোশাকে প্রচুর সৈন্য নামছে বিমান বন্দরে। ঃ

ঃ শেখ মুজিব আবার স্বাধীনতার ঘোষণা না করে এদিনে ২৭শে মার্চ সাধারণ হরতাল আহ্বান করেন। ঃ

ঃ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যখন এভাবে দিনের পর দিন ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনায় বসে সংকট নিরসনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, জনসাধারণ তখন আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। ঃ

কাদের সিদ্দিকী তাঁর গ্রন্থ 'স্বাধীনতা ৭১'-এ বলেন:

ঃ আপোষ আলোচনার অজুহাতে ইয়াহিয়া যখন সময় কাটাচ্ছিলেন, তখন বাংলার ঘরে ঘরে ব্যাপক অবিশ্বাস ও সন্দেহ ঘনীভূত হয়। ঃ

www.nagorikpathagar.org

আমার মনে হয় : এ অবিশ্বাস ও সন্দেহ শুধু ইয়াহিয়ার উপর নয়, মুজিবকে ঘিরেও সৃষ্ট হয়। কারণ যেখানে স্বাধীনতার প্রস্তুতিলগ্ন যখন শেষ— সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণা ছাড়া অন্য আলোচনা কেন? আর এ "আলোচনার প্রহসন" স্বাধীনতা পিয়াসী জনগণই বা মেনে নেবে কেন? সেজন্য তাদের এ ক্ষুব্ধতা, এ অবিশ্বাস।

জাহানারা ইমাম, একাত্তরের দিনগুলি : ৮ই মার্চ '৭১।

ঃ আপনারা দেওয়ালের লিখন পড়তে অপারগ। দেখেননি আজ মিটিং-এ কত লাখ লোক স্বাধীন বাংলার পতাকা হাতে নিয়ে এসেছিল। জনগণ এখন স্বাধীনতা চায়, এটা তাদের প্রাণের কথা।

ঃ আমার মনে হচ্ছে শেখ আজ অনায়াসে ঢাকা দখল করার সুযোগ হারালেন। ঃ

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম'- রফিকুল ইসলাম। ঃ

ঃ ৯ই মার্চ ভাসানীর জনসভায় আতাউর রহমান খান মুজিবকে জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বান জানান। ঃ

ঃ ৯ই মার্চ ভাসানীর এ জনসভায়ই স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা অনুমোদন করা হয়। ঃ

ঃ ১০ই মার্চ আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে বাংলা জাতীয় লীগ কার্যকরী কমিটি, শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি স্বাধীন বাংলার অন্তরবর্তীকালীন সরকার গঠনের আহ্বান জানান। ঃ

ঃ ১৫ই মার্চ ... স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে রব ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। ঃ

ঃ শাজাহান – "বাংলাদেশের স্বাধীনতা"-র জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানান। ঃ

ঃ নূরে আলম– "পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে পারবে না।" ঃ

জিয়াউর রহমান সম্পর্কে বলতে হয় : তাঁর মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি, স্বাধীনতার ঘোষণা, প্রবাসী সরকার গঠনের পূর্বপর্যন্ত দেশ ও যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁর কার্যক্রম, প্রবাসী সরকারের নিয়ন্ত্রণে ওসমানীর পরিচালনাধীনে থেকে তিনটি ব্রিগেডের প্রধান ব্রিগেড জেড–ফোর্সের সর্বাধিনায়ক হিসেবে নয় মাস যুদ্ধ পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রমে জিয়ার অবদান সম্পর্কে আলোচনায় আসার পূর্বে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের কার্যক্রম, তাঁর মানসিকতা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থানের বিষয়গুলো মূল্যায়ন করার প্রয়োজনে আমরা তা আলোচনার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে বুঝতে পারলাম, শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দান তো দূরের কথা তিনি স্বাধীনতাই চাননি, — এটি পূর্ববর্তি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভাসানী, কাজী জাফর, আতোয়ার রহমান খান, রব, মাখন, শাজাহান সিরাজ প্রমুখ নেতা ও ছাত্র-সমাজ তাঁকে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য বলেন এবং অনেক সংস্থাও একথা বলে। নাটক (রক্তশপথ), সঙ্গীত, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাধীনতার কথা বলা হলেও তখন স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়নি। বরং সমস্ত বাংলাদেশ শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনায় পাক-সরকারের চাপ সৃষ্টির জন্য ২৫ মার্চ

www.nagorikpathagar.org

একাত্তর তারিখে ২৭শে মার্চ সারা দেশে হরতাল আহ্বান করেন। মুখ ফুটে ৭ মার্চ ব্যতীত কোনোদিনই তিনি জনগণ, ছাত্র সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে স্বাধীনতার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেননি। বরং তিনি স্বাধীনতার অগ্রযাত্রাকে পিছন থেকে টেনে ধরেছেন। এসব কারণে এবং ২৫ মার্চ রাতে মুজিবের বন্দীত্ব বরণের কারণে যে রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দেয়, সেই শূন্যতা পূরণের জন্যই মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে বাধ্য হন। প্রবাসী সরকার গঠনের পূর্বপর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জিয়া ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মিগণ তৎপর ছিলেন। এ সবই ঐতিহাসিক সত্য। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই : জনগণ ও স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করে গেলেও স্বাধীনতার পথে যাতে জটিলতার সৃষ্টি না হয় এবং পাকিস্তানী শাসক সেই সুযোগে আমাদেরকে যাতে অন্যপথে পরিচালিত করতে না পারে সেজন্য মুজিবের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করেই মুক্তিযুদ্ধ করে গেছেন সকলে। মুজিবের বন্দীত্বের কারণে সুবিধাও হয়েছে, বলা যায়। সেজন্য মওলানা ভাসানী তাঁর বন্দী হওয়ার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলেন যে আল্লাহ দেশকে রক্ষা করবেন। সকলেই চাইতেন স্বাধীনতার প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত না করতে। ঐক্যমতের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ করাই ছিল দলমত নির্বিশেষে সকলের একমাত্র কামনা। এ ক্ষেত্রে কার নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হবে সেটা বড় কথা নয় বা সরকারের নাম মুজিব সরকার হবে নাকি রাজধানীর নাম মুজিবনগর হবে সেটাও বড় কথা নয়, আসল কথা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন। সে কারণে মুজিবনগর সরকার পরিচালিত মুক্তিবাহিনীর সহযোগী আর একটি প্যারালাল বাহিনী, নাম মুজিব বাহিনী, শেখ ফজলুল হক মণির নেতৃত্বে গঠন করা (ভারতের সহযোগিতায়) হলেও, তা বিসদৃশ ব্যাপার জেনেও তার বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলেননি। না তাজউদ্দীন, না ওসমানী, না জিয়া বা ভাসানী। আমার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন অধ্যাপক সাঈদ-উর-রহমান। তাঁর "স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণতা"– প্রবন্ধে। সম্পাদনায় ড. এমাজউদ্দীন। তিনি বলেন,—

> ঃ শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের সবচে সফল সময় কোন্‌টি তা নিয়ে সবাই একমত হবেন না। একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অবশ্যই ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাস। ৭ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী লোকনায়ক এবং পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তিনি আবির্ভূত হোন। অবস্থানটি ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ— ইতিহাস তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছিল এক সঙ্গে পরস্পর বিরোধী দুই স্বার্থরক্ষা করার ভার। দুই ভূমিকা এক সঙ্গে পালন করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার— পূর্ববাংলার স্বার্থ দেখতে গেলে পাকিস্তানের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়, পাকিস্তানের স্বার্থ দেখতে গেলে পূর্ববাংলার ব্যাপারে আপোষ করতে হয়। উভয় কূল রক্ষার জন্য তিনি যারপর নেই চেষ্টা করেছিলেন— জয় বাংলার পাশাপাশি জয় পাকিস্তানও বলেছিলেন, বাঙালিদের স্বার্থ পুরোপুরি রেখে পাকিস্তানের কাঠামো অক্ষুণ্ন রাখার ফরমুলায় উপনীত হয়েছিলেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে। পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্রে ফরমুলা ভেঙ্গে গেলে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। ঘটনা প্রবাহের উপর নিজেকে ছেড়ে দেয়া ছাড়া তাঁর

www.nagorikpathagar.org

আর কিছুই করার ছিল না। সেই অবস্থায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাত সাড়ে বারটার দিকে পাকবাহিনী তাঁকে বন্দী করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। ঃ

এসম্পর্কে আমি উক্ত লেখকের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারিনি। তার একমাত্র কারণ তিনি এ দেশের নেতা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তিনি একটি সাংসদও নির্বাচিত করাতে পারেননি। তাছাড়া এদেশের স্বাধীনতা লাভ ও জনগণের স্বাধীনতার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি ও সেই লক্ষ্যে দেশজুড়ে যে-বিশাল আয়োজন তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান করা তাঁর উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা না করে পাকিস্তানের দিকেই ঝুঁকে পড়েন; জনগণের রায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। যা তাঁকে শুধু বিতর্কিত করেই তোলেনি,— তাঁর সম্পর্কে সকলের ধারণাই পাল্টে দিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে তার প্রকাশ ঘটেনি। সে কারণে তাঁর বক্তৃতায়, তাঁর কর্মে, তাঁর আলোচনায়, তাঁর আচরণে ছিল স্বাধীনতাবিরোধী চেতনা। এ চেতনা প্রকাশের জন্যই আমি প্রবন্ধকারদের বিভিন্ন প্রবন্ধ হতে তাঁদের বক্তব্যগুলো তুলে দিয়ে এর সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করেছি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে।

ঃ মুজিব "স্বাধীনতা", "মুক্তি" শব্দগুলো উচ্চারণ করতেন স্বাধিকারের আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করার জন্য। একবার স্বাধিকার পেলে, পরে না হয় দেখা যাবে স্বাধীনতার বিষয়টি। শেখ মুজিব কি বলতেন তা ভুট্টো বুঝতেন বলেই দুই অঞ্চলে দুই নেতৃত্বের প্রশ্নটি সহজে উত্থাপন করতে পেরেছিলেন।

পাকিস্তানের ক্ষমতার নেতৃত্বের প্রতি দুর্বলতা ছিল শেখ মুজিবের কাছে রাজনৈতিক বাস্তবতা, যা ভাসানীর মধ্যে ছিল না, তাজউদ্দীনের মধ্যে ছিল না, ওসমানীর মধ্যেও ছিল না। এমন কি পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনী, ছাত্র-শ্রমিক, জনতার মধ্যেও সে পিছুটান ছিল না। জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান সেই প্রেক্ষাপটেই হয়েছিল। জিয়া জানতেন না : মুজিব জীবিত না মৃত, মুজিব এখনও স্বাধিকার চান, না স্বাধীনতা চান। জিয়ার ভয় ছিল, শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে কোনো জীবিত মুজিবর যদি ফিরে এসে বেঁকে বসেন।...........

.....আবারও বলছি, স্বাধিকারের মুজিবই সত্য। মুক্তি সংগ্রামে মুজিবের নাম সংযোজন এ. কে. খান, জিয়া ও পরবর্তিকালে তাজউদ্দীনেরই অবদান। এ মুজিব নতুন করে সৃষ্ট মুজিব। ঐতিহাসিক এ সত্য কখনও অসম্মান প্রদর্শন নয়। শেখ সাহেবের কাছেও বাঙালি অনেক কিছু পেয়েছে। সাহসিকতা পেয়েছে। সংগ্রামের আদল পেয়েছে। আর যা আমরা পাইনি, তা দেয়ার ক্ষমতাও শেখ মুজিবের ছিল না। আমরা তাঁর থেকে আরও অনেক কিছু চেয়েছিলাম বলেই এক সময় গিরি-চূড়া সমান এক বৃহদায়তন মুজিব সৃষ্টি করেছিলাম, যা ধারণ করার ক্ষমতাও হয়ত তাঁর ছিল না। আমাদের জন্য এটা একটা ঐতিহাসিক লাঞ্ছনা। ....

.... মুক্তিযুদ্ধ রচনা করেছিলেন জিয়া, জলিল, নওয়াজেস, ওসমান, খালেদ মোশাররফ প্রমুখ সেক্টর কমান্ডাররা। সূচনা করেছিল পুলিশ, বি.ডি.আর. ছাত্র, শ্রমিক, জনতা। সুসংহত করেছিলেন তাজউদ্দীন ও ওসমানী। ৭ মার্চের ভাষণের পর পাকিস্তান রক্ষার 'স্পেশাল প্ল্যান" তৈরির বৈঠকে যদি শেখ সাহেব না বসতেন

www.nagorikpathagar.org

এবং আলোচনার ইতিবাচক অগ্রগতির কথা বারবার জনগণকে শুনিয়ে বিভ্রান্ত না করতেন, তাহলে জনগণের পথ জনগণই বেছে নিত। এত রক্তক্ষয়ের সাহস পেতনা পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। বাঙালিকে বিভ্রান্ত ও নিরস্ত্র রাখার কোন অধিকার শেখ মুজিবের ছিল না। ...... জিয়ার উত্থান ও তাজউদ্দীনের পরবর্তী পদক্ষেপগুলো ছিল শেখ মুজিবের রাজনৈতিক ভুল পুষিয়ে দেয়ার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। জেনারেল অরোরা বলেছেন, "মুজিব ছিলেন নিছক একজন উত্তেজনা" সৃষ্টিকারী (an agitator)। তাঁর অবর্তমানে অন্যরা, তিনি যা পারেননি, তা করে ফেলবেন, তিনি সেটাও সহ্য করতেন না। অন্য কথায়, স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েছিলাম (৭ই মার্চ), স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার ব্যাপার ঘটাতে হলে সেটাও আমার ব্যক্তিগত নেতৃত্বেই ঘটত। তোমরা আমার জন্য কিছু না রেখে সবটা করে ফেললে কেন? ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক পাকিস্তানের শেষ রক্ষার জন্যই তো স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা মুক্তির কথা বলেই জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান উচ্চারণ করেছিলাম, পুরোদস্তুর স্বাধীনতা তো চাইনি। মুক্তিযুদ্ধ তো মাথায়ও ছিল না। এ ছিল একাত্তরের বন্দীদশায় শেখ মুজিবের চিন্তা-চেতনা। .....

...... জিয়ার অডিও ক্যাসেট এখন নষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যেমন উঠিয়ে দেয়া হয়েছে ৭ মার্চের ভাষণের শেষ–অংশ 'জয় পাকিস্তান' শব্দ দুটো। যারা ৭ মার্চের ভাষণ সামনাসামনি দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম এবং ২৬ মার্চ মেজর জিয়ার ঘোষণা নিজ কানে শুনেছিলাম, তাদের কাছে ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু এখন যারা ত্রিশের কোঠায়, তারা তখন মাত্র হাটি হাঁটি পা পা, তাদেরকে কেন্দ্র করেই চলছে ইতিহাসের ভুল তথ্য ও ব্যাখ্যা দান। শুধু তাই নয়, স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে অসত্য তথ্য প্রদান করে বলা হচ্ছে, শেখ মুজিবই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। (তাঁর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা, ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা, ৭ই মার্চের ৪দফা দাবী, ছাত্রদের কার্যকলাপে বিরক্তি, ২৫ মার্চ তারিখে ২৭শে মার্চ সাধারণ হরতালের ঘোষণা ও দেশ-বিদেশে তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়)। ইতিহাসের এ চর দখল ও গ্রাহ্যকরণ প্রক্রিয়া মূল অচিরেই উৎপাটিত হবে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে।

ইদানীং আবার বলা হচ্ছে, জিয়া ও বাঘা কাদের কেউই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। প্রশ্ন এসেছে, স্বীকৃত ইতিহাস অস্বীকার করার স্পর্ধা এরা পায় কোত্থেকে? সাহস থাকলে বল না, শেখ মুজিবই মুক্তিযোদ্ধা, আর কেউ নয়। শেখের আমলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অসম্মান ও জনমত উপেক্ষার এক পর্যায়ে এসে অসহ্য অবস্থায় একবার আ. স. ম. রব বলেছিলেন : মুজিবই পাকিস্তানের হাতে নিজের ইচ্ছায় ধরা দিয়েছিলেন এবং সেই অর্থে তিনিই সর্বপ্রথম রাজাকার। জনগণ এ কথায় আঁৎকে উঠেছিল, বলেছিল: শেখ মুজিবের আত্মসমর্পণ ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাঁকে রাজাকার তো বলা যায় না। শেখ মুজিবের ভুলভ্রান্তি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার একটি মানসিকতা তখন জনগণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তিনি যখন পিছনে ছুটেছেন বার বার, প্রথমে স্বাধীনতা ঘোষণার ক্ষেত্রে এবং পরবর্তিতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে, শেখ মুজিবের পিছনেও ইতিহাস ছুটেছে। কিন্তু ইতিহাসে

www.nagorikpathagar.org

যে প্রতিষ্ঠা তিনি পেলেন তার চেয়েও বেশি তিনি নিজেই দাবী করলেন। তোফায়েল যখন 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব দিলেন, জনগণ 'না' করল না। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যখন তাকে 'জাতির পিতা' অভিধায় ভূষিত করলেন, তখন জনগণ তেমন হাঁ-ও করল না। হাঁ করলে '৭২-এর সংবিধানে সেভাবেই স্থান করে নিতেন তিনি। আবার তিনি নিজেই যখন বলে উঠলেন, তিনি বঙ্গবন্ধু, তিনি জাতির পিতা, জনগণ বলে উঠল, এ আবার কোন্ ধরনের ভব্যতাবিহীন রাজনৈতিক উচ্চারণ। তিনিই বঙ্গ, তিনিই বন্ধু, তিনিই জাতি, তিনিই পিতা। ঃ

মুজিবের অন্ধ ভক্তগণ ও সুবিধাভোগীরা সেই স্বাধিকার অর্জনের জন্য ব্যক্ত মুজিবের ভাষা ও শব্দগুলোকেই পিছনের শব্দ ও বাক্যগুলোর দিকে না তাকিয়েই স্বাধীনতার বক্তব্য বলে, নাস্তিকদের মত, চালাতে চান। যা মার্চের কার্যকরণ, বক্তব্য ও আলোচনা ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাঁরা নাস্তিকের মত লাইলাহা— আল্লাই নাইকে ধরে ইলাহা যা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া একে বাদ দিয়েছেন। বাদ দিয়েছেন ৭ই মার্চের ভাষণের ৪দফা দাবীকে, বাদ দিয়েছেন জয় পাকিস্তানকে। এমনি করে তারা ইতিহাস বিকৃতি ঘটিয়ে স্বাধীনতার স্থপতি হিসেবে মুজিবকে চালানোর লজ্জাজনক ও হাস্যকর ক্রিয়াকর্ম শুরু করেছেন; হাসিনাসহ তাঁর ভক্তের দল। কিন্তু আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে গাজীউল হকের মত একজন ব্যক্তির আচরণে। এককালের ভাসানীর আদর্শে বিশ্বাসী গাজীউল হক হঠাৎ আলোর সুবিধাবাদী ঝলকানি পেয়ে যখন অলি আহাদ, ভাষা-মতিনদের মত ভাষা সৈনিকদের বদলে শতাধিক গজ পিছে পড়া ভাষা-আন্দোলনের সমর্থক মুজিবকে ভাষা আন্দোলনের উচ্চাসনে বসিয়ে আবেগে অস্থির হয়ে পড়েন, তখন লজ্জায় মুখ ঢাকারও স্থান খুঁজে পাই না। কচি ছেলেদের মিথ্যা শিখিয়ে কি লাভ— তার উত্তর কি দেবেন আপনারা?

বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়ে এবং মুজিবের আমলে আওয়ামী লীগে যোগদানকারী নেতা-কর্মিগণ মনে করেন বা হাবভাবে প্রকাশ করেন : মুজিবই আওয়ামী লীগের সব, তার আগেও ছিল না, পরের কথা নাই-বা বললাম! মুজিবই একমাত্র জাতীয়তাবাদী নেতা, তিনিই বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা, মুজিবই ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ, মুজিবই যুক্তফ্রন্টের প্রধান কর্ণধার, মুজিবই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কর্ণধার, মুজিবই স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্যোক্তা, মুজিবই স্বাধীনতার ঘোষণাদানকারী, মুজিবই মুক্তিযোদ্ধা। আর কেউ কোথাও নেই। আগেও ছিল না, পরেও নেই। পরে না থাকার কারণ তিনি সবকিছুরই স্বপ্ন দেখেছেন। এত বেশি বেশি সব আজেবাজে কথা বলা হয়, যা শুনলেও মানুষের মন বিরক্তিতে ভরে যায়। মুজিবকে একটু সম্মান দেখিয়ে যখন বলা হয়, মুজিব তো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তবে তিনি জাতীয় নেতা। যেই বলা হল তিনি জাতীয় নেতা, অমনি ভক্তকুল বলে উঠলেন, স্যার (আমার এক ছাত্র) তিনি গরু পালন করলেন, গরু ভরল (গাভিন হল), গরু প্রসব করল, আর আপনি দুধ দুইয়েই দুধের মালিক হবেন, তাই কি হয়? আমি আজ এসবের উত্তর দেয়ার প্রয়োজন মনে করি, কারণ মুজিবকে নিয়ে তাঁরা এত বাড়াবাড়ি করছেন, যার ফলে ইতিহাস থেকে বেরিয়ে আসা সত্য কথা বলার দরকার হয়ে পড়েছে এবং এতে মুজিবের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর সুনাম, যা জাতি দিয়ে আসছিল, সত্য-ঘটনার আলোকে যদি

www.nagorikpathagar.org

কমে যায়, তার জন্য দায়ী শেখ হাসিনা এবং মুজিবকে যাঁরা সব কিছুর কর্ণধার বানাতে চান তাঁরাই। ঐতিহাসিক সত্য— যা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ঘাটলে পাওয়া যাবে— সেই যমুনা সেতুর জন্য আন্দোলনে নাকি মুজিবের অবদান সর্বাধিক, কিন্তু আসলে তা নয়, এটি মিথ্যা। আন্দোলনমুখী ব্যক্তি ছিলেন ভাসানী। অতীতের বইপত্র ও পত্র-পত্রিকা খুললেই তা পাবেন। যমুনা সেতু নির্মাণের ব্যাপারে কমবেশি বর্তমান সরকার পর্যন্ত অবদান থাকলেও, বেগম খালেদার আমলে এ কাজ আরম্ভ হয় ও এর বারো আনা সম্পন্ন হয়। পত্র-পত্রিকা ও সরকারি নথিপত্র খুঁজলেই তা পাওয়া যাবে। তারপরও কেউ যদি লজ্জাহীনের মত মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাহলে কারো বলার কিছু থাকে না।

যে জাতীয়তাবাদের একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে মুজিবকে আওয়ামী লীগের সমর্থকগণ দাবী করেন, তা মোটেও সত্য নয়। কোনোদিন সত্যও ছিল না। আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের দাবীও কোনোদিন কেউ করেনি। বাঙালি জাতীয়তাবাদ একটি অবাস্তব উক্তি। এদেশে এর কোন শিকড় নেই, কোনোদিন ছিল না। ইংরেজ-ভারতে বাঙালি জাতি ভারতের বহুজাতিতত্ত্বের 'একটি' হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু যেই দেশ বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এবং বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে বাংলার পূর্বাংশ নিয়ে একটি দেশ পাকিস্তান নামে গঠিত হয়েছে, তখনই পূর্ববঙ্গ তার পূর্ব জাতিসত্তা হারিয়ে পূর্ব পাকিস্তানী হয়েছে। কিন্তু আকাশচুম্বী বৈষম্যের কারণে ও আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে যখনই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টি করলাম, তখন সে তার পূর্ব পাকিস্তানী জাতিসত্তা হারিয়ে ফেলল এবং বাংলাদেশ হিসেবে একটি স্বাধীন দেশের জন্মলগ্ন থেকে এদেশ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে বুকে ধারণ করল। সেজন্য আমরা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান বলি না, পাকিস্তানের অঙ্গরাজ্য নয় বলে এবং নিজেদের বাঙালিও বলি না আমরা ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মত নই বলে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদই এর মূলসুর এবং বহুজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ এ বাংলাদেশ।

আমার আজও সন্দেহ হয় : আওয়ামী বুদ্ধিজীবিগণ এদেশকে নিয়ে যতই বাড়াবাড়ি করুন, আদতে তাঁরা এদেশের স্বাধীনতা চাননি, এদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য করতে চেয়েছেন।

১। তাঁরা যখনই বলেন : দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টিও ভুল হয়েছে। তখনই পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে তাঁরা কুঠারাঘাত করছেন। তাঁরা যত পারেন পাকিস্তানের মূলে কুঠারাঘাত করুন ও ভারতপ্রীতিতে উদ্বেল হয়ে উঠুন, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না।

২। কিন্তু এ পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল বলেই আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি, এটিও যখন তাদের দ্বিজাতিতত্ত্বে ভুলের মধ্যে হারিয়ে যায়, তখনই আমাদের মনে হয়; তারা আদতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। বরং পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ভারতের গহ্বরে বিলীন হয়ে যাক, তাই চেয়েছেন।

৩। একজাতিতত্ত্বের মূলকথা হল ভারতের মৌলবাদী হিন্দু সাম্প্রদায়িক সমাজই একজাতির আদিরূপ অর্থাৎ রামরাজ্যই তাঁদের কাম্য। সেখানে যে শত শত জাতি

www.nagorikpathagar.org

আছে, তারা নিম্ন শ্রেণীর অনার্য, লৌকিক ধর্মানুসারী বা মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান যেই হোক না কেন, তারা বর্ণহিন্দুর কাছে শূদ্র নামেই পরিচিত হবে। আর এ শূদ্রদের আবার জাত কি? কাজেই একজাতিতত্ত্ব বলতে বর্ণহিন্দু জাতীয়তাবাদ ও তাদের ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি এঁদের কাম্য। সে কারণে বাংলাদেশের সেন-রাজাগণ বাংলা ভাষাকে শূদ্রের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে সংস্কৃত ব্যতীত এদেশে দু'শ বছর বাংলা ভাষার চর্চা করতে দেয়নি। এ-ই হচ্ছে তাদের একজাতিতত্ত্বের সংজ্ঞা।

কাজেই কোন্ সার্থে এদেশীয় চরেরা একজাতিতত্ত্বের কথা বলছেন তা আমরা জানি। তবে আমি এখানে সেকথা বলতে আসিনি যে, বাংলাদেশের অস্তিত্বের মূল কারণগুলোর প্রতি তাঁদের বিশ্বাস নেই, তারা বাংলাদেশ চায়নি। শেখ মুজিবও তাই বিতর্কিত বাঙালি। তিনি বাঙালির ধুয়া তুলেছিলেন, বাংলাদেশের ধুয়া তোলেননি। তবু এদেশীয় জাতিসত্তার একজন পথিকৃৎ হিসেবে আমরা তাঁর নাম করছি। কারণ অনেকের মধ্যে তিনি একজন, তবে তিনি একক নন। অন্যকে অসম্মান করে এঁরা শেখ মুজিবের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাও নামিয়ে আনছেন নিচের দিকে।

সেন রাজদরবার যখন বাংলাভাষা চর্চা বন্ধ করে দিয়ে সংস্কৃতকে তাদের ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতির একমাত্র বাহন করে তুলল সেই দশম শতাব্দীতে, তখনই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল হাজার বছর আগে। জনগণ বুঝল : আমাদেরকে ভারতের বর্ণহিন্দুদের সমাজের শূদ্র বানিয়ে আমাদেরকে বা আমাদের এদেশের জাতিসত্তাকে বিলীন করে দিতে চায় সেনরাজ। ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হল জনগণ। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সেন রাজাকে মাত্র ১৫ জন মুসলিম অশ্বারোহী সেনা এ কারণে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। ইতিহাস এমনি করে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। রাজপুত সমর্থিত মোগল সম্রাটগণ ভারতে রাজত্ব কায়েম করার পর রাজপুত ও ব্রাহ্মণসমাজের সহযোগিতায় সমগ্র ভারতকে মোগল শাসনের অধীনে এনে এক-ভারতের নকশা আঁকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বহুজাতিতত্ত্বের দেশ ভারতে তা সম্ভব হয়নি। বহু অঞ্চল স্বাধীনসত্তা নিয়ে তখনও রাজত্ব করে গেছে। সিরাজ, টিপু, নিজাম, কাশ্মীর রাজ্য, ত্রিপুরা রাজ্য ইত্যাদি এর প্রমাণ। অতঃপর এলো ইংরেজ, সেখানেও বহুজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বহু প্রদেশ যথা— হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, গোয়া, দমন, দিউ, ত্রিপুরা স্বাধীনই রয়ে গেল। অতঃপর প্রথমে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা একজাতিতত্ত্বের উপর আন্দোলন শুরু করল এবং স্বাধীন ভারতের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করল। তখনই মি. জিন্নাহ প্রশ্ন তুললেন : না, মুসলমান ভিন্ন জাতি, কাজেই দ্বিজাতির জন্য দুই দেশ দরকার। মুসলিমের এ আন্দোলন ক্রমান্বয়ে তীব্র রূপ লাভ করল। এদিকে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এ প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিল সমগ্র বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলা যে নামেই ডাকুন না কেন, একেও স্বাধীনতা দিতে হবে। ভারতে তিন রাষ্ট্রের জন্ম হবে। এভাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের আওতায় বহুজাতিতত্ত্বের বীজ রোপিত হল এবং ক্রমান্বয়ে তা বর্ধিত হতে থাকল। আর বহুজাতিতত্ত্বের শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করতে থাকল।

অতঃপর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের যখন প্রস্তুতি চলছে, তখন বহুজাতিতত্ত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম, শরৎবসু, চিত্তরঞ্জন

www.nagorikpathagar.org

দাস, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে অবিভক্ত বাংলাদেশকে স্বাধীন করার প্রস্তাব দেয়া হল ইংরেজ সরকারকে। এটি ছিল বহুজাতিতত্ত্বভিত্তিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। এ-বহুজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে-বাংলাদেশ হবে তাতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সকলে থাকতে পারবে। শুধু তাই নয় এর ফলে যে বাংলাদেশ হবে তা হবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে সমৃদ্ধ— সেন রাজাদের বর্ণহিন্দুবাদপুষ্ট বা মি. জিন্নাহর মুসলিমবাদ সমর্থিত নয়। এমনিভাবেই ১৯৪৭ সালের পূর্বেই সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ জাতীয়তাবাদের পথে প্রথম পা বাড়ান। মনে রাখা দরকার : তখন ভাসানী, আবুল হাসিম ও সোহরাওয়ার্দী ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা এবং শরৎবসু, চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন কংগ্রেস নেতা। স্বদেশ প্রীতির কারণেই তারা এ আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস ও পরিশেষে জিন্নাহ সমর্থিত মুসলিম লীগের জন্য তা হয়ে ওঠেনি। জাতীয়তাবাদের এই যে উদ্ভব ও বিকাশ সেখানে মুজিবের কোনো অবস্থান বা Say ছিল না। তারপরেও যদি কেউ মুজিবকে জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা বলেন— তাহলে ইতিহাসকে বিকৃত করাই শুধু নয়, ইতিহাসকে তাঁরা নির্লজ্জভাবে পাল্টিয়ে দিতে চান। যে গাভী শিশুর জন্ম হল তাঁদের দ্বারা তাঁরাই একে অর্থাৎ বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদকে লালন-পালন করতে লাগলেন।

অতঃপর পাকিস্তান নামক দেশ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীন হল। কিন্তু এ স্বাধীনতা, শুধু ধর্মীয় অনুভূতিতে স্বাধীন হওয়ার কারণে, আঞ্চলিক জাতিসত্তাকে মূল্যায়ন করা হল না। ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক যে জাতীয়তা তাকে উপেক্ষা করা হল। অথচ কেউ এটা বুঝল না : একই ধর্মের লোক পৃথিবীর সর্বত্র অবস্থান করলেও স্বদেশ ও স্বদেশী ভাষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক যে-জাতীয়তা তাকে উপেক্ষা করা যায় না, নিজ নিজ ধর্ম পালন করেও তাকে রক্ষা করা যায়। বরং নিজ ধর্মকে নিজ বা স্বদেশীয় জাতিসত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখতে হয়। যেমন বাংলাদেশে মুসলমান বেশি। কিন্তু এর ভাষা, সংস্কৃতি এদেশীয় মূলধারা থেকে উৎসারিত। কাজেই এর ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে জাতিসত্তার বিকাশ সম্ভব নয়। তবে আনন্দের ব্যাপার : বাংলাদেশের জাতিসত্তা ইসলামী জীবনানুভূতিজাত। কারণ এদেশের মুসলমান মৌলবাদী বা বর্ণবাদী সম্প্রদায় থেকে সৃষ্ট হয়নি। হলেও তা অতি নগণ্য। কিন্তু বাংলাদেশের আদিবাসী অনার্য-দ্রাবিড় বিধায় এদেশের মুসলমান তাদেরই উত্তরপুরুষ। সেজন্য মুসলমানদের ভাষা-সংস্কৃতি তাদের পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত। সেজন্য আমাদের বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো বিরোধ নেই, যতখানি বিরোধ দেখা যায় সেন যুগের বর্ণবাদী ও তাদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে। আর এই ভাষা-সংস্কৃতিকে বাংলাদেশ থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। যখন বাংলাদেশের ভাষাকে অকেজো করে দিয়ে এদেশের জাতিসত্তাকে ধ্বংস করার মানসে ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের স্রষ্টা জিন্নাহ যখন 'উর্দু— কেবল উর্দুকে' রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলেন ঢাকার মাটিতে, তখনই প্রতিবাদের ঝড় উঠল।

জাতীয়তা রক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এদেশের ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ সকল জনগণ। ১৯৫২ সালের এ সংগ্রামে জীবন দিলেন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকে। সে বছর ২১ ফেব্রুয়ারির রক্ত ঝরা দিনে বাংলাদেশী

www.nagorikpathagar.org

জাতীয়তাবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করল। এর নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ও বুদ্ধিজীবিগণ এ-জাতীয়তাবাদের মশালবাহী হিসেবে ইতিহাস স্বীকৃত। এঁদের মধ্যে অলি আহাদ, ভাষা মতিন, গোলাম মাওলা, গাজীউল হক, মীর্জা গোলাম হাফিজ, তাজউদ্দীনসহ প্রচুর ছাত্র-যুবকদের নেতৃত্ব তা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভাসানী, আতাউর রহমান খান, শামসুল হক, আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, আবুল কালাম শামসুদ্দীনসহ অনেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মনীর চৌধুরী, ড. শহীদুল্লাহ, আবুল কাশেম চৌধুরী, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে ভাষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশী জাতীয়তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপায়িত করেন। এর মধ্যে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রশ্নই আসে না, এলেও আরও অনেকের পরে। ফলে জাতীয়তাবাদের চেতনায় যাঁদের ভূমিকা ছিল তিনি তাঁদের পিছনের সারির লোক ছিলেন। সেজন্য এসময় পর্যন্ত তাঁকে জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা নয়, সাধারণ কর্মী বলা যায় কিনা তাও নিয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচারের মাধ্যমে অনেকে অস্বীকার করেন। তবে মুজিব তখনও জাতীয়তার পথে চলছিলেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ পুষ্টি লাভ করে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর। এ-যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন এদেশের তিনজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁরা হলেন : হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী এবং এ কে ফজলুল হক। এছাড়া আতাউর রহমান খান, এ্যাডভোকেট মনসুর, আবু হোসেন সরকারসহ অনেকেই এর নেতৃত্বে ছিলেন। তবে শেখ মুজিব এঁদের সঙ্গে ছিলেন, এঁদের নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে এঁদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। যুক্তফ্রন্ট-নির্বাচনে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আর এক ধাপ এগিয়ে যায়।

কাজেই এ সময় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে আরও পঞ্চাশ জনের মত লোকের অবদানকেও স্বীকার করে নিতে হয়। তবে মুজিব তখনও নেতৃত্বের পুরোভাগে আসেননি। অথচ এসময় হতেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ স্বাধিকারের পথ ধরে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। জাতীয়তাবাদের গাভী বড় হয়, লালিত-পালিত হতে থাকে। তখনও এক্ষেত্রে মুজিবের নেতৃত্বের বিশেষ কোনো অবদান নেই। তারপর আসে গণঅভ্যুত্থান,— এ-অভ্যুত্থানে ভাসানীই নেতৃত্ব দেন '৬৯—'৭০-এর প্রথমদিকে। আগরতলা ষড়যন্ত্রের কারণে মুজিব জেলে থাকেন। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আসাদের মৃত্যুর কারণে ও পাকসেনাকর্তৃক তাঁকে হত্যার কারণে এদেশ স্বাধীনতার পথে অগ্রহসর হতে থাকে। এখানেও মুজিব অনুপস্থিত বললেই চলে। তারপর ৬ দফা ভিত্তিতে '৭০-এর নির্বাচন এবং সর্বদলীয় ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন দেশকে তখন এমন এক অবস্থানে নিয়ে যায়— যেখান থেকে আর ফেরার কোনো উপায় ছিল না; স্বাধীনতার পথেই তাকে এগিয়ে যেতে হয়। মওলানা ভাসানী '৭০-এর নির্বাচনে ভোটে না দাঁড়িয়ে (তাঁর ন্যাপ) শেখকে সমর্থন করেন, ফলে মুজিবের আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল এবং ভাসানী তাঁর আগে থেকেই দেশের স্বাধীনতার কথা বলে আসছেন। জাতীয়তা সৃষ্টিতে এখানে ভাসানী ও মুজিবের অবদানকে স্বীকার করতেই হয়। ভাসানী আগাগোড়া এ পথে কাজ করেছেন এবং মুজিব '৭০-এর ভোটের পর জাতীয়তাবাদ

www.nagorikpathagar.org

সৃষ্টির অধিনায়কত্বের অধিকার লাভ করেন। কিন্তু তিনি একে কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেননি। বরং উল্টোদিকে হেঁটে এদেশের জাতীয়তাবাদকে পিছনে ঠেলে দিয়ে '৭১ সালে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছেন। তাই আমি বলি : গরুর জন্ম থেকে লালন-পালন করল অন্য লোকেরা আর এর কৃতিত্ব নিতে চান মুজিব — এটা কি করে হয়? হয় না। মুক্তিযুদ্ধে তো তিনি বন্দীত্ব বরণ করেন; কাজেই আওয়ামী লীগ যতই তাঁকে জাতীয় নেতার আসনে বসানোর চেষ্টা করুন না কেন, তা সম্ভব নয়। এ-জাতীয়তা সৃষ্টিতে তাঁর অবদান, আর পাঁচজন অগ্রগামী নেতাদের কাতারে না হলেও, আমরা তা স্বীকার করে নিতে পারি। তবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের বাসনা তাঁকে তা থেকেও পিছনে ঠেলে দিয়েছে। আর সেই জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন মেজর জিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে। এভাবে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলেন তিনি। গাভী পালন করল কে তাতো ইতিহাসেই আছে— জোর করে নিজেই সে দায়িত্ব নিলে বা মোসাহেবরা দিলেই কেউ জাতীয় নেতা হতে পারেন না। জাতীয় নেতাদের একজন হতে পারেন মাত্র।

ইংরেজ শাসনের শেষ অধ্যায় থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসের গতিপথ অনুসারী আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল জাতীয়তাবাদের চেতনায় ও মুক্তিযুদ্ধে মুজিবের যে-অবদান ছিল, তা অতি সামান্য। তবু আওয়ামী লীগ প্রধান ও '৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে মুজিবের যে দায়-দায়িত্ব ছিল এবং এদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর যে-অবদান রাখার কথা ছিল— তা তিনি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর উল্টোপথে চলার কারণে লোকক্ষয়ও অনেক বেশি হয়েছে। তবু জিয়া, তাজউদ্দীন ও ওসমানী তাঁকে জাতীয় নেতার মর্যাদা দান করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হননি, পূর্ববর্তী আলোচনায় তা প্রমাণিত হয়েছে। বরং এঁদের প্রতি মুজিবের মনে কেমন যেন ঈর্ষার ভাব বিরাজ করত। তাজউদ্দীনকে '৭৪-এ ক্যাবিনেটের বা মন্ত্রিসভার সদস্যপদ থেকে অপসারণ, মুজিবনগর পরিদর্শনে অনীহা, জিয়া ও ওসমানীর সঙ্গে শীতল সম্পর্ক— এসব কিছুতেই তাঁর এ বিরূপ মানসিকতার প্রকাশ— তা দেশবাসী ভাল করেই জানেন। মুজিব সম্পর্কে জনগণের মানসিক ধারণা কি, তা বিভিন্ন প্রবন্ধকারের নানাকথায় ও বক্তব্যে ফুটে উঠেছে। জনগণের সেই চেতনার প্রতিফলন ড. রেজোয়ান সিদ্দিকীর 'জিয়াউর রহমান : স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ধারাবাহিক নাম'- শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়টি আমরা দেখতে পাই এবং তৎসঙ্গে জিয়ার চেতনার স্বরূপকেও উপলব্ধি করতে পারি।

> ঃ আলাপ-আলোচনা বিলম্বিত ও দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ ও ছাত্রনেতৃবৃন্দ ও দ্বিতীয় সারির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে ক্রমেই বাড়ছিল অসহিষ্ণুতা। তাদের বক্তব্য ছিল, পাকিস্তান যদি নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নেয় তাহলে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতাই হবে এ-অচলাবস্থা নিরসনের একমাত্র পথ। কিন্তু সেটা যে শেখ মুজিবুর রহমান কিছুতেই চাননি, তার প্রমাণ মেলে স্বাধীন পূর্ব- পাকিস্তানের পতাকা তুলতে তাঁর অস্বীকৃতিতে। পতাকা যখন শেখ মুজিবের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল, তখন তাতে বাধা দিতে শেখ মুজিব শাজাহান সিরাজের পাঞ্জাবী টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। একথা বলেছেন শাজাহান সিরাজ

www.nagorikpathagar.org

নিজে। এ সম্পর্কে সিদ্দিক মালিক তার 'উইটনেস টু সারেন্ডার' বইয়ে লিখেছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান উগ্রপন্থীদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে ইয়াহিয়া খানকে ২৩ শে মার্চ বলেছিলেন যে সরকার যেন তাঁকে গ্রেফতার করে এবং তিনি স্যুটকেস গুছিয়েই রেখেছেন। নইলে উগ্রপন্থীদের হাত থেকে তিনি রেহাই পাবেন না।

তখন পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তব পরিস্থিতি তা-ই ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা যত টালবাহানা করছিল, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ততই স্বাধীনতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেখ মুজিব ছিলেন জন-আকাঙ্ক্ষার বাইরে। ২৫ শে মার্চ রাতে দেখা গেল : সত্যি তিনি স্যুটকেস গুছিয়ে রেখেছেন এবং অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছেন, কখন তাকে সামরিক বাহিনীর লোকেরা নিয়ে যেতে আসবে। বেগম মুজিব বলেছেন : তিনি বার বার বাইরে গিয়ে দেখছিলেন কখন শেখ মুজিবকে মিলিটারীর লোকেরা নিতে আসবে। বেগম মুজিব বলেছিলেন, পাকবাহিনীর লোকেরা গুলি করতে করতে আসছিল। সেটাও অস্বাভাবিক নয়। কারণ তারা আশপাশের লোকজনকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল, যাতে সাধারণ মানুষ শেখ মুজিবের পাকিস্তান–যাত্রাপথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। তা না হলে ২৫ শে মার্চ রাতে কি ঘটতে যাচ্ছে, শেখ মুজিব কি তা কিছুই জানতে পারেননি? ঃ

প্রশ্ন আসতে পারে : জিয়া, খালেদা ও বি.এন.পি.-কে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শেখ মুজিব সম্পর্কে এত আলোচনার প্রয়োজন কি? তার উত্তরে বলা যায়: আমাদের দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করার জন্য বলতে চাওয়া হয় শেখ মুজিবই স্বাধীনতার ঘোষক। আমি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং একাত্তরের মার্চের ঘটনার আলোকে যে-বক্তব্যগুলো তুলে ধরেছি, তাতে দেখা যায় : তিনি শুধু স্বাধীনতাই চাননি, তা-ই নয়, স্বাধীনতার বিপক্ষেও অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তিনি এ-প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে যাবেন কেন? বিপরীতে অবস্থানকারী ব্যক্তি কেন পক্ষে কথা বলবেন। তা কি সম্ভব, না বাস্তবসম্মত? স্বাধীনতালাভের ফল ভোগের জন্য নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তি ও দল হিসেবে যদি সুযোগ নিতে চান সেটা অন্যকথা। নিয়েছেনও সে সুযোগ। জনগণও আপত্তি করেনি। তাই বলে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাবেন নিজেদের লজ্জা ঢাকতে? তাতো উচিত নয়—কাম্যও নয়। যদি শেখ মুজিব ঘোষণাই দেবেন তাহলে "শেখ মুজিবের আত্মসমর্পণের পর সরকারই" বা তাঁর পরিবারের ভরণ–পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কেন? আর নিজেদের বাড়িতে থেকে পনের শত টাকা ভরণ-পোষণই বা গ্রহণ করতে যাবেন কেন? কোন দুঃখে?

তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবের প্রত্যক্ষ কোনো অবদান নেই। বরং এর বিপরীতেই ছিল তাঁর অবস্থান। আর মেজর জিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে থাকতে এদেশের প্রতি তাদের যে আচরণ তা তাদের কার্যক্রমে ও আলোচনায়, এদেশকে শোষণের জন্য তাদের ষড়যন্ত্র সবকিছুই প্রত্যক্ষ করে তাঁর অন্তরে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও তাদের প্রতি ঘৃণার জন্ম নিয়েছিল, আজ সুযোগ পেয়ে তিনি তা হাতছাড়া করেননি। তাঁর স্মৃতি চারণে জিয়া বলেছেন যে সুযোগ পেলেই এদেশকে মুক্ত করে তাদের শোষণের জবাব দেবেন। বাস্তবে তা করে তাঁর বাল্যকালের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আবারও বলতে হয় : মুজিবের পাকিস্তানপ্রীতির কারণে নেতা, কর্মী ও সকল দলমতের

www.nagorikpathagar.org

মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও তৎকালীন বৃহত্তর দলের প্রধান হিসেবে এবং জাতীয় ও স্বাধীনতার স্বার্থে যেন তার তরফ থেকে আঘাত না আসে সেজন্য কেউ তাকে ঘাটাননি। বরং তাঁর অবর্তমানেও তাঁকে সম্মান দিয়েছে জনগণ। এখন সেই সম্মান দানকেই পুঁজি করে ইতিহাস বিকৃতি চলছে। এখানে প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত "জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ"– গ্রন্থে ড. এমাজউদ্দীন রচিত 'মুখবন্ধ' নামক ভূমিকা হতে কিছু অংশ তুলে দিয়ে আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে চাই।

ঃ শেখ মুজিবুর রহমানের পাকিস্তানী সৈনিকদের প্রতি আত্মসমর্পণও একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। বিশ্বের বিভিন্নদেশে যে সকল জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে, সেগুলোর কোনো একটিতেও দেখা যায় না যে জাতীয় নেতা তার প্রতিপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন। শুধু তাই নয়, শেখ মুজিবের আত্মসমর্পণের পরে সরকারই তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে যাই হোক, এর ফলে নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে যখন দেশের হাজারোপ্রান্তে লাখো শহীদের রক্তের পবিত্রধারা প্রবাহিত হয়েছে, তখন শেখ মুজিব পাকিস্তানের জিন্দাখানায় সুস্থই থেকেছেন। সুস্থ থেকেছেন তাঁর পরিবারের সকলেই। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষরা যা করে থাকে এ ক্ষেত্রে তা ছিল না। কে না জানেন, মুক্তিযোদ্ধা লেনিনের ভাইকে লেনিনের অপরাধে ফাঁসিতে লটকানো হয়েছিল? সবার জানা, মাও সেতুং-এর স্ত্রীকে তার প্রতিপক্ষরা হত্যা করে। পাকিস্তানের বন্দীখানা থেকে যখন শেখ মুজিব বেরিয়ে এলেন, লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে সহকর্মীদের নিকট তাই শেখ মুজিবের প্রথম প্রশ্ন ছিল, 'সত্যই তোরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিস?' তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি যে, বাংলাদেশ ন'মাসের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন হয়ে গেছে। প্রফেসর স্ট্যানলী উল পার্ট তাঁর গ্রন্থে (Gulfi Bhutto of Pakistan) লিখেছেন, শেখ মুজিব পাকিস্তানের বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে ভুট্টো প্রস্তাব করেছিলেন, পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেল স্টেট (A Confederal State) হিসেবে টিকিয়ে রাখার কথা বিবেচনা করবেন। শেখ মুজিবও বলেছিলেন, দেখা যাক। দেশে ফিরে এসে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে শেখ মুজিব অবশ্য বলেছিলেন, "ভুট্টো সাহেব তুমি সুখে থাকো। আমার দেশ এখন আলাদা হয়ে গেছে। তাই তোমার সাথে আর কোনো বন্ধনের দরকার নেই।"ঃ

এখানে শেখ মুজিবের জীবনের ঘটনাগুলোর ইতিহাসজাত যে-চিত্র তুলে ধরলাম— তা থেকে আমরা জানতে পারলাম : ভাসানী, ফজলুল হক, সোহ্‌রাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ, ভাষা মতিন, গোলাম মাওলা, মীর্জা হাফিজ, তাজউদ্দীন, গাজীউল হকসহ বহু নেতা যাঁরা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন শেখ মুজিবও তাঁদের মতই একজন। তিনি '৭১ সালে স্বাধীনতার বিপরীতে অবস্থান করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেশ ও জাতি যখন স্বাধীনতা- আন্দোলন শুরু করলেন তখন তিনি স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করে নেন। জাতি অতঃপর তাঁকে সম্মান দিয়েছিল এবং তৎকালীন বৃহৎ দলের প্রধান হিসেবে '৭২ সালে যে সম্মান দিয়েছিল তিনি সেটাও রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর শাসনামলের স্বরূপ '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের নিদারুণ অবস্থা, বাকশাল সৃষ্টির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা,

www.nagorikpathagar.org

সংগ্রামী জাতীয় নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে যে মর্মান্তিক যাতনা দিয়েছিলেন তারই প্রকাশ লক্ষ্য করি ১৯৭৬ সালের ১৩ ই নভেম্বর সন্তোষে প্রদত্ত তাঁর শেষ ভাষণটিতে। মুজিব সরকারের কার্যক্রমের একটি চিত্র এ–ভাষণে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এর পূর্ণ বিবরণ সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রণীত 'মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী' গ্রন্থের ৭১১–৭১৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ রচিত 'বাংলাদেশ : সমাজ এবং রাজনীতির চালচিত্র'— নামক গ্রন্থ হতে "মওলানা ভাসানীর শেষ ভাষণ"–শীর্ষক প্রবন্ধের কিছু অংশ এখানে উৎকলিত হল।

ঃ নিজের জীবনের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশ যুগে আমার মর্মভেদী অভিজ্ঞতা হইয়াছে। কেমন করিয়া রক্তের সাগর সাঁতরাইয়া এবং আগুনের পাহাড় ডিঙ্গাইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়া একটি জাতি ক্ষমতালিপ্সু দুর্নীতিপরায়ণ নেতৃত্বের দোষে মাত্র তিন বছরের মধ্যে দুঃখ ও দুর্দশার অতলে তলাইয়া যায়। এ অভিজ্ঞতা আমার চিন্তা ও চেতনায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে।" সত্যি বটে, বলতে দ্বিধা নেই, মুক্তিযুদ্ধের মত এক ঐতিহাসিক অধ্যায় অতিক্রম করে একটি জাতি যখন তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে, রক্তের হাজারো স্রোতোধারায় সিক্ত হয়ে যখন জয়যাত্রা শুরু করে এবং এক অনল কুণ্ডের অতল গহ্বরের সীমাহীন দহনে জ্বলেপুড়ে শাণিত হয়ে পথে নামে ব্যর্থতা তাকে স্পর্শ করতেও ভয় পায়। কিন্তু বাংলদেশে একি হল? মাত্র তিন বছরের মধ্যে দুঃখ ও দুর্দশার অতলে সব কিছু তলিয়ে গেল কেন?

তিনি বলেন, "আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি, আদর্শবোধ বর্জিত, শ্লোগানধর্মী-ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করিতে পারে না। গভীর আদর্শবোধ সম্পন্ন দৃঢ় চরিত্রবান এবং আপোষহীন সংগ্রামশীলতার অধিকারী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরাই মানুষের সার্বিক কল্যাণের পথ সুগম করিতে পারেন। চরিত্র গড়িয়া উঠে আদর্শ চেতনা ও আদর্শ অনুশীলনের মাধ্যমে। একমাত্র আদর্শভিত্তিক সংগঠন ও কর্মসূচীর মাধ্যমেই চরিত্রবান নেতৃত্ব ও কর্মী সৃষ্টি হইতে পারে। মুহূর্তের উত্তেজনায় মানুষ চরম আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারে হয়ত, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া, ধনদৌলত হাতের মুঠোয় পাইয়া তাহারাই শুধু ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতার পথে অটল থাকিতে পারিবে যাহারা সঠিক আদর্শবোধ ও উহার দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে মহৎ চরিত্রের অধিকারী হইতে পারিয়াছে।"

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের চরিত্র চিত্রন করে, তার আদর্শবোধ বর্জিত শ্লোগানধর্মী এবং ক্ষমত'কেন্দ্রিক রাজনীতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে মওলানা ভাসানী যা বলেছেন, তা শুধু তখনকার আওয়ামী লীগ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, বর্তমানে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ক্ষমতার বাইরে থাকাকালে তাঁরা যা বলেন এবং যে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, ক্ষমতায় গিয়ে ক্ষমতার সাথে সাথে যা পাওয়া যায় তা হাতের মুঠোয় এলে, তখন অবলীলাক্রমে তা তাঁরা ভুলে যান। (১৯৭৬ সালে ভাসানী যা বলেছেন, বর্তমানে তার উত্তরসূরি শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

www.nagorikpathagar.org

ভাসানী তাদের কার্যক্রমের আলোকে যে-সত্য প্রকাশ করেছেন ২০০০ সালে এসেও তার পরিবর্তন হয়নি।)

এ-ভাষণে তিনি বলেন, "স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে চার বৎসর যাবৎ ক্ষমতাসীন দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতি ও অরাজকতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করানো হইয়াছে। দেশের উচ্চতম বিদ্যাপীঠ, বিচারালয় ও প্রশাসনযন্ত্র হতে শুরু করিয়া নিম্নতম ধাপ পর্যন্ত দুর্নীতি কলঙ্কজনকভাবে বদ্ধমূল হইয়া আছে। ফলে নিদারুণ অবক্ষয় সমগ্র সমাজকে গ্রাস করিয়া চলিয়াছে। দুর্নীতির রাজত্বে দারিদ্র্য, দুঃখ ও হানাহানি বাড়িবে বই কমিবে না।" মওলানা ভাসানী ১৯৭৬ সালে যা বলেছেন, ১৯৯৮ সালের শেষদিকে বাংলাদেশের অবস্থার প্রেক্ষাপটে তা পরখ করুন তো, দেখবেন, আজকেও মওলানা সাহেবের কথা ষোল আনাই সঠিক। ক্ষমতাসীন দলের দলীয়করণের মাত্রা ভয়ঙ্করভাবে উঁচু শুধু তা-ই নয়, সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এক অভিশাপের মত তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। দুর্নীতির গতি অপ্রতিরোধ্য। নৈরাজ্য সমাজজীবনের নিরাপত্তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। দেশের উচ্চতম বিদ্যাপীঠের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বিশেষ করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিককালের ছাত্রী ধর্ষণের কথা স্মরণ করুন। কি কলঙ্কজনকভাবে দুর্নীতি বদ্ধমূল হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষালয়ে যেখানে ধর্ষণকারী ধর্ষণের 'সেঞ্চুরী" উদ্‌যাপন করে, সে সম্পর্কে কোনো কথা না বলাই উত্তম। প্রশাসন আজ সমাজের মতই বিভক্ত। দলীয়করণের তপ্ত শলাকায় ক্ষতবিক্ষত। বিচারালয় এবং বিচার সম্পর্কে সম্প্রতি বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জন হোল্‌জম্যান যা বলেছেন তার উপর কথা বলার সুযোগ নেই। [বর্তমানে জবাবদিহিতার নামে বিচারালয় বা হাইকোর্টকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে এবং তা না পেরে হাইকোর্ট সম্পর্কে অসম্মানজনক ও অসৌজন্যমূলক উক্তি করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য। ফলে আদালত বারবার এসব আচরণ পরিহারের পরামর্শ দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে।] দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সীমাহীন। সাধারণ মানুষ আজ চায় 'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি'। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন-ধর্ষণ সভ্যজীবনের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। বিধ্বস্ত হয়েছে সামাজিক মূল্যবোধ। আজকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় না যে, মওলানা ভাসানীর নিদারুণ মনোকষ্টের কারণ কি ছিল। তিনি আরো বলেন, "বাংলাদেশ আজ এক যুগ সন্ধিক্ষণে। এদেশের মানুষ ক্ষমতালিপ্সু, দুর্নীতিপরায়ণ, শূন্যগর্ভ, প্রতিশ্রুতি সর্বস্ব, ভাঁওতাবাজ রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহারা কোন অবস্থাতেই বল্‌গাহীন দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচার এবং সর্বব্যাপী নিরাপত্তাহীনতার রাজত্বে ফিরিয়া যাইতে চায়না।" এসব কথা মওলানা ভাসানীর মত নেতার মুখেই মানায়। সব নীচতার ঊর্ধ্বে উঠে, নিজের মাথা আকাশের মত উঁচু করে যিনি শূন্যগর্ভ, প্রতিশ্রুতি সর্বস্ব, ভাঁওতাবাজ রাজনীতির কথা বলতে পারেন, তিনিই তো নেতা। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর অভ্যন্তরে থেকেও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ যাঁর নেই, তিনিই তো বলতে পারেন দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতির বিরুদ্ধে। এর

www.nagorikpathagar.org

বিকল্প যে রাজনীতি, যা "মাঠের মানুষ, কলের মানুষ, খালবিল আর নদীনালার মানুষের রাজ", প্রতিষ্ঠা করার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেছেন, "বর্তমান মুহূর্তে গণদুশমনেরা ক্ষমতাচ্যুত। কল্যাণমুখী জাতি গঠনমূলক কর্মপ্রয়াসের প্রবণতা সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে।" উল্লেখ্য, মওলানা ভাসানী যখন এ অভিভাষণ পাঠ করেন, তখন শেখ মুজিবের সরকার এক নির্মম হত্যাকান্ডের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। এ সরকারের বিকল্প হিসেবে তাই তিনি, "এদেশের শতকরা ৮৫ জনের প্রতিনিধিত্বের কথা বলেন।" "সাদা-কাপড়ী দালানবাসী মানুষের রাজ মেহনতী জনতার জন্য শুধু মাত্র দুঃখ ও দৈন্যই বহিয়া আনে।" এ প্রেক্ষাপটে অর্থপূর্ণ হল আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই ঐতিহাসিক উচ্চারণ। "এ জাতি ঈশ্বরের কৃপায়, নতুনভাবে স্বাধীনতার জন্ম দেবে এবং জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক পরিচালিত সরকার এবং জনগণের কল্যাণে পরিচালিত সরকার পৃথিবী থেকে কোনো দিন নিশ্চিহ্ন হবে না।" [That this nation, under god, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.]

শোষিত ও বঞ্চিতের রাজ প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়। সমাজের দুঃখ-দুর্দশা দূরকরার লক্ষ্যে প্রয়োজন উৎপাদনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা এবং উৎপাদিত পণ্যের সুষম বণ্টন। এ সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, "উৎপাদনশীল কর্মপ্রয়াস শুধুমাত্র সরকারি তত্ত্বাবধানে চলিতে থাকিলে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের কোন সম্ভাবনা নাই। জনগণকেই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও গঠনমূলক কার্যকলাপে জনগণের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ সাধন করিতে হইবে।" তাই তিনি আহ্বান জানান সকলকে এগিয়ে আসার জন্য। তিনি বলেন, "জাতি-ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সাধারণ নাগরিক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের প্রতি আমার আবেদন, আপনারা খোদার ওয়াস্তে সংগ্রামে আগাইয়া আসুন। আল্লাহর শত্রু অর্থাৎ শোষক, জালিম, মুনাফাখোর, চোরাকারবারী দুর্নীতিবাজ ও দুষ্কৃতিকারীদের দুশমন 'মানুষ'।" মওলানা ভাসানীর এ আহ্বান চার্চিলের আহ্বানের মত আবেগ বিজড়িত না হলেও তা ছিল অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং শক্ত গাঁথুনির। ঃ

ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জিয়ার স্বাধীনতার চেতনা সম্পর্কে এবং পাক সরকারের বৈষম্যমূলক স্বভাব ও সারা বাংলাদেশে ও সামরিক বাহিনীতে তার প্রতিফলন বিষয়ে জানতে পেরেছি। এ ব্যাপারটি জিয়াকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন পশ্চিম পাকিস্তানে বাসকারী জিয়া ও বাঙালি সেনাদের মনে যে-আনন্দঘন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাও আমাদের অজানা নয়। ১৯৫৩ সালে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার পর থেকে জিয়া দেখেছেন বাঙালি সেনাদের প্রতি অবহেলা, অযোগ্য সেনা অফিসার হিসেবে বাঙালিদের কটুবাক্য প্রয়োগ এসব বিষয় সচেতন ও বিপ্লবী মানসিকতার অধিকারী জিয়াকে প্রতিনিয়ত ক্ষুব্ধ করে রাখত এবং তাঁর মনে বিদ্রোহী মানসিকতার জন্ম দিত। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট দ্বারা পরিচালিত খেমখারান সেক্টরে বাঙালি সেনাদের কৃতিত্ব,

www.nagorikpathagar.org

পুরস্কার লাভ এবং দেশ বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁদের প্রশংসা করে সংবাদ পরিবেশনা পাক সামরিক বাহিনীতে ঈর্ষার জন্ম দেয়। একজন অফিসার হিসেবে জিয়া এ যুদ্ধে নেতৃত্বদান করেন। শুধু তাই নয়, বাঙালি সেনাদের এ বিজয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের এ বিষয়ে আনন্দের পরিবর্তে আতঙ্কিত করে তোলে। পাক সামরিক প্রধান ও পাক সামরিক শাসক ভাবতে আরম্ভ করেন, ভাষা আন্দোলন ও ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে শোষিত বাঙালিরা তাদের দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে— মওলানা ভাসানী স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বসে আছেন। এর ফলে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের সেনা বৃদ্ধির কারণে তারা যেকোনো সময়ে জনগণের সঙ্গে থেকে তাদের দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে। অতএব সামরিক বাহিনীতে তাদের নিয়োগ কমিয়ে দাও বা সীমিত কর। যেন ওদের স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাদের সামরিক বাহিনী যেন ওদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে না পারে— তারই ব্যবস্থা গ্রহণ কর। তাই ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে তার বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জিয়াকে ধন্যবাদ না জানিয়ে বা সমীহের চোখে না দেখে মনে মনে একজন বিপ্লবী সেনা অফিসার হিসেবে মনে করতে থাকে তারা। বন্ধু না ভেবে শত্রু ভাবতে শুরু করে। এ-সমস্তই জিয়াকে আরো বেশি মাত্রায় বিদ্রোহী করে তোলে— যেজন্য পরবর্তীকালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হন। আমরা জানি: সংগীত শিল্পী শ্রদ্ধেয়া জাহারা খাতুনের পুত্র বাল্যকাল থেকে আত্মমর্যাদার অধিকারী, চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব, বাংলা ভাষানুরাগী ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। স্কুলে লেখাপড়ার সময় উর্দুভাষীদের যেজন্য বাংলাভাষা ও ভাষা আন্দোলন নিয়ে কটূক্তি তাঁর মনকে আহত করত, বিদ্রোহী করে তুলত। "একটি জাতির জন্ম"– নামক স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধে জিয়া উল্লেখ করেন।

ঃ সেই স্কুল জীবন থেকেই মনে মনে আমার একটি আকাঙ্ক্ষাই লালিত হতো, যদি কখনো দিন আসে, তাহলে এ-পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানবো। সযত্নে এ ভাবনাটাকে আমি লালন করতাম। সময়ের সাথে সাথে আমার সেই কিশোর মনের ভাবনাটাও পরিণত হল। পাকিস্তানী পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠত মাঝে মাঝেই। উগ্র কামনা জাগত পাকিস্তানের ভিত্তি ভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্ক্ষাকে। ঃ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহার কারণে এদেশে মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতালাভের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে ৭ই মার্চ '৭১ সালে শেখ মুজিবের ভাষণে স্বাধীনতার কথা না থাকায় জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তার পূর্ব থেকেই চট্টগ্রামে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসারদের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে গোপন শলাপরামর্শ শুরু হয়। তাঁরা পাকসামরিকবাহিনীকে প্রতিহত ও বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন কর্ণেল চৌধুরী ও মেজর জিয়া। কর্ণেল চৌধুরী পরবর্তীকালে শহীদ হলে নেতৃত্বদান করেন মেজর জিয়া। তাঁদের পরামর্শের মূল বিষয় ছিল : আর যাই হোক, পাকিস্তানের দাস হয়ে বাঁচা যাবে না। আর এখন সে সুযোগও এসে গেছে— তাই আমাদের কর্মপন্থা এখনই স্থির করতে হবে। তারা অধীর আগ্রহে মুজিব ও তার সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু মুজিব স্বাধীনতার পক্ষের কাজগুলোর ব্যাপারে দারুণ বিরক্তি প্রকাশ করায় অনেকের মনে হতাশার জন্ম হয়। তবু

www.nagorikpathagar.org

দেশ-জাতি তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছিল। জিয়া তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে গুপ্ত বৈঠক করছিলেন ও মুজিব কি বলেন তা জানার জন্য উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিলেন।

জিয়া ও তাঁর সহকর্মিগণ জানতে পারেন ; ১লা মার্চের অসহযোগ-আন্দোলনের পর থেকেই চট্টগ্রামের অবস্থা অস্থির হয়ে উঠে। বাঙালিদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে বিহারীরা হামলা করে এবং বিহারীদের সঙ্গে পাক-মিলিটারী রাতে বাঙালি পাড়ায় গিয়ে গোপনে তাদের হত্যা করে অনেক রাতে বাড়ি ফিরে আসে। সকালে অনেক আহত বাঙালিকে হাসপাতালে ভর্তি হতে দেখা যায়। এসব ব্যাপারে জিয়া ও তাঁর দল অনুসন্ধান চালায়। প্রকৃতপক্ষে ১লা মার্চ থেকেই আমাদের সামরিকবাহিনী এখানে তাঁদের কাজ শুরু করেন। জিয়ার গতিবিধি জানার জন্য তাঁরই কমান্ডিং অফিসার লে. কর্ণেল জানজুয়া (পাক আর্মি) লোক লাগায়, ফলে জিয়াও তাঁদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে শুরু করেন। জিয়া তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সবরকম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। বিহারী ও পাকবাহিনী মিলে চট্টগ্রামে বাঙালির দোকানে অগ্নিসংযোগ, তাদের হত্যা ও নির্যাতন চালাতে থাকে। ফলে জিয়া ও তাঁর দল প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এ প্রস্তুতির একটি ভাষাচিত্র "একটি জাতির জন্ম-জিয়াউর রহমান" হতে উৎকলিত হল।

ঃ আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্ণেল শওকত (তখন মেজর) আমার কাছে জানতে চান। ক্যাপ্টেন সমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে, স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ আমাদের মাঝে এসব খবর আদান-প্রদান করতেন। জিসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে জমা হয়ে আমার কাছে আসতে থাকে। তারাও আমাকে জানায় যে, কিছু একটা না করলে বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো। সম্ভবত ৪ঠা মার্চে আমি ওলি আহমদকে ডেকে নিই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, "সশস্ত্র সংগ্রাম করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে।" ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সাথে একমত হোন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি। ঃ

প্রকৃতপক্ষে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। লে. কর্ণেল জানজুয়ার (পাক আর্মি) নেতৃত্বে পাকবাহিনী এবং মেজর জিয়ার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী। ১৯৭০ সালে জিয়া জার্মানীর ট্রেনিং শেষ করেই এ-বাহিনীতে যোগ দেন এবং প্রকৃতপক্ষে '৭১-এর ১লা মার্চ থেকেই এ-বাহিনী দ্বিধারায় বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে। জানজুয়া আমাদের দমনের কৌশল অবলম্বন করেন এবং জিয়া তা প্রতিরোধ করার কৌশল অবলম্বন করেন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কড়া নজর রাখতে আরম্ভ করেন তাঁরা। আগে থেকেই জানজুয়া জিয়াকে জানতেন— সেজন্য তাঁর প্রতি সন্দেহের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তার। ১লা মার্চের পর মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভের পূর্বপর্যন্ত পাকবাহিনীদের, বিশেষ করে চট্টগ্রামে অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। জিয়া জীবনের ঝুঁকি নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতাকামী সেনাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করতেন, কর্ণেল চৌধুরীর সঙ্গে গোপনে দেখা করে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এ রকম পরামর্শ বৈঠকে কখনওবা বেগম খালেদা জিয়া উপস্থিত থাকতেন। সামরিক বিভাগে এ সবই জিয়ার জন্য কঠিন কাজ ছিল, তবুও দেশপ্রেমিক জিয়াকে মৃত্যুভয়ও অবদমিত করতে পারেনি। ফ্রান্সের সামরিক অফিসার কর্ণেল চার্লস দ্যগল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে যে-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, এ দেশের কৃতি সন্তান মেজর জিয়া পাকহানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান করে সেই দায়িত্ব অত্যন্ত সততার সঙ্গে পালন করেন। আমরা জানি, ইতঃপূর্বে জেনারেল নওয়াজেশ আলীর সঙ্গে জিয়ার যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আলোচনা হয়, তাতে সামরিকবাহিনীর সকল অফিসার বুঝতে পারেন জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশের প্রতি আকর্ষণ কত তীব্র। তাঁরা জেনে গেছেন জিয়া পাক-বিদ্রোহী মানসিকতার একজন সামরিক অফিসার। সে কারণে পাকবাহিনীর অফিসারগণ তাঁকে যেমন ভাল চোখে দেখতেন না, তেমনি বাংলাদেশী সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ তাঁর এ তেজস্বিতার কারণে সম্মান করতেন। এটিও ওই সময়ে ঐক্যবদ্ধভাবে অবস্থানের জন্য এবং জিয়ার নেতৃত্বকে তাঁরা তখন থেকেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। অপরদিকে পাকবাহিনী দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার ভয়েও এ ঐক্যের প্রয়োজন ছিল। পাকবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে যে-বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে এবং রাজনৈতিক কারণে যেকোনো সময় যে তার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে জিয়া ইতঃপূর্বেই তা আন্দাজ করেছিলেন। একটি ঘটনা থেকে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জিয়াউর রহমানের লেখায় আছে :

> ঃ ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে নিয়োগ করা হল জয়দেবপুরে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নে আমি ছিলাম সেকেন্ড ইন কমান্ড। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্ণেল আবদুল কাইয়ুম ছিল একজন পাকিস্তানী। একদিন ময়মনসিংহের এক ভোজসভায় ধমকের সুরে সে ঘোষণা করলো, —'বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে, তাহলে সামরিক আইনের সত্যিকারের ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তপাত।' (এসময় ভাসানী ও ছাত্রজনতার নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থান শুরু হয় এবং ৬ দফা ও ১১ দফা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে)। এ ভোজসভায় কয়েকজন বেসামরিক ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন ময়মনসিংহের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব মোকাম্মেল। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল কাইয়ুমের এ দম্ভোক্তি আমাদের বিস্মিত করল। এর আগে কাইয়ুম এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদে পাকিস্তানী নীতিনির্ধারকদের সাথে সংযোগ ছিল তার। তার মুখে তার পুরানো প্রভুদের মুখের কথাই ভাষা পেয়েছে কিন্তু তাই আমি ভাবছিলাম। পরবর্তী সময়ে আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করি এবং ওর কথা থেকে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সে যা বলেছে জেনেশুনেই বলেছে। উপযুক্ত সময়ে কার্যকরী করার জন্য সামরিক ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। আর কাইয়ুম সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমি এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এ সময়ে আমি একদিন চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দফতরে যাই। জিএসও-১ (গোয়েন্দা) লে. কর্ণেল তাজ আমাদের

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। আমি তার এসব তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞেস করি। সে আমাকে জানায় যে তারা বাঙালি নেতাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। আমি বারবার তাকে জিজ্ঞেস করি, 'এসব খুটিনাটির প্রয়োজন কি?' এ প্রশ্নের জবাবে সে জানায়,— 'ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিধারায় এসব কাজে লাগবে।' ঃ

গণঅভ্যুত্থানের ('৬৯—'৭০) সময় থেকেই পাকসরকার বুঝতে পারে এদের আর দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়; সেজন্য নির্মমভাবে আমাদের দমন করতে চায় তারা। নানাভাবে সে কথার প্রকাশ ঘটে। সচেতন জিয়া তাদের এসব আচরণের কারণ বুঝতে পেরে প্রথম থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতিগ্রহণ করতে থাকেন। সে কারণে '৭১-এর মার্চে তাঁর কর্মকাণ্ড ও তাদের বিরুদ্ধে অবস্থানের কৌশল গ্রহণ করতে বেগ পেতে হয়নি। অন্যান্য সামরিক অফিসারগণও মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল বলা যায়। এখানে একটি কথা বলা দরকার : সামরিক বাহিনীর মধ্যে চট্টগ্রামের বাঙালি সামরিকবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণীভূমিকা পালন করেন এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সকল বাঙালি সামরিকবাহিনীই এসে এতে অংশগ্রহণ করেন।

মেজর জিয়া ও তাঁর সামরিক সঙ্গীগণ ইয়াহিয়া কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের অনীহা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন, এবার মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতা অর্জন ব্যতীত অন্য কোনো পথ খোলা নেই। বাংলদেশের জনগণ ওদের দাসত্ব মেনে নেবে না। '৫২ ভাষা আন্দোলন, '৫৪ নির্বাচন, '৬৯ গণঅভ্যুত্থান, '৭০ নির্বাচনই তার প্রমাণ। অপরদিকে পাক হানাদার বাহিনীও বাংলাদেশকে দাস করে রাখার হীন কার্যক্রম হিসেবে যুদ্ধপ্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা এদেশের স্বাধীনতা বিরোধী দল ও ব্যক্তিদের হাত করতে লাগল এবং বিহারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাংলাদেশের সংগ্রামী চেতনাকে প্রতিহত করতে চাইল। সমগ্র বাংলাদেশের মত চট্টগ্রামেও সেই নিরিখে পাকবাহিনী কাজ করে যাচ্ছিল। মেজর জিয়া তাঁর প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বলেন—

ঃ ফেব্রুয়ারির শেষদিকে (একাত্তরের) বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠেছিল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারীদের বাড়িগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারীদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে। এসব কিছু থেকে এ যে ভয়াবহ রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাস আমরা পেলাম। এর পর এলো ১লা মার্চ। সারা দেশে শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। ঃ

এদেশের স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে বিহারী ও পাক সেনারা এমন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিল যার মাধ্যমে এদেশকে চিরকালের জন্য দাসে পরিণত করার চক্রান্ত করতে থাকে। তারা এদেশের প্রত্যেকটি পয়েন্টে সেনা সংস্থাপন, গোলাবারুদ ও অস্ত্র শস্ত্র, মজুদ এবং এদেশীয় চরদের সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশকে সামরিক অঞ্চল বা War field-এ পরিণত করে। এদেশের তরুণ-যুবকসহ সকল মুক্তিকামী জনগণ চোখ মেলে

www.nagorikpathagar.org

দেখছে, শুনছে—তবু এ সম্পর্কে নেতৃত্বের নীরবতার কারণে কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না। শ্লোগান, মিছিল, মিটিং এবং বাংলাদেশের সামরিক, বি. ডি. আর., পুলিশ, আনসার বাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠলেও, এ ব্যাপারে সোচ্চার হতে পারছে না কেউ। পাকবাহিনী ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছে, আনুষ্ঠানিক প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হচ্ছে না। মুজিব পাকিস্তানের সিংহাসনে বসার চিন্তায় বিভোর। দেশের ভিতরে পাকিস্তানীদের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে কিছুই বলছেন না তিনি। চট্টগ্রামের সামরিক কর্মকর্তা মুজিব ও তাঁর দলকে এ ব্যাপারে জানান সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে কেউ এগিয়ে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে জোয়ার নামবে, তাতে পাকবাহিনী স্রোতের কুটার মত ভেসে যাবে। এদেশে স্বাধীনতার যে আগুন জ্বলে উঠবে, তাতে ছারখার হয়ে যাবে পাক সরকার, পাক সরকারের সামরিক বাহিনী। কিন্তু শেখ মুজিবের এ নীরবতায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনী তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। দলে দলে আসছে সেনাবাহিনী, ভারী ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ পাকিস্তান থেকে। নামছে চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন সামরিক ছাউনিতে।

এসব দেখে শুনে জিয়ার প্রস্তাবে কর্ণেল এম. আর. চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম থেকেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মেজর জিয়া কর্ণেল চৌধুরীকে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। মি. চৌধুরীর পরই জিয়া এ নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকবেন, স্থির করা হয়। কিন্তু কর্ণেল চৌধুরীকে পাকবাহিনী হত্যা করে। ফলে জিয়াকে নিতে হয় নেতৃত্বের ভার। ১৭ই মার্চ স্টেডিয়ামে লে. কর্ণেল চৌধুরী, মেজর জিয়া, ক্যাপটেন ওলি আহমদ, মেজর আমিন গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে অচিরেই তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করবেন। ১৯শে মার্চ ই .পি. আর.-এর ক্যাপটেন রফিকুল ইসলাম মেজর জিয়ার বাসায় গিয়ে ই .পি. আর বাহিনীকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দেন। ফলে সামরিকবাহিনী ও ই.পি.আর. বাহিনী একত্র হয়ে যৌথ আক্রমণে পাকবাহিনীকে পরাস্ত করবেন বলে তাঁরা সামরিক তৎপরতা শুরু করেন। পাকবাহিনীও সারা বাংলাদেশে জালের মত বিস্তার করে রাখে তাদের বাহিনী। সারা বাংলাদেশই ওয়ার ফিল্ড-এ পরিণত হয়। তাদের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য ২১শে মার্চ পাক সামরিক অধিকর্তা জেনারেল আব্দুল হামিদ খান গোপনীয় পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দানের জন্য চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে যান। জিয়াসহ কিছু বাঙালি অফিসার তাদের গুপ্তপরামর্শ শুনতে পান। জিয়া তাঁর প্রবন্ধে বলেন—

ঃ সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজসভায় জেনারেল হামিদ ২০ বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ফাতমীকে বললো, "ফাতমী, সংক্ষেপে, ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সংখ্যক লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে।"ঃ

পাকিস্তানী বাহিনী প্রকৃতপক্ষে ২৪শে মার্চ থেকেই তাদের কার্যক্রম শুরু ও ব্যাপক হারে কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। ২৪ মার্চ জাহাজ "সোয়াত" থেকে অস্ত্র নামানোর জন্য জোর করে বেরিকেড সরিয়ে তাদের পথ করে নিল। পথে জনতার সঙ্গে পাক মিলিটারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে আহত ও নিহত হল অনেক বাঙালি। ২৫ ও ২৬ মার্চ পাকিস্তানী কমান্ডিং অফিসার বাঙালি অফিসারদের তাদের আদেশ মানতে বাধ্য

www.nagorikpathagar.org

করতে চাইলো এবং এদের হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা কৌশল অবলম্বন করলেন—কেউ গা ঢাকা দিয়ে এবং কেউ তাদের সঙ্গে থেকে সুযোগ বুঝে তাদের আক্রমণ করতে চাইলেন। গা ঢাকা দেয়া অফিসারও তাঁদের বাহিনী নিয়ে সুযোগ বুঝে এঁদের সহযোগিতা ও শত্রুদের ঘায়েল করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী রাত ১টায় জিয়ার কমান্ডিং অফিসার জিয়াকে নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে যেয়ে জেনারেল আনসারীর (পাকিস্তানী জেনারেল) নিকট রিপোর্ট করতে বলল। সঙ্গে ছিল নৌবাহিনীর কয়েকজন পাকিস্তানী প্রহরী। তাঁকে যে বন্দরে গেলেই হত্যা করা হবে, তা তিনি বুঝলেন। এ চিত্র জিয়া সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

ঃ এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে শর্বরীর মত প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তোবা আমাকে চিরদিনের মতই স্বাগত জানাতে।

আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এ সময়ে সেখানে এলো খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন ওলি আহমদের কাছে থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বলল, "তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে ওরা হত্যা করেছে।'

এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম, 'আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। ওলি আহমদকে বলো ব্যাটালিয়ান তৈরী রাখতে, আমি আসছি।'

আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে এলাম। পাকিস্তানী অফিসার, নৌবাহিনীর চীফ পৌর অফিসার ও ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভাল সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানী অফিসারটির দিকে তাক করে তাকেই বললাম, "হাত তোলো, আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম।" সে আমার কথা মানলো। নৌবাহিনীর লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই নৌবাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আট জন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিল। আমি কমান্ডিং অফিসারের জীপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওনা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিং বেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলা শুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম।

দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্ণেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, 'বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনর মতো আমার সঙ্গে এসো।'

www.nagorikpathagar.org

সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটালিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্ণেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। জানালাম 'আমরা বিদ্রোহ করেছি।' শওকত আমার হাতে হাত মিলালো।

ব্যাটালিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এম আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম, ডেপুটী কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, কমিশনার, ডি- আইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।

এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাউকে পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। আপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হলো।

সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও, আর জোয়ানদের ডাকলাম, তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম। ঃ

উক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে বোঝা গেল চট্টগ্রামে জিয়ার নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার পূর্বেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিলেন তাঁরা। অবশ্য সারাদেশেই ওয়ার ফিল্ড বিধায় সর্বত্রই মুক্তিযুদ্ধ ইতিমধ্যে অনানুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।

আমরা জানি, বেগম জিয়া বর্তমানে বি. এন. পি.র নেতৃত্বে ব্যস্ত এবং দেশের ক্রান্তিলগ্নে নির্ভীক সেনানীর মত দেশরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তিনি যে '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে মেজর জিয়াকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন, তা আমরা জানি। একাত্তরের দুঃখের দিনে বেগম জিয়া মেজর জিয়ার সঙ্গে থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্য স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে তিনি গেছেন। পাক অফিসারদের বাসায় দু'জনে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে গিয়ে তাদের মনোভাব জেনে নিয়েছেন, তারপর কি করা যায়— কি করে সব বাঙালি অফিসারদের সংগঠিত করা যায়— তা নিয়ে দু'জনে পরামর্শ করেছেন এবং এ নিয়ে পরস্পরকে সহযোগিতা করেছেন। জিয়া মুক্তিযুদ্ধের যে মহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন— ফলে তাঁর পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব বেগম জিয়াকেই নিতে হয়েছে, তিনি তা অম্লান বদনে গ্রহণ করেছেন।

স্বাধীনতার ঘোষণা ও ঘোষণা অন্তে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া দেশের জন্য যখন অবধারিত, তখনও মুজিব এ বিষয়ে একেবারে নীরব। এদেশ যখন স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত

www.nagorikpathagar.org

তখনও মুজিবের এ নিরবতা যে কত ভয়ঙ্কর, সে চিত্র কর্ণেল ওলি আহমদ তাঁর রচিত 'মেজর জিয়া– স্বাধীনতার ঘোষণা'– নামক প্রবন্ধে সুন্দররূপে চিত্রায়িত করেছেন।

ঃ আমি এবং মেজর জিয়া পটিয়া থানায় বসে বিভিন্ন বিষয় খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করে উপলব্ধি করলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য, সঠিক দিক-নির্দেশনা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া।

হয়ত রাজনীতিবিদরা সীমান্তবর্তী আশ্রয়কেন্দ্র হতে মাঝে মাঝে তাদের ভাষণ প্রচার করবে। ... আর এ দেশ ও রাজনীতিবিদদের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সহজে স্বাধীনতা পাবে না। তাই সুপরিকল্পিতভাবে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র দখল করলাম। মেজর জিয়া জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ২৭শে মার্চ বিকেলবেলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং আমি তাঁর পাশে বসা ছিলাম। মেজর জিয়ার ঘোষণা শুনে দলে দলে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মৃতপ্রায় জাতি অন্ধকারে আলোর সন্ধান পেল ও সকলে বুঝতে পারল কি করতে হবে। হতাশা ও অনিশ্চয়তা দূর হলো। দেশের অন্যান্য শহরে অবস্থানরত বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ, আনসার ও ইপিআর-এর সদস্যরা সশস্ত্র সংগ্রামে ও স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ হানাদারমুক্ত হলো। তবে রাজাকারমুক্ত হলো না। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল আমরা স্বাধীনতা লাভ করলাম।

মেজর জিয়া নয়মাস মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, এদেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা আছে। ঐ দীর্ঘ নয়মাস আমরা একসাথে ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানেরা পাক সেনাদের হাতে বন্দী ছিল। আমি কখনো তাঁর মুখে তাঁর স্ত্রী বা পুত্রদের কথা শুনি নাই। শুধু একদিন কথার ছলে বলেছিলেন, জেনারেল নিয়াজির কাছে একটি পত্র লিখেছি এবং এতে পরিষ্কার লিখেছি যে যুদ্ধ আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মা, বোন বা স্ত্রীদের এতে জড়ানো সঠিক নয়। যদি কোনো সময় তাদের প্রতি অসম্মান দেখানো হয়, তাহলে যুদ্ধ এখানে সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিয়ালকোট এবং লাহোর সেক্টরে নতুন করে যুদ্ধ হবে। অবশ্য যুদ্ধ শেষে জানলাম জেনারেল নিয়াজী সত্য সত্যই বেগম জিয়া এবং তাঁর সন্তানদের যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছে। যা একজন জাতীয় বীরের স্ত্রীপুত্রকে দেখানো হয়। জিয়া প্রতিদিন এক রণাঙ্গন থেকে আরেক রণাঙ্গনে এবং সদাসর্বদা রণকৌশল ব্যবহার করে পাক সেনাদের ঘায়েল করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব সাময়িকভাবে আমাকে অর্পণ করেন। তিনি নিজেই নোয়াখালী জেলা এবং কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত যান। সেখানে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সংগঠিত করেন এবং স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের চট্টগ্রামের সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হোন। এর কিছুদিন পর আমাদের বিরুদ্ধে ক্যাপ্টেন রফিকসহ আওয়ামী লীগের নেতারা ষড়যন্ত্র শুরু করেন। মেজর জিয়া চট্টগ্রাম সেক্টরে থাকুক সেটা তাঁরা পছন্দ করেন নাই। তাই তাঁকে সরানোর জন্য নতুনভাবে পরিকল্পনা করা হল।

www.nagorikpathagar.org

৭ই জুলাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেড (তিনটি ব্রিগেডের একটি) 'জেড ফোর্স' সংগঠিত করার দায়িত্ব তাঁর (মেজর জিয়ার) উপর অর্পিত হলো এবং এ ব্রিগেডের নতুন স্থান নির্ধারিত হলো মেঘালয় প্রদেশের তুরানামক গভীর জঙ্গলে। জেড ফোর্সের ব্রিগেড মেজর হিসেবে আমি নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। এর জন্য তৎকালীন সরকারের কোনো আদেশ (অন্য রকম কোন) ছিল না। অন্যান্য ব্রিগেডের জন্য হিন্দুস্থান সেনাবাহিনী থেকে মেজর নিযুক্ত করা হয়। জেড ফোর্সের জন্য ইন্ডিয়ান মেজর দেয়া হয় কিন্তু তাকে আমি দায়িত্ব অর্পণ না করাতে কিছুদিন পর নিজেই তুরা থেকে চলে যান। জেড ফোর্সের মধ্যে ছিল ১ম বেঙ্গল, ৩য় বেঙ্গল, ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট, গোলন্দাজ বাহিনীর একটি ব্যাটারি, আর্মি ইঞ্জিনিয়ার, আর্মি সিগনাল এবং আর্মি সাপ্লাই কোরের কিছু সদস্য। কিছুদিনের মধ্যে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল এবং রংপুর জেলার বিভিন্ন রণক্ষেত্রে 'জেড ফোর্স' সাফল্য অর্জন করে। অতঃপর ১২ই অক্টোবর জিয়ার বিরুদ্ধে আবারো ষড়যন্ত্র শুরু হয় এবং জেড ফোর্সকে সিলেট জেলার আংশিক দায়িত্ব দিয়ে নতুন জায়গায় স্থানান্তরের আদেশ দেয়া হয়। সেখানেও জিয়া এবং তাঁর জেড ফোর্স নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করেন। অন্য কোন সেক্টর-কমান্ডারকে একাধিকবার এভাবে এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে স্থানান্তরিত করা হয় নাই। তিনি ছিলেন একজন তেজারী সৈনিক, ১ম, ৩য় এবং ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে বহু সম্মুখযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৩/১৪ই ডিসেম্বর জেড ফোর্সের নেতৃত্বে সিলেট জেলা শত্রুমুক্ত করা হয় এবং মেজর জিয়া সিলেট শহরে তাঁর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন। পরবর্তীতে কুমিল্লা সেনানিবাসে হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরিত করা হয়। ঃ

এখানে পূর্বের কথা কিছু বলা দরকার। মুজিবের বন্দীত্ব গ্রহণের পর ২৬ ও ২৭ মার্চ মেজর জিয়ার আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বপর্যন্ত ১/২ দিন বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে কোন নেতৃত্ব ছিল না। কোনো আদেশ ছিল না। আমি এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে যাই। আমি রক্তশপথ নাটক (স্বাধীনতার প্রত্যয়দীপ্ত নাটক) রচনা করে '৭১-এর ২৩ মার্চ ১০/১২ হাজার দর্শকের (নারী-পুরুষ) সামনে মঞ্চস্থ করি ও তা প্রকাশিত হয় এবং সে দিনই প্রায় দু হাজার কপি বিক্রয় হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যে গ্রামেগঞ্জে তা মঞ্চস্থ হতে থাকে, ফলে কয়েক লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা সৃষ্টি হয়। সে কারণে বাংলাদেশে অবস্থান করা আমার জন্য মোটেও নিরাপদ ছিল না। এজন্য পরিবারপরিজন ফেলেই আমাকে চলে যেতে হয় ভারতে। ভারতে গিয়ে সাপ্তাহিক বঙ্গবাণী (প্রবাসী সরকার জিং ১০) প্রকাশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং স্বাধীনতার বহু কাজে জড়িয়ে যাই। সেজন্য আমরা ১৭ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠনের পূর্বপর্যন্ত জিয়ার ভাষণ ও তাঁর কর্মকাণ্ডের উপর বেশি আস্থাশীল থাকতাম। রেডিও কানে নিয়ে থাকতাম কোথায় কিভাবে যুদ্ধ চলছে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা ও প্রবাসী সরকার গঠনের পূর্বে এবং মুজিবের বন্দীত্ববরণের পরে দেশ মাত্র ১/২দিন নেতৃত্বহীন থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে জিয়ার নেতৃত্বেই দেশ পরিচালিত হয়েছে। তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। ওলি আহমদ বলেন—

ঃ ১৯৭১ সাল এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে জিয়া চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব সাময়িকভাবে আমাকে অর্পণ করেন। ঃ

www.nagorikpathagar.org

এখানে উল্লেখ করা দরকার : ১৭ই এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠিত হয় এবং তখন থেকে তারা সমগ্র বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু তার পূর্বেই স্বাধীন বাংলা বেতার চালু হয় বিদেশের মাটিতে। সেখান থেকেই তাজউদ্দীন সরকার গঠনের পূর্বেই ভাষণ দেন। তিনিই স্বীকার করেন, প্রবাসী সরকার গঠনের পূর্বেই মেজর জিয়ার দায়িত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়।

জিয়া : আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি– আমানুল্লাহ কবীর।

ঃ রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য জিয়ার ভূমিকাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন বলেই জিয়াউর রহমানকে তিনি (মুজিব) বাংলাদেশের প্রথম চীফ অব স্টাফ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দিল্লীর চাপে সে সিদ্ধান্ত পাল্টে তিনি সেনাবাহিনী প্রধান করেন মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে।

তাজউদ্দীন বলেন— আমানুল্লাহ কবীর-এর প্রবন্ধ–জিয়া : আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি।

ঃ তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, লড়াইরত আমাদের বাহিনীর চমৎকার সাফল্য এবং প্রতিদিন তাদের শক্তির সঙ্গে জনবলের বৃদ্ধি ও দখলীকৃত অস্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে, যা জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে প্রথম ঘোষিত হয়, সক্ষম করেছে পূর্ণাঙ্গ অপারেশনাল বেস প্রতিষ্ঠা করতে, যেখান থেকে মুক্তাঞ্চলের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।" ঃ

প্রবাসী সরকার গঠনের পূর্বে তাজউদ্দীন জিয়া পরিচালিত বাংলাদেশ সরকারকে ইঙ্গিত করেছেন এবং স্পষ্ট করে বলেছেন, "যেখান থেকে মুক্তাঞ্চলের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।"

জিয়া একদিকে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন এবং ৩০ মার্চ '৭১ সালে রেডিও মারফৎ সমগ্র বিশ্বের দেশগুলোকে জানিয়ে দেন যে তারা (বাংলাদেশ) স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেছে। অপরদিকে পাকিস্তান সামরিক শক্তি বাংলাদেশে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ আরম্ভ করেছে নির্বিচারে। তাদের নির্মম হত্যার শিকার হচ্ছে সকল স্তরের নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ সকলে'। "কাজেই আমাদের দেশকে স্বীকৃতি দান ও সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাই সকল দেশকে— জিয়া।" ফলে সকল দেশ জানতে পারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা। ফলে অনেক দেশই এদেশকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং অনেক দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। জিয়ার বিপ্লবী ও আবেগময় ভাষণ সমগ্র বিশ্বের দেশগুলোকে দারুণভাবে আলোড়িত করে। ক্রমন্বয়ে বন্ধু জোগাড় হতে থাকে। ভারত আমাদের শরণার্থীদের আশ্রয় দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করে।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা ও ১৭ই এপ্রিলের পূর্বপর্যন্ত দেশ পরিচালনা এবং প্রবাসী সরকারের নির্দেশে জেড ফোর্সের অধিনায়ক হিসেবে যে দায়িত্ব পালন করেছেন সে সম্পর্কে এম. আর. আক্তার মুকুল মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার উত্তরে ২৬ শে ডিসেম্বর ১৯৯৩ সালে উইং কমান্ডার (অব:) এম. হামিদুল্লাহ খান বীর প্রতীক লেখেন "কোন গোপন বার্তা ১১নং সেক্টরের যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়নি" নামক প্রবন্ধ। আমি এ প্রবন্ধ হতে তথ্যভিত্তিক ইতিহাস তুলে ধরব। তাঁর মতে—

ঃ যাঁরা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, ছিলেন নেতৃস্থানীয়, তাঁরাই কেবলমাত্র যুদ্ধের বিবরণ তুলে ধরতে পারেন। কিংবা তাঁদের মতামতের ভিত্তিতেই ইতিহাসবিদরা প্রকৃত ইতিহাস রচনা করতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

ঃ তিনি (জিয়া) নিজেই নোয়াখালী জেলা এবং কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত যান। সেখানে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সংগঠিত করেন এবং স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ঃ

ঃ পরবর্তী পর্যায়ে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের আদেশে চট্টগ্রামের সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হোন। ঃ

উক্ত উদ্ধৃতি তিনটির আলোকে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে : তিনি শুধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি, দেশ পরিচালনা ও যুদ্ধ পরিচালনার যে দায়িত্ব তাও তাঁকে পালন করতে হয়। যদিও বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে স্থানীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে ও সামরিক নেতৃত্বের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও অন্যান্য কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তবু সমগ্র স্বাধীন বাংলাদেশের উপর তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হয়। তা না হলে সকলে তাঁর কথা রেডিওতে শুনে কাজ করত কেন ও শোনার জন্য ব্যাকুল থাকত কেন? সমস্ত বিশ্বের প্রতি বাংলাদেশকে সাহায্য দানের আবেদন জানিয়ে জিয়া জাতীয় নেতার দায়িত্বও পালন করেন। স্বাধীনতা ঘোষণা ও প্রবাসী সরকার গঠনের অন্তরবর্তীকালীন সময়ের কিছু ঘটনার কথা আবারো কিছু উদ্ধৃতির মাধ্যমে উল্লেখ করতে চাই।

কোনো গোপন বার্তা ১১নং সেক্টরের যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়নি— উইং কমান্ডার (অবঃ) এম. হামিদুল্লাহ খান বীর প্রতীক।

ঃ সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে কর্ণেল জিয়াই (তখন কর্ণেল) এ উত্তর-রণাঙ্গনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। ঃ

'জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ'–সম্পাদক প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, 'মুখবন্ধ' নামক প্রবন্ধ হতে—

ঃ সেই ঘোর অমানিশার মধ্যে, অত্যন্ত আকস্মিকভাবে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে নক্ষত্রের মত উদয় হলেন জিয়াউর রহমান। কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বেতারকেন্দ্রের কর্মীদের সহযোগিতায় তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ করেন। এ ঘোষণা ঐতিহাসিক। এ ঘোষণা প্রত্যয়দীপ্ত। সামনে চলার সাহসিকতাপূর্ণ আহ্বান। ঃ

তাজউদ্দীন— স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ২য় খণ্ড।

ঃ এ প্রাথমিক বিজয়ের সাথে সাথে মেজর জিয়াউর রহমান একটি পরিচালনা কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর। ঃ

ঃ চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের সমর পরিচালনার ভার পড়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের উপর। নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনীর আক্রমণের মুখে চট্টগ্রাম শহরে যে প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে উঠেছে এবং আমাদের মুক্তিবাহিনী ও বীর চট্টলার ভাই-বোনেরা যে সাহসিকতার সাথে শত্রুর মোকাবিলা করছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ প্রতিরোধ স্ট্যালিন গ্রাডের পাশে স্থান পাবে। ঃ ১১ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত।

www.nagorikpathagar.org

কোন বার্তা পেয়ে নেফা থেকে নভেম্বরের শেষাশেষি ভারতীয় মাউন্টেন ব্রিগেডসমূহ মুক্তিযুদ্ধের উত্তর রণাঙ্গনে ডিপ্লয় করা হয়নি। বস্তুতপক্ষে মে-জুন মাসেই এদের মুভমেন্ট শুরু হয়। সপ্তাহ খানেকের ব্যবধানে আমি এবং মেজর তাহের জেড ফোর্স হেড কোয়ার্টার তেলঢালায় পৌঁছি। মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়াউর রহমান তখন তার জেড ফোর্স গঠনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি তাঁর কমান্ড নিয়ে মে মাসেই তেলঢালায় পৌঁছেন। তেলঢালা মেঘালয়ের রাজধানী তুরা ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মানকার চরের মাঝামাঝি একটি পার্বত্য উপত্যকায় অবস্থিত। আমরা পৌঁছার আগেই মেজর জিয়া তাঁর অধীনস্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১ম, ৩য় ও ৮ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে শক্তিশালী জেড ফোর্স ব্রিগেড গঠনে ব্রতী ছিলেন। এসব রেজিমেন্টে যেসব অফিসার ও সৈন্য ছিলেন তাঁদের তালিকাও যথাস্থানে রক্ষিত আছে। তাঁদের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধসমূহ অর্থাৎ কামালপুর গ্যারিসন আক্রমণ, নকসী বিওপি ধ্বংস, বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণ, ছালিয়াপাড়ার যুদ্ধ, কোদাল কাঠির প্রথম যুদ্ধ, ইত্যাদিসহ যুদ্ধের বিবরণ আমাদের কাছে আছে। জেড ফোর্সের অফিসারদের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল (বর্তমানে) আমীর আহমদ বীরবিক্রম (এডজুডেন্ট জেনারেল বাংলাদেশ আর্মী), ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক (ডিজি, এন এস আই), মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন (রাষ্ট্রদূত), মেজর জেনারেল আনোয়ার হোসেন (ডিজি, বিডিআর), কর্ণেল আকবর হোসেন খান (বন ও পরিবেশ মন্ত্রী), মেজর হাফিজ (এম. পি.), ব্রিগেডিয়ার খালেকুজ্জামান (রাষ্ট্রদূত), কর্ণেল জিয়াউদ্দীন, কর্ণেল ওলি আহমেদ (যোগাযোগ মন্ত্রী), ক্যাপ্টেন সাদেক (বর্তমানে বিডিআর. এ কর্মরত), গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব) আশরাফ, উইং কমান্ডার (অব) রউফ, স্কোয়াড্রন লীডার (অব) লিয়াকত, লে. কর্ণেল নূরুন্নবী, শহীদ ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ প্রমুখ। এরা ছাড়াও জেড ফোর্সের সমস্ত অফিসার এবং সৈন্যদের পূর্ণতালিকা যথাস্থানে রক্ষিত আছে। আমি আগেই বলেছি, সেক্টর কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে কর্ণেল জিয়াই উত্তর রণাঙ্গনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। মেজর তাহের পৌঁছার পর তাকে সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি মহেন্দ্রগঞ্জ বিওপি-র সন্নিকটে (কামালপুরের বিপরীতে) ঘাঁটি স্থাপন করেন। ১১নং সেক্টরকে যুদ্ধের প্রয়োজনে মোট ৮ টি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল মহেন্দ্রগঞ্জ এবং মানকার চর সাব সেক্টর। মহেন্দ্রগঞ্জ বিওপি থেকে ময়মনসিংহের বিস্তৃত অঞ্চলে যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করা সুবিধাজনক ছিল। মানকার চর ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী হওয়ার কারণে এটা বাংলাদেশের গভীর অভ্যন্তরে অভিযান চালনার এবং ঘাঁটিতে ফিরে আসার সর্বাপেক্ষা সুগম পথ হিসাবে বিবেচিত হতো। এই ঘাঁটি থেকেই সুদূর পাবনা ও বগুড়ার যমুনা তীরবর্তী অঞ্চলসহ সম্পূর্ণ গাইবান্ধা এবং আরও প্রায় দুই তিন শ' বর্গমাইল মুক্তাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করা হত। রৌমারী ও রাজীবপুর থানাসহ সানন্দবাড়ী বাজার, মোল্লারহাট, পেয়ারের চর, কালাসোনার চর, ঠাকুরের চর, ছালিয়াপাড়া চর, কোদালকাঠির চর ইত্যাদি বিশাল জনবসতিপূর্ণ এলাকা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের একটি ভূখণ্ড ছিল। ইঞ্জিনিয়ার আবুল কাসেম চাঁদ মুক্তাঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন ও ট্রেনিং-এ অনন্য ভূমিকা রেখেছিল। মেজর তাহের যখন

www.nagorikpathagar.org

সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে মহেন্দ্রগঞ্জে অবস্থান নিয়েছিলেন তখনই সাব সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে আমাকে মানকার চরের দায়িত্ব দেয়া হয়। এই সাব সেক্টর ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত দু'টি গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রৌমারী ও রাজীবপুরে ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রায় ৪০টি পূর্ণ কোম্পানীর সমন্বয়ে অসংখ্য খণ্ড ও পূর্ণ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের একমাত্র এইচ, ই- ৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র ভারত থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এদের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস এবং ফজলুল হক বাহিনীসহ হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তাদের হাতিয়ার নিয়ে কোম্পানী সংগঠিত ও শক্তিশালী করা। এই কাজে তারা স্বল্পকালের মধ্যে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে নিজেদের কোম্পানীগুলোকে দাঁড় করাতে পেরেছিল। শুধুমাত্র মোবাইল সাবসেক্টরটি ছাড়া অধিকাংশ সাবসেক্টর মোটামুটিভাবে স্বনিয়ন্ত্রণাধীন এবং বিশেষ যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রমে তারা স্বনিয়ন্ত্রিত ছিল। মানকার চরের এই সাবসেক্টর বড়ই বিচিত্র। এখানে ভিন্নধর্মী রাজনৈতিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী তরুণ-যুবক মুক্তিযোদ্ধাদের বিশাল সমারোহ ঘটেছিল। মানকার চরে যেমন ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন কোম্পানীতে বিভক্ত হয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থান করত তেমনি মুক্তাঞ্চলে জড়ো হয়েছিল এমন সব মুক্তিযোদ্ধা যারা তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত ছিল না। অথচ তারা ছিল মুক্তিযুদ্ধের জন্য সমর্পিতচিত্ত এবং তারা ভারতে প্রশিক্ষণের কোন সুযোগই পায়নি। এরা সংখ্যায় প্রায় ১৫/১৬ হাজার। ১১নং সেক্টরের আওতাভূক্ত সাবসেক্টরগুলো যথা, ডালু, শিববাড়ী, পুরকাশিয়া, বাঘমারা এবং ডুংড়া। এগুলো অপেক্ষাকৃতভাবে স্বল্প আয়তনের ছিল। সে সমস্ত স্থানে আমরা প্রথমদিকে কোনো অফিসারও নিয়োগ করতে পারিনি। ঃ

এ বিরাট অঞ্চলের মূল দায়িত্বে ছিলেন জেড ফোর্সের সর্বাধিনায়ক মেজর জিয়া। কাজেই পরবর্তীকালে চরমভাবে যুদ্ধ শুরু হলে অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে বা প্রস্তুতিকালে ভারতের জেনারেলগণ এলাকায় এলে ও তৎপূর্বকালের দায়দায়িত্ব পালন করেন জিয়াউর রহমান ও তাঁর অফিসারগণ।

আমি এখানে বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকা, প্রখ্যাত ব্যক্তি ও দেশের বিভিন্ন প্রবন্ধকার ও দেশের যাঁরা তাঁর (জিয়ার) স্বাধীনতা ঘোষণা শুনেছেন তাঁদের বক্তব্য, অভিমত ও কথাগুলো উদ্ধৃতির মাধ্যমে তুলে ধরব এবং মেজর জিয়ার স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে প্রখ্যাত লেখকেরা যে মন্তব্য করেছেন তাও এখানে তুলে ধরে প্রমাণ করব সে তথ্য, তত্ত্ব, যুক্তি ও ইতিহাসজাত ঘটনার আলোকে জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক, স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং প্রবাসী সরকার গঠনের পূর্বপর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের নেতৃত্বদানকারী একজন ব্যক্তিত্ব।

১। ২৯-শে মার্চ, ১৯৭১ গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত সাংবাদিক মার্টিন এডডনির রিপোর্ট (বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, পৃ. ৩৪৭) ঃ "মেজর জিয়ার নেতৃত্বে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে বলে স্বাধীন বাংলাদেশ রেডিও দাবী করে। তিনি কূটনৈতিক স্বীকৃতি ও প্রয়োজনীয় সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।"

www.nagorikpathagar.org

২। নিউইয়র্ক টাইমস্, ৩১-শে মে, ১৯৮১ ঃ "১৯৭১ সালের মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর একজন রেজিমেন্ট কমাণ্ডার মেজর জিয়া দেশের বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সেই রেডিও ভাষণে তিনি নতুন দেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের ইঙ্গিত দিলেও সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব শেখ মুজিবের উপর অর্পণের কথা বলেন।"

৩। সিটিজেন, অটোয়া, কানাডা, ২-রা জুন, ১৯৮১ ঃ "১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তিনিই (জিয়া) চট্টগ্রাম থেকে ঐতিহাসিক রেডিও ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।"

৪। টাইমস, লন্ডন, ১লা জুন, ১৯৮১ ঃ "তিনি (জিয়া) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ইউনিট গঠন এবং তাকে ট্রেনিং প্রদান করেন এবং ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে চট্টগ্রাম দখল করে ২৭-শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

৫। টেলিগ্রাফ, লন্ডন, ১ লা জুন, ১৯৮১ ঃ "১৯৭১ সালের মার্চ মাসে জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম থেকে রেডিওর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। সেনা অফিসারদের মধ্যে তিনিই প্রথম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।"

৬। সানডে টাইমস্, লন্ডন, ৩১-মে, ১৯৮১ ঃ "১৯৭১ সালে তিনি (জিয়া) চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশন দখল করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

৭। এমিরেট্স নিউজ, আবুধাবি, ইউ. এ. ই. ৩-রা জুন, ১৯৮১ ঃ "১৯৭১ সালের ২৭-শে মার্চ মেজর পদে আসীন থাকাকালীন তিনি (জিয়া) চট্টগ্রাম রেডিও থেকে দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

৮। একটি জাতির জন্ম – জিয়াউর রহমান

ঃ এটি ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম, আমরা বিদ্রোহ করলাম। (এটিই ছিল স্বাধীনতা ঘোষণার প্রাথমিক প্রস্তুতি বা মানসিক প্রস্তুতি।)

৯। জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ– সম্পাদক, ড. এমাজউদ্দীন, মুখবন্ধ নামক প্রবন্ধ, পৃ. ৬ "২৭ মার্চের সকালে, ঐদিন বিকেলে কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রে প্রদত্ত জিয়ার সেই ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভাষণ নিজে শুনেছি। শুনেছেন আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা। তখন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ভেবেছি— কে সেই মেজর জিয়া। এতো শক্তি ও সাহস তিনি পেলেন কোথা থেকে?"

১০। ১৯৭৭ সালের ২৭-শে ডিসেম্বর, ভারতের রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে দেয়া ভোজসভায় ভাষণের তাঁর একটি অংশ, "Your position is already assured in the annals of the history of your country as a brave fighter who was the first to declare the independence of Bangladesh." বাংলা অনুবাদ : একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা দানকারী হিসেবে আপনার মর্যাদা ইতোমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত, ইতিহাস স্বীকৃত।

www.nagorikpathagar.org

১১। ১১-ই এপ্রিল, স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র হতে তাজউদ্দীন-এর ভাষণ— "এই প্রাথমিক বিজয়ের সাথে সাথে মেজর জিয়াউর রহমান একটি পরিচালনাকেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর" (স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ২য় খণ্ড)।

১২। জিয়াউর রহমান– আমার সাক্ষ্য : জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান-এর প্রবন্ধ হতে, "কালুরঘাটে ট্রান্সমিশন স্টেশন ছিল। সেখান থেকে জিয়ার কণ্ঠে আমি প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী শুনতে পাই। ... বিশ্ববাসী জিয়ার কণ্ঠস্বরই শুনতে পেয়েছিল।"

১৩। মেজর জিয়া– স্বাধীনতার ঘোষণা : আলহাজ কর্ণেল ওলি আহমদ-এর প্রবন্ধ হতে, "এই পরিস্থিতিতে একমাত্র রেডিও মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। ... মেজর জিয়া জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ২৭-শে মার্চ বিকেল বেলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলো এবং আমি তাঁর পাশে বসা ছিলাম।"

১৪। মৃত জিয়ার দাপট– মাহবুব আনাম-এর প্রবন্ধে, "জেনারেল খালেদ মোশাররফ তো পরিস্কারভাবেই বলেছেন ২৬ মার্চ জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি অবশ্যই উল্লেখ করেন, জিয়া তা করেছিলেন মুজিবের পক্ষ থেকে। এটা সকলেই জানেন, খালেদ মোশাররফ ছিলেন আওয়ামী লীগ পন্থী। তাই তাঁর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষক রূপে জিয়াকে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দেয়ার কোনো কারণই ছিল না।"

১৫। বাংলাদেশের ইতিহাস – ১৭০৪–১৯৭১, প্রথম পর্ব, "ড. মল্লিকদের প্রবন্ধে 'ঘোষণা' সম্পর্কে উল্লেখ আছে, এভাবে ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং পাকিস্তানের পরিসমাপ্তি নিশ্চিত করেছিল। আওয়ামী লীগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও ড. মল্লিক কে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিল তা কিন্তু উল্লেখ করেন নি।"– মৃত জিয়ার দাপট– মাহবুব আনাম।

১৬। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম– ড. রফিকুল ইসলাম ও চারজন বুদ্ধিজীবী, পৃষ্ঠা–১২১। "মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ২৭ মার্চে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একজন বাঙালি মেজরের ঘোষণায় পুরা জাতি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জেগে উঠে। ড. ইসলাম অবশ্য উল্লেখ করেছেন, মেজর জিয়া শেখ সাহেবের পক্ষ থেকেই ঘোষণা দেন।" (আসলে শেখ সাহেব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন, বিপক্ষে অবস্থানকারী কি করে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারে।) –মৃত জিয়ার দাপট—মাহবুব আনাম।

১৭। জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫, পৃ. ৫০০। "আগরতলায় সদস্য রেস্ট হাউসে একটি প্রশ্নের উত্তরে আবদুল মালেক উকিল পরিষ্কারভাবে বলেছেন। শেখ মুজিব তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্বে কোন নির্দেশ দেননি।" এর আগে যখন মার্চের আলোচনা চলছিল তখনও একটি সমঝোতায় পৌঁছার জোর প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং মালেক উকিলকে এ ব্যাপারে খুবই আশাবাদী মনে হচ্ছিল। উল্লেখ্য যে, অলি আহাদ এ সম্পর্কে মালেক উকিল, জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল হান্নান, আলি আযম, খালেদ মহম্মদ আলী, লুৎফুল হাই সাচ্চুসহ এরকম আরো অনেক নেতার সাথে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে দেখা করে জানতে চেয়েছেন শেখ সাহেব ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং

www.nagorikpathagar.org

কর্মপন্থার কোনো নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা। সকলেই নির্দ্বিধায় বলেছেন, "তিনি চাইলেও তাঁর পক্ষে এরকম কোনো নির্দেশ দেয়া সম্ভব ছিল না।" – মৃত জিয়ার দাপট– মাহবুব আনাম।

১৮। দরবারই জহুর– জহুর হোসেন চৌধুরী, সম্পাদক 'দৈনিক সংবাদ, পৃ. ৫৮।"জেনারেল (তখন মেজর) জিয়া ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

১৯। জিয়া : আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি– আমানুল্লাহ কবীর-এর প্রবন্ধ হতে— "আদিপর্বের নায়ক এক নন একাধিক, বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণ। যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর মাধ্যমে। ... স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পর্দার অন্তরাল থেকে আরেকজনের আবির্ভাব ঘটে শেষপর্বে। তিনি মেজর জিয়া।... তেমনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে অমর হয়ে আছেন বাংলাদেশের ইতিহাসে।"

২০। দ্য লিবারেশন ওয়ার—কে সুব্রামনিয়াম: পরিচালক, ইন্সটিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ এন্ড এ্যানালিসিস অফ ইন্ডিয়া। "মেজর জিয়ার কার্যক্রম এবং পরদিন ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ত্বরিত সাড়া দিয়ে চট্টগ্রাম শহর দখল এবং অস্থায়ী সরকারের ঘোষণা দান একজন মধ্যম পর্যায়ের সামরিক অফিসারের তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই কেবল বিধৃত করে না, তাঁর দূরদর্শিতা ও পরিকল্পনাকেও বিশেষভাবে প্রতিভাত করে।"

২১। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বরে নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণের কিয়দংশ, (ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, দ্বিতীয় খণ্ড– "যে শাসন তারা (বাংলাদেশ) চেয়েছিল তার পক্ষে তারা ভোট দেয়। এই জনগণ অন্য কোনো অপরাধ করেনি। যে কারণে স্বাধীনতার ডাক উচ্চকিত হয়ে ওঠে শেখ মুজিবের গ্রেফতারের পরই, তার আগে নয়। আমার জ্ঞান মতে, এমনকি এখন পর্যন্ত তিনি (মুজিব) নিজে স্বাধীনতার কথা বলেন নি।"

২২। জিয়া ঃ আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি – আমানুল্লাহ কবীর-এর প্রবন্ধ, "এসব ঐতিহাসিক দলিল থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বললেও (এটিও রাজনৈতিক কৌশল কারণ ঐ বক্তৃতায় ৪ দফা আরোপ ও জয় পাকিস্তান বলায় সে কৌশল সকলের নিকট ধরা পড়েছে, তাছাড়া আলোচনার মাধ্যমে পাক প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা সেই কৌশলেরই বহিঃপ্রকাশ) শেষ মুহূর্তেও তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি কিংবা (তৎকালীন) কর্ণেল ওসমানী, তাজউদ্দীন আহমদ বা দলের দায়িত্বশীল শীর্ষস্থানীয় কোনো নেতাকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার কোন নির্দেশ দেননি। অস্থায়ী সরকার গঠনের কথাও বলেননি।... যা মেজর জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে প্রথম ঘোষিত হয়।"

২৩। মানুষ ও নেতা শহীদ জিয়াউর রহমান– এম রেজাউল করিম-এর রচনা থেকে, "১৯৭১ সালের ২৭ মার্চে মেজর জিয়া স্বাধীনতার যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তা নিজের কানে অনেকেই শুনেছেন (তাঁদের অনেকে এখনও বেঁচে আছেন) এবং পরবর্তীকালে তা দেশের সব জায়গায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাঁর এই দুর্দান্ত, দুঃসাহসিক ঘোষণাই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করে।"

www.nagorikpathagar.org

২৪। শহীদ জিয়া স্মরণে– লে: জেনারেল (অব) মাহবুবুর রহমান-এর প্রবন্ধ। "১৯৭১ সালের বাংলাদেশ। গোটা দেশ টানটান উত্তেজনা। চারদিকে প্রতিবাদ আর বিক্ষোভের আগুন। পাকবাহিনী গণহত্যায় মত্ত। গণমানুষ বিভ্রান্ত ও দিশেহারা। নাই তাদের কোন দিক-নির্দেশনা। নাই স্থির কোন লক্ষ্য। নাই বিশদ কর্মসূচী ও পরিকল্পনা। এমনি অবস্থায় বেতারে ভেসে এলো, "আমি মেজর জিয়া বলছি।" তিনি মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। গোটা জাতিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানালেন। মেজর জিয়া শুধু ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি তাঁর Force সংগঠিত করলেন এবং প্রচণ্ড সাহসিকতায় যুদ্ধ পরিচালনা করে দেশকে স্বাধীন করতে দৃঢ় ভূমিকা রাখেন।"

২৫। জাতি গঠনের মহানায়ক শহীদ জিয়া– সাদেক খান রচিত প্রবন্ধ। "প্রতিরোধের গণজোয়ার সৃষ্টি হলো। তাকে ঠেকাতে যখন গণহত্যা আর সামরিক দখল শুরু হলো, প্রতিরোধ পরিণত হলো মুক্তিযুদ্ধে। প্রতি আক্রমণের এক মর্মবিদারক হতাশার মুহূর্তে তৎকালীন মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল জাতীয় প্রতিরোধের চেতনায়। মুক্তিযুদ্ধকে কার্যত রূপদান করেছিল মেজর জিয়ার রেডিও ভাষণ। পরবর্তীতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণার মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক উত্তরণ ঘটেছিল।"

২৬। জিয়া– শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব–অধ্যাপক কে এ এম শাহাদত হোসেন মণ্ডল কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ— "শেখ মুজিবুর রহমান স্বেচ্ছায় কারাবরণ করায় নেতৃত্বের অভাবে এবং শত্রুদের মারণাস্ত্রের আঘাতে জাতি যখন দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ঠিক তখনই চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে ইথারে ভেসে এল, সেনাবাহিনীর তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা, ধ্বনিত হলো সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান। তাঁর এই আহ্বান বেসামরিক, সামরিক তথা বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষকে সংগ্রামে উজ্জীবিত করে।"

২৭। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান : একটি মূল্যায়ন– অধ্যাপক আবদুন নূর লিখিত রচনা হতে— "জাতির এমন এক ক্রান্তিলগ্নে চট্টগ্রাম বেতার হতে উচ্চারিত (২৭ মার্চ ১৯৭১) মেজর জিয়ার সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর জাতির মনে সঞ্চার করেছিল অভূতপূর্ব সাহস ও অনুপ্রেরণা। জাতির মহাসন্ধিক্ষণে এ ঐতিহাসিক কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ ও সাহসী দায়িত্বটি পালনের জন্য বাংলাদেশের ইতিহাসে জিয়া স্মরণীয় হয়ে আছেন।"

২৮। স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণতা– অধ্যাপক সাঈদ-উর-রহমান লিখিত প্রবন্ধ, 'আমিরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদ তখন ঢাকা থেকে পালিয়ে পদ্মা তীরের আগারগাঁও গ্রামে অবস্থান করছিলেন। তিনি (আমিরুল ইসলাম) লিখেছেন, 'মেজর জিয়ার আহ্বান, বেসামরিক, সামরিক তথা বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষকে সংগ্রামে উজ্জীবিত করে।' (স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ১৫ খণ্ড, পৃ. ৯৫) মহাদেব সাহা ভাষণটি শুনেছিলেন পদ্মা নদীতে নৌকায় বসে। আবেগপ্রবণ কবি লিখেছেন, 'ফরিদপুরের দিকে আমরা নৌকা নিয়ে চলেছি। রেডিও সেটটি হাতে নিয়ে ঘুরাতে ঘুরাতে হঠাৎ শুনলাম, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া বলছি।' সহসা বুকের মধ্যে লাল রক্ত যেন ফিনকি দিয়ে উঠলো। স্থানকাল ভুলে আমরা কজন সহযাত্রী আনন্দে এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠলাম,

www.nagorikpathagar.org

আমরা বেঁচে আছি, আমরা বাঁচব। হয়ত পদ্মার বক্ষ থেকে আমাদের সেই উল্লাসধ্বনি ক্ষণিকেই বাতাসে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু রক্তের মধ্যে সেদিন যে প্রবল উল্লাসধ্বনি অনুভব করেছিলাম, তা আজো ভোলা যায়নি।" (দলিল পত্র, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭)।

২৯। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ—অধ্যাপক জসীম উদ্দীন আহমদ-এর প্রবন্ধ। "২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে ভেসে আসে মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা। সারা জাতি উদ্বুদ্ধ হলো, ঐক্যবদ্ধ হলো আর স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলো।"

৩০। ইতিহাসের জিয়া বনাম মুজিবের ইতিহাস- অধ্যাপক মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার তাঁর এ প্রবন্ধে বলেন— "পাকিস্তানের ক্ষমতার নেতৃত্বের প্রতি দুর্বলতা ছিল শেখ মুজিবের কাছে রাজনৈতিক বাস্তবতা, যা ভাসানীর মধ্যে ছিল না, তাজউদ্দীনের মধ্যে ছিল না, ওসমানীর মধ্যেও ছিল না। এমন কি পুলিশ, বিডিআর, সৈন্যবাহিনী, ছাত্র-শ্রমিক, জনতার মধ্যেও ছিল না। জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান সেই প্রেক্ষাপটেই হয়েছিল। জিয়া জানতেন না মুজিব জীবিত না মৃত। মুজিব এখনও স্বাধিকার চান, না স্বাধীনতা চান। জিয়ার ভয় ছিল শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে কোনো জীবিত মুজিবুর যদি ফিরে এসে বেঁকে বসেন। তাই প্রথম দিন সেই স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল একান্তই ব্যক্তিগত ঝুঁকিতে নিজেকে সামরিক কায়দার অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপ্রধান বলে উল্লেখ করে। চট্টগ্রামের শিল্পপতি পাকিস্তানের এক সময়কার শিল্পমন্ত্রী এ. কে. খানের বিশেষ ভূমিকার পরবর্তীতে জিয়ার ঘোষণায় শেখ মুজিবের পক্ষে কথাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছিল।"

৩১। জিয়া ঃ স্বাধীনতার ঘোষক ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তক- কাজী সিরাজ রচিত— "কাঁচপুর ফেরীপার হয়ে দেখলাম কিছু লোক জড়ো হয়ে কিসের সঙ্গে কান পেতে আছে। হঠাৎ একটা উল্লাসধ্বনি—পেয়েছি, পেয়েছি। আরো কিছু লোক ছুটে গেল সেদিকে। আমরাও গেলাম। একটা ছোট্ট ট্রানজিস্টার ঘিরে অনেকগুলো লোক। ভেসে এল সেই সাহসী, দৃঢ় কণ্ঠ "আমি মেজর জিয়া বলছি।" এই কিছুক্ষণ আগেও যে মানুষগুলোর চোখে মুখে ছিল ভয় আর হতাশার মেঘ, মুহূর্তে সে মেঘ কেটে গেলো। আনন্দে উদ্বেল হলাম আমরা সবাই। ধমনীতে অনুভব করলাম রক্তের অন্যরকম এক প্রবাহ। বাম-রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থেকেও সেদিন অজানা, অদেখা এক অখ্যাত মেজরের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হলো। ... শেখ মুজিব (তৎপূর্বে) স্যুটকেস গুছিয়ে বসেছিলেন পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য। ... এ ঘোষণা আমি নিজের কানে শুনেছি, সে কথা উল্লেখ করেছি আগে, আমার মত শুনেছে এদেশের আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ।"

৩২। জিয়াউর রহমান : স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ধারাবাহিক নাম- ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী,— "তাঁর দু'একজন সহযোগীদের নিয়ে তিনি জনগণকে রক্ষা ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বাধীনতা যুদ্ধে। কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রের মাধ্যমে ২৬ মার্চ '৭১ তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে জনযুদ্ধ শুরু করার আহ্বান জানান। তিনি স্বাধীন

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যও বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আহ্বান জানান। ২৭ মার্চ '৭১ তাঁর সে ঘোষণার কথা আগরতলার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। যা সংরক্ষিত আছে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে।"

৩৩। ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ, ২৭ মার্চ। "দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে জাতির সেই ক্রান্তিলগ্নে ভেসে আসে একটি কণ্ঠস্বর – 'আমি মেজর জিয়া বলছি।' জাতির ভাগ্য জাতি নিজেই নির্ধারিত করে এগিয়ে যাচ্ছিল। তবুও একটি কণ্ঠ সেদিন অযুত প্রাণে নতুন সঞ্জীবনী মন্ত্র এনে দিয়েছিল। সেদিনের সেই অচেনা মেজর জিয়া ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় হন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট।"

৩৪। শহীদ জিয়া– এ কে এম শামসুল বারী মিঞা মোহন-এর প্রবন্ধ, "পাকিস্তানী বাহিনীর হঠাৎ আক্রমণে নেতৃত্বহীন দিশেহারা জাতির সামনে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে ও প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে জিয়া প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে আশার সূর্যের মত বিকশিত হয়েছিলেন।"

৩৫। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের "কে" ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বলেন, "২৬ শে মার্চ মেজর জিয়া ঘোষণা করেছিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা।"

৩৬। শহীদ জিয়া, স্বাধীনতা ঘোষণা ও প্রাসঙ্গিক ইতিহাস– ঋদ্ধি আকতার নওয়াজ, "আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুর রাজ্জাক বলেন, জিয়ার গলায় প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা শুনি।"

৩৭। "বাংলাদেশের গণহত্যারোধে এগিয়ে আসার জন্য জিয়াউর রহমান ৩০শে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের মাধ্যমে জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি আহ্বান জানান (স্বলিখিত)। এটা ছিল তাঁর তৃতীয় এবং শেষ ঘোষণা। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭১-এর মার্চ মাসে তৎকালীন মেজর জিয়া ঐতিহাসিক স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত মোট তিনটে ঘোষণা দেন এবং তিনটিই তাঁর স্বহস্তে লিখিত। এখানে কারো নির্দেশের কোন প্রমাণ নেই। অনেকে জিয়ার তিনটি ঘোষণাই শুনেছেন, কেউ শুনেছেন দুটি, কেউবা একটি।" স্বাধীনতার দলিলপত্র।

৩৮। স্বাধীনতার ঘোষণা ও শহীদ জিয়া– ড. মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ্ লিখিত প্রবন্ধের অংশ, "মেজর জিয়াউর রহমান যে সর্বপ্রথম ২৬ মার্চ বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে ২৯ মার্চ (৭১) গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত সাংবাদিক মার্টিন এডিনির রিপোর্ট থেকে (বাংলাদেশ ডকুমেন্টস পৃ. ৩৪৭ দ্রষ্টব্য)। এ দিনই ২৭ মার্চ সকালবেলা তিনি ঢাকা থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁর রিপোর্টগুলোও তাই ২৭ মার্চের সকাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে যে সকল ঘটনা ঘটে তারই বিবরণ। এডিনির কথায় ভারতীয় সংবাদসংস্থা জানান যে, মেজর জিয়া খানের নেতৃত্বে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে বলে স্বাধীন বাংলাদেশ রেডিও দাবী করে। তিনি কূটনৈতিক স্বীকৃতি ও প্রয়োজনীয় সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন (প্রাগুক্ত দ্রষ্টব্য)। কাজেই এ থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, ২৬ মার্চই মেজর জিয়া সর্বপ্রথম অস্থায়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতা বেতার মারফৎ ঘোষণা করেন— যা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।"

৩৯। এই কাননের ফুল– আনোয়ার জাহিদ। "আমি মেজর জিয়া বলছি– এই চারটি শব্দ সেদিন সমগ্র জাতিকে আশ্বস্ত করেছিল। সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার সুস্পষ্ট চেতনায়

www.nagorikpathagar.org

উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রতি নাগরিকের ধমনীতে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার অগ্নিস্রোত প্রবাহিত করেছিল। নেতৃত্বহীন অনিশ্চয়তার মাঝে আশা এবং আস্থার নিশ্চিত স্থান নির্মাণ করেছিল। '৭১ সালের ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার কথাগুলো ঘোষিত না হলে আমাদের ইতিহাস কেমন হতো তা ভাবতেও শরীর শিউরে উঠে।"

মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল নিয়ে এবং জিয়ার অবদান সম্পর্কে যা সত্য, তা ২৬শে মার্চ জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে যে দেশের জন্ম হয় তা নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও শত্রুমুক্ত হয়। মুজিব কোনোদিনই স্বাধীনতা চাননি— তাঁর স্বাধীনতা, মুক্তি শব্দগুলো স্বাধিকার লাভের আবেগময় বক্তৃতা। পাকিস্তানের নেতৃত্বের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল, এটি রাজনৈতিক বাস্তবতা— তাঁর আচরণে, ছেলেদের প্রতি তাঁর দুর্ব্যবহারে এবং ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা ও গোপন পরামর্শ সব কিছুই তাঁর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার একান্ত কামনাজাত—তা অস্বীকার করার উপায় নেই। "পঞ্চাশের দশকে শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের চাইতে বেশি আগ্রহী ছিলেন সোহ্‌রাওয়ার্দীর ফর্মুলা অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সমতা বা প্যারিটির পক্ষে। (জাতি গঠনে মহানায়ক শহীদ জিয়া-সাদেক খান)। কিন্তু মুজিব '৭১ সালেও সে চেতনাকে শুধু ধারণ করেই রাখেননি, পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের কারণে আওয়ামী লীগ প্রধান হিসেবে মুজিবের সে চেতনা আরও দুর্বার হয়ে উঠেছে। সে কারণে সমগ্র বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত তখনও তাঁর সমস্ত কার্যক্রম অর্থাৎ একাত্তরের মার্চের কার্যক্রম স্বাধীনতা বিরোধী। যার ফলে ক্ষুব্ধ রবের কাছ থেকে তাঁকে 'রাজাকার' উপাধিও ধারণ করতে হয়। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে একজন শেখ মুজিব। তাঁর এদিকে খেয়াল রাখার সময় হয়নি। অথচ স্বাধীনতার পর বিশেষ করে শেখ হাসিনার রাজত্বকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পশ্চাতে মুজিবের অবদানের কথা এমনভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করে প্রচার করা হচ্ছে যে— তার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই অবস্থান গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তা না হলে উত্তর প্রজন্মের বংশধর এক মিথ্যার আবর্তে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়বে। সে কারণে ইতিহাস উদ্ধার ও ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশের জন্য আওয়ামী লীগ শাসনবহির্ভূত শাসনামলে অর্থাৎ জিয়া, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার রাজত্বকালে মুজিবের প্রতি যে সহানুভূতি তাঁর বিপক্ষ দলগুলোরও ছিল, তা এখন আর নেই। জিয়া, ভাসানী, ওসমানী, তাজউদ্দীন-এর সত্যিকার মূল্যায়ন না করে স্বাধীন বাংলাদেশের সকল কর্মকাণ্ডের প্রতীক হিসেবে মুজিবকে মূল্যায়ন করার কারণে, সকল গবেষক অত্যন্ত দূরদৃষ্টি দিয়ে মুজিবের অবস্থানের চুলচেরা বিশ্লেষণ আরম্ভ করেছে ইতিহাসের আলোকে; যা এর আগে এড়িয়ে গেছে সকলে। ফলে মুজিবের কর্মকাণ্ডকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে যে— তা ইতিহাস থেকে স্বরূপ নিরূপণে তাঁর অবয়ব আরো কালিমালিপ্ত হচ্ছে। সকলে বলাবলি করছেন, হাসিনা সকলের জয় ও সম্মানকে ছিনিয়ে নিয়ে মুজিবের গলায় পরাতে গিয়ে যে ভুল করলেন, তা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁর অতীত ও বর্তমানের চরিত্র বিশ্লেষণ চিত্র থেকেই সকলে বুঝতে পারবেন। কারো জয় অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে চাইলে যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসবে হাসিনা এখনও তা বুঝতে পারছেন না। অবশ্য এখন বুঝতে পেরেও কোন লাভ হবে না। নিক্ষিপ্ত

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি থেকে তাঁর বিরুদ্ধে এখন অনেক কিছুই বেরিয়ে এসেছে। যা এতদিন কেউ ঘাঁটতে চায়নি, তাই ঘাঁটতে লেগেছে সবে। এখন ইতিহাসের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা আরম্ভ হয়েছে। কারো রেহাই নেই।

'৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর নির্বাচন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন ইত্যাদির মাধ্যমে এদেশে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় তা একদিকে দ্বিজাতিতত্ত্বকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে পাক-ভারতে বহুজাতিতত্ত্বের জন্ম দেয় এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তা পাক-ভারতে ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করে। আর এ জাতীয় চেতনার বিরুদ্ধে শেখ মুজিব '৭১ সালের মার্চে অবস্থান গ্রহণ করলেও তা তিনি দমন করতে পারেন নি। ২৭ মার্চ ('৭১) স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সে তার পথ চলতে থাকে এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভই এর সার্থকতা।

জিয়ার বাল্যকালের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও পাকিস্তানীদের দুর্ব্যবহার জিয়ার মানস-চেতনাকে ক্ষতবিক্ষত করে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে সময়-সুযোগ পেলে পাকিস্তানকে এর সমুচিত জবাব দেবেন। সে সুযোগও এসে যায়, তা আমরা নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে বুঝতে পেরেছি। ২৫ মার্চ মুজিবের বন্দীত্ববরণ এ দেশকে নেতৃত্বশূন্য করে দেয়। মুজিবের সঙ্গী রাজনীতিবিদগণ বা নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ দেশ ছেড়ে বিদেশে বা নানাস্থানে আত্মগোপন করেন। তখন জনগণ দিশেহারা হয়ে পড়ে, তারা মুক্তিযুদ্ধ করতে চায়। কিন্তু নেতৃত্ব দেবেন কে। এদিকে ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী এ দেশকে war field বানিয়ে এদেশের উপর অমানুষিক নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিদাহ, ধর্ষণসহ এমন কোনো কাজ নেই যা তারা করছে না— ফলে ঢাকাসহ সকল অঞ্চলে রক্তের বন্যা বইয়ে যেতে থাকে। কাণ্ডারীহীন এদেশের হাল ধরেন সামরিক অফিসার মেজর জিয়া। তিনি চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনী, ইপিআর, পুলিশসহ সকলকে সুসংহত করেন, মুক্তিযুদ্ধের জন্য তৈরী করেন এবং ২৬/২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এ স্বাধীনতা ঘোষণার পথ ধরেই তাজউদ্দীন প্রবাসী সরকার গঠন করতে সক্ষম হন এবং মুক্তিবাহিনী গঠন করে জেনারেল ওসমানীকে তাঁর দায়িত্বভার অর্পণ করেন এবং এ বাহিনীকে ৩টি বিভাগে বিভক্ত করা হলে মেজর জিয়া 'জেড' ফোর্সের অধিনায়ক নিযুক্ত হোন এবং নয় মাস অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে, কখনওবা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেন। সে কারণে মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতা ঘোষণাকারী মেজর জিয়াকে মুক্তিযুদ্ধের নায়ক হিসেবেই বরণ করে নিতে হবে।

আমরা জানি, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের আদিকালে সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক, ভাসানী, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবসহ এবং ভাষা-আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী অলি আহাদ, ভাষা মতিন, গাজীউল হকসহ বহু জাতীয় নেতাই একাধিক নায়কের ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু অন্তপর্বে নায়কশূন্য দেশে জিয়াই স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র নায়ক হিসেবে খ্যাত। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণাই জিয়াকে সে-মর্যাদা দান করেছে।

অতএব, "ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার প্রয়োজনে, পলায়নপর নির্বাচিত নেতাদের অনুপস্থিতিতে জিয়াকে যেমন স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার দায়িত্বভার নিতে এগিয়ে

www.nagorikpathagar.org

আসতে হয়েছিল, ঠিক সে-রকমই একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনে জিয়াকে দেশের শাসনভার নিতে হয়েছিল। জোর করে এ দায়িত্ব তাঁর কাঁধে চাপানো হয়েছিল। দায়িত্ব নেবার মধ্যে যে চ্যালেঞ্জ ছিল সৈনিক জিয়া সেটা গ্রহণ করেন এবং ধ্বংসপ্রায় অর্থনীতি ও ভাবমূর্তিকে পুনরুদ্ধার করেন। কিসিঞ্জারের বাস্কেট-কেস থেকে দেশটিকে টেনে ওঠান এবং একে একটি মর্যাদার আসনে বসান।"

আওয়ামী লীগ ও তার প্রধান মুজিব স্বাধীনতার পর ক্ষমতায় এসে সবকিছু দলীয়-করণ করে জয়ের সমস্ত কৃতিত্ব মুজিবের উপর আরোপ করে ইতিহাসকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে বিকৃত মানসিক চেতনা নিয়ে জয়কে নিজের বাক্সে তুলতে চেয়েছেন কিন্তু শেষপর্যন্ত তা পারেননি। ইতিহাসের লিখন কেউ মুছতে পারে না। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং খালেদা জিয়া গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতায় এসে নিরপেক্ষ ইতিহাস বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্য প্রকাশের প্রয়াস পান। কাজেই জিয়া যেমন স্বাধীনতা ঘোষণার মাধমে একটি জাতির জন্মলাভকে মহিমান্বিত করেন— অপরদিকে জাতীয় প্রয়োজনে একদলীয় বাকশালের পরিসমাপ্তি ঘটানোর পর ভারতের আগ্রাসী চেতনাকে সিপাহী জনতা স্তব্ধ করে দিয়ে— বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় বসান স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াকে। এটিও জাতীয় ইচ্ছার স্বাভাবিক প্রতিফলন এবং তিনি সে দায়িত্ব চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে ও মুক্তিযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে এবং যুদ্ধসঙ্কুল সময়ের প্রাণপুরুষ জিয়াউর রহমানই— ইতিহাসের পাতা খুঁজলেই তার প্রমাণ মেলে। বিকৃতির মাঝে এ স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস কোনো দিনই হারিয়ে যাবে না। আরো উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়ে উচ্চতর প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানতে সহায়তা করবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর, নয় মাসের জাতীয় দায়িত্ব শেষ করে জিয়া তাঁর চাকরিতে আবার ফিরে এলেন। মুজিবও ভুট্টোকে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের Confederation-এর আশ্বাস দিয়ে এসে দেখলেন, এ বাংলাদেশকে আর সংযুক্ত করা কোনো দিনই সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে একটি জনসভায় মুজিব বললেন, ভুট্টো তোমার পাকিস্তান নিয়ে তুমি সুখে থাক, আমার আর তার প্রয়োজন নেই। '৭২ সালের রাজনীতির এ হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু মুজিব কোনো কিছু না করেও এতদিন ধরে যে জয় প্রচারের জোরে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, এখানে তার ছেদ পড়ল। তাঁর নেতৃত্বে কেন দেশ স্বাধীন হল না। এ ঈর্ষা মনের কোণে কালোমেঘের মত স্থায়ী হয়ে রইল। ফলে জিয়া সামরিক বিভাগে উচ্চপদ পাওয়ার অধিকারী হলেও তাঁকে সামরিক বিভাগের চীফ অফ স্টাফ করা হল না। যদিও কেউ কেউ অন্যকথা বলেন। প্রবাসী সরকার গঠন যে স্থানে হয়েছিল সেই মেহেরপুরে মুজিব তাঁর জীবনেও গেলেন না, '৭৪ সালে প্রবাসী সরকারপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে মন্ত্রিপরিষদ থেকে অপসারিত করলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন মুক্তিযুদ্ধের সকল সুনামকে কি করে ছিনিয়ে নেয়া যায়। মোসাহেবের দল তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মুজিবের চারপাশে ভিড় করতে লাগল। তারা বলতে লাগল স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া নয়, মুজিব। কি করে সম্ভব, তার প্রমাণ কই? এজন্য সরকারি যন্ত্রকে ব্যবহার করতে হবে। তৈরী কর কাগজ। লিপিবদ্ধ কর রেকর্ড। বল বন্দীত্ব বরণের পূর্বে তিনি তাঁর কর্মীকে স্বাধীনতা ঘোষণার কাগজ সই করে

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে গেছেন। চলল ইতিহাসে বিকৃতির পালা, নানা প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে প্রচার চলতে লাগল : স্বাধীনতার ঘোষক শেখ মুজিব। ইতিহাস বিকৃতি দেখে জনগণ হতবাক হয়ে গেল, বিশ্বাস করল না কেউ। শুধু তাই নয়। হাসিনার উক্তি হল : পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কাল থেকে আরম্ভ করে মুজিবের মৃত্যু পর্যন্ত মুজিব একাই সবকিছু করেছেন এবং তিনি যখন যে দলে ছিলেন তাঁর সমর্থক ও অনুগতরা অন্ধের মত তা অনুসরণ করে মুজিবের চিন্তা ও কর্মকে রূপদান করেছে। আর আওয়ামী লীগ ধ্বংসকারী মুজিব যে বাকশাল সৃষ্টি করেন, তারাই স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি, অন্য কেউ নয়, বলে প্রচার করতে লাগলেন। অথচ সমস্ত দেশের জনগণই যে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি এবং সমস্ত দেশই যে War field ছিল, তা মুজিব যেমনি জানতেন না, তেমনি পাক সরকারের ভাতায় জীবন অতিবাহনকারী ও স্বগৃহে অবস্থানকারিণী শেখ হাসিনাও জানতেন না। অথচ আমরা জানি, জাতি কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। একটি উদ্ধৃতি—

> ঃ কয়েকদিনের মধ্যেই যখন মুক্তিসেনারা ঘরে ফিরে এল, তখন দেখা গেল, এমন কোন পরিবার নেই, যার দু-একজন নওজোয়ান মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয় নাই, হয় ছেলে, নয় ভাই, নয় ভাতিজা, নয় শ্যালক, নয় নিকট-আত্মীয়, কেউ না কেউ গাজী হয়ে ফিরে এসেছে। ঃ শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী।

নতুবা শহীদ হয়েছে সেসব পরিবারের কেউ না কেউ। শহীদরাও এদেরই সন্তান। এদেশেরই সকল মুক্তিযোদ্ধা-মুক্তিবাহিনী বা কোনো সহযোগী বাহিনীর সদস্য। সহযোগী বাহিনী বলতে মুজিববাহিনী, কাদেরীয়া বাহিনী, বাকশাল বাহিনীসহ এমন অনেক বাহিনী, যারা অঞ্চলভিত্তিক বা মুক্তিবাহিনীর প্যারালাল বাহিনীরূপে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীর খুব প্রয়োজন থাকলেও, প্যারালাল বাহিনীর মুক্তিবাহিনী সদস্য হওয়াই অনেক ভাল ছিল। এছাড়া পাকবাহিনীর নিকট বা এদেশীয় চরদের নিকট ইজ্জত দিতে বাধ্য হয়েছে তিন লাখ মা-বোন। শহীদ হয়েছে ৩০ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ও এদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। নারীরাও অংশ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে।

স্বাধীনতার কাল সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার পূর্বে মুজিববাহিনী নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। সংসদে সংখ্যাধিক আসন লাভের কারণে আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়ে গঠন করা হয় প্রবাসী সরকার ('৭১) এবং বর্ষীয়ান নেতা মওলানা ভাসানী এ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জিয়াসহ দলমতনির্বিশেষে সকল জনগণ এ প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিক পথে মুক্তিযুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মানসে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন, তাঁর বন্দীত্ব বরণের পর তাঁরই অনুগত জনেরা স্বাধীনতা যুদ্ধকে অন্যখাতে পরিচালিত করার জন্য সরকার পরিচালিত ও মুক্তিবাহিনীর প্যারালাল আর একটি বাহিনী গঠন করেন— এক ঘরমে দু পীরের মত। আর এ প্যারালাল বাহিনী গঠিত হয়েছে ভারতে ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে। যাঁরা এ বাহিনীতে নেতৃত্ব দেন তাঁরা তাজউদ্দীনের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী সরকারকে মেনে নিতে পারেননি। নয় মাসের মধ্যে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচেষ্টাও হয়েছে দু-তিন বার। ভাসানীর চোখ রাঙানির ভয়ে তা শেষ পর্যন্ত টেকেনি। খামোশ— বলে সব থামিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া এ দেশের ব্যাংক থেকে যাঁরা

www.nagorikpathagar.org

টাকা নিয়ে ভারতে যান, তাঁদের অনেকেই প্রবাসী সরকারের কাছে টাকা জমা না দিয়ে ভারতের বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রাখেন। আমাদের টাকার মূল্যমান তখন বেশি থাকার কারণে তাদের ব্যাংকে সেই ১ (এক) কোটি টাকা দেড় কোটিরও বেশি হয়ে যায়। এ সুযোগও জমাদানকারী গ্রহণ করে। প্রবাসী সরকার থেকে এদের প্রতি নোটিশ ও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হলেও, তা মুক্তিযুদ্ধের কারণে কড়াকড়িভাবে আরোপ করা যায়নি। আমরা জানি, প্রবাসী সরকারকে এভাবে যারা অস্বীকার ও বিব্রত করেছে : তারাই তাদের ব্যাংকে রাখা টাকা এই মুজিববাহিনীর পিছনে খরচ করেছে। এর উদ্দেশ্য কি তাও সকলের অজানা থাকার কথা নয়। তাজউদ্দীন সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে মুজিব বাহিনীকে নেতৃত্বদানকারীদের একটি বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশ আজ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হয়ে থাকত, তা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়। আমরা তাই আমাদের সম্পাদিত পত্রিকায় মুজিববাহিনীর বিরুদ্ধে লেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গে পরামর্শ করি। তিনি আমাদের বলেন, "দেখ মকবুল, মুজিববাহিনী আমার ঘুম হারাম করে দিয়েছে। না পারছি সইতে, না পারছি প্রতিবাদ করতে। প্রতিবাদ করলে যে দেশে আমরা আছি, তারাই সব উলট-পালট করে দেবে। কাজেই ধৈর্য ধরা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। তোমাদের পত্রিকায় এর পক্ষে-বিপক্ষে কোনা কিছু লিখো না। কোনো রকমে আমাদের স্বাধীন হতে দাও।" আমরা তখন নীরবে এ অনাচার সহ্য করি। মুজিব বাহিনীর সদস্য অনায়াসে মুক্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ করলে তা আরও শক্তিশালী হত— এতে ঐক্য আরো বৃদ্ধি পেত। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে মুজিব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরে এলে সেই মুজিববাহিনীর যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং প্রবাসী সরকারকে যাঁরা টাকা জমা দেননি, তাঁরাই মুজিবকে ঘিরে রাখেন এবং তাজউদ্দীনকে ফেলে দেয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে থাকেন। আজও আবার সে ষড়যন্ত্রের শিকার আজ সারাদেশ। মুক্তিবাহিনীর নতুন করে তালিকা শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন শেখ হাসিনা— তাঁর সইযুক্ত কাগজের অধিকারীই নাকি আসল মুক্তিযোদ্ধা। এভাবেই জিয়া, তাজউদ্দীন, ওসমানীর নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের বাদ দিয়ে বিতর্কিত মুজিব বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে বা তাদের সমর্থক অমুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরি হচ্ছে— যা কোনো দিন মেনে নেয়া যাবে না। প্রয়োজনে আবার সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে পুনঃ তালিকা তৈরি করা হবে, মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে তা করা হবে। শেখ হাসিনার তৈরি ইতিহাস বিকৃত তালিকা একদিন অচল বলে ঘোষিত হবে। খালেদা ও ওলি আহাদও পত্রিকায় সেকথা বলেছেন। এ ছাড়া সেই মুজিববাহিনীর বদৌলতেই স্বাধীনতা-উত্তরকালের মুজিব সরকার সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে রেখে মুজিববাহিনীদের নিয়ে প্যারালাল রক্ষীবাহিনী তৈরি করেন। এ রক্ষীবাহিনীর বেশির ভাগই ছিলেন মুজিববাহিনীর সদস্য। তারা শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুজিব-অনুগত আওয়ামী লীগার ও মুজিবের কথা ছাড়া অন্য কারো কথা শুনত না তারা। তখন আমরা আওয়ামী লীগের (পাকিস্তান আমল থেকে) সদস্য ছিলাম (বাকশাল গঠনের পূর্বপর্যন্ত ও বাকশালের সদস্য হইনি)। তবু আমাদের বাড়ি সার্চ করা হয়েছে। আমাদের অনেকের উপর জুলুম করা হয়েছে। আমাদের অনেককে হত্যা করেছে তারা। আদতে সেই লক্ষ্য সামনে

www.nagorikpathagar.org

রেখেই ভারতে প্রথম মুজিববাহিনী গঠন করা হয় এবং হাসিনা সরকার বর্তমানে তাদের তালিকা তৈরি করে মুক্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে চালিয়ে দিতে চাচ্ছেন।

আমি শেখ মুজিবের শাসনকালকে দুই ভাগে ভাগ করতে চাই। বাকশাল-পূর্ববর্তী শাসন ও বাকশাল-পরবর্তী শাসন। বাকশাল-পূর্ববর্তী শাসনকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। নির্বাচন-পূর্ববর্তী শাসন ও নির্বাচন-পরবর্তী শাসন। তবে সব শাসনামলেই সন্ত্রাস বিরাজ করেছে, নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হয়েছে। হত্যা, নারীধর্ষণ, ছিনতাই—যা বর্তমানে হাসিনা সরকারের আমলে হচ্ছে—তার মতই অরাজক অবস্থা ছিল। তখন বিদেশ থেকে যে সাহায্য আসত মুজিবের মোসাহেবরা তা লুটেপুটে খেয়েছে। 'চাটার দল' চেটেই গেছে, কাউকে রেহাই দেয়নি। ফলে এদেশটি তলাবিহীন ঝুড়িতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। একদিকে যেসব আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী মুজিববন্দনায় পঞ্চমুখ, তারা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছেন। বাড়ি, গাড়ি, দালান-কোঠায় বাস করছে তারা। আদর্শবান ব্যক্তিদের মর্যাদার কোনোই মূল্য দেয়া হচ্ছে না। দেশে নিরন্তর অভাব লেগেই আছে। মানুষের আয়ের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তারা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। ক্ষুধার তাড়নায় নারীগণ নারীত্বের মর্যাদা রাখতে পারছেন না। পিতা সন্তানকে বিক্রি করছে, অনেকে ক্ষুধার তাড়না সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। বাসন্তীরা লজ্জা নিবারণের জন্য জাল বা কলার পাতা পড়েছে। হেন কোনো অপরাধ নেই যা সংঘটিত হচ্ছে না। তারপর আওয়ামী লীগ বিরোধী দলগুলোর উপর দমননীতি এমনভাবে চালানো হচ্ছে যে তারা নিজেদের বাড়ি ছেড়ে অন্য স্থানে রাত্রিবাস করেছে। তার উপর আছে রক্ষীবাহিনীর হামলা বাড়ি তল্লাশির নামে। তাদের হাতে অনেক নিষ্পাপ লোক জীবন দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে আওয়ামী লীগ ও রক্ষীবাহিনী হত্যা করেছে। অন্য দল করার অপরাধে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। '৭৪-এর দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। ইত:পূর্বে এত বড় দুর্ভিক্ষ আর হয়নি। এরই মধ্যে চাটুকারদের পরামর্শে মুজিব আরো ভয়ানক সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন, যা ইতিহাসের একটি জঘন্য অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। যখন তাঁরা দেখলেন : ভোটের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করা আর সম্ভব নয়, তখন ক্ষমতায় চিরস্থায়িভাবে টিকে থাকার জন্য সাংবিধানিক ক্যু করলেন শেখ মুজিব। এই ক্যুর মাধ্যমে ১৫ মিনিটের সংসদ অধিবেশনে সকল দল নিষিদ্ধ করা হল। বিচারবিভাগের ক্ষমতাকে খর্ব করা হল, ৪টি পত্রিকা বাদে সকল পত্রিকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। চিন্তার অধিকার, প্রকাশের অধিকার, জনসভা বা মানুষের মধ্যে সরকার নিয়ে সমালোচনার অধিকার বন্ধ করা হল। গণতান্ত্রিক সংবিধান স্থগিত ঘোষণা করা হল। নির্বাচনের অধিকার খর্ব করা হল। সমস্ত ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করা হল। এ এক অসহনীয় অবস্থা। 'বাকশাল' এ সাংবিধানিক ক্যুর কণ্টকিত ও বিষাক্ত ফসল। স্বাধীনতার ঘোষককে সেনাবাহিনীতে তার প্রাপ্য পদ প্রদান করা হল না, তাজউদ্দীনকে মন্ত্রিসভা থেকে বিচ্যুত করা হল। তাদের মতাদর্শ বিরোধী স্বাধীন বাংলার নাট্যকার, গীতিকার, প্রবন্ধকার ও স্বাধীন বাংলা বেতারের লেখক, কথক ও পাঠক তাঁর মর্যাদা ও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। স্বাধীনতাযুদ্ধে অবদান রাখতে পারেননি, কিন্তু মুজিবের তোষামুদে এমন বুদ্ধিজীবীদেরকে রাজাকার হলেও, রাতারাতি মুক্তিযোদ্ধা

www.nagorikpathagar.org

বানানো হল, তাদের বিপক্ষে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা। বুদ্ধিজীবী রাজাকারে পরিণত হল রাতারাতি। তাঁদের অর্থনৈতিক সংকটে ফেলা হল, এঁদের জাতীয় পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা হল, আরো কত কি!

অবশেষে '৭৫-এর আগস্টে সামরিক ক্যুর মাধ্যমে মুজিব ও তার পরিবার এবং আত্মীয়বর্গকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। বাকশাল শাসনের এভাবে অবসান হল। এ পরিবর্তনে দেশ ও জাতি বাকশালের হাত থেকে রক্ষা পেল। এ সম্পর্কে 'শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী' আব্দুর রহীম প্রণীত গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ড হতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পাব। তার পূর্বে একটি কথা বলা দরকার : ভারত সরকার তাজউদ্দীনকে পছন্দ করতেন না, সে কারণে মুজিবকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাজউদ্দীনকে সরিয়ে দেয়ার জন্য। কারণ, তাজউদ্দীন বলেন : "স্বাধীনতার জন্য আমরা যে মূল্য দিয়েছি, তা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্র হবার জন্য নয়। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে রাষ্ট্রপরিবার গোষ্ঠীতে উপযুক্ত স্থান আমাদের প্রাপ্য। এ অধিকার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্মগত অধিকার। (প্রকাশক : মুক্ত পাবলিশার্স : প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৯৭)।" এখন মওলানা ভাসানীর বক্তব্য ও উক্ত গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের কিছু অংশ উদ্ধৃত করে শেখ মুজিবের শাসনের স্বরূপকে উন্মোচিত করব।

স্বাধীনতা উত্তরকালে শেখ মুজিবের শাসনের যে চিত্র, তা আমি ইতঃপূর্বে তুলে ধরেছি। সে শাসনে জনগণ যে মানবেতর জীবনযাপন করেছেন ও দৈনন্দিন জীবনের হাহাকার, মৃত্যু, ধর্ষণের ভয়াবহ চিত্র ৮৫ বছরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মওলানা ভাসানীকে এমনভাবে ব্যথিত করে তুলেছে যে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন নি। ভাসানীর এ জীবনচিত্রকে অধ্যক্ষ খোন্দকার আবদুর রহীম অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। "৮৫ বছরের জঈফ শরীর নিয়ে মওলানা ভাসানী সাহেব আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকার খায়েশ করলেও আল্লাহর বান্দার প্রতি তাঁর কর্তব্য অর্থাৎ হক্কুল এবাদের ডাকে তাঁকে আবারও ময়দানে নামতে হবে। ... জনগণের ভোটে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে যে ধরনের কেরামতী শুরু করে দিয়েছে, সেটা ১৯৫৪–'৫৮ সনের (পাক) ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে।" আওয়ামী শাসন দেশের কল্যাণের দিকে একটুও নজর না দিয়ে নিজের আখের গোছানো নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং শেখ মুজিব চাটুকার দ্বারা এমনভাবে পরিবেষ্টিত ছিলেন যে বাইরে কি হচ্ছে তা দেখার সময় পাননি। তাছাড়া তা দেখলেও তাঁর মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কারণ, "তাঁর (মুজিব) সময় গণভবন একটা পুরাদস্তুর আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিল। শেখ সাহেবকে সাহায্য করতে তাঁর পাশে যারা অবস্থান করত, তারা প্রত্যেকেই মনে করত যে তারা আজীবন গণভবনের অধিবাসীই থাকবে। নানারকম নির্দেশ যেত ঐ গণভবন থেকে। থানার দারোগা থেকে সচিবালয়ের কর্মকর্তা পর্যন্ত সবাই তটস্থ থাকতেন গণভবনের ভয়ে।"

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন : ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শরণার্থী হয়ে ভারতে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৮৫ লাখ হিন্দু এবং ১৫ লাখ মুসলমান ছিলেন। এ শরণার্থীর অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে ও মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণের জন্য সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু হিন্দু শরণার্থী, দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া, মুক্তিযুদ্ধে তেমন কোনো অবদান রাখেননি। এ ভিন্ন মুক্তিযুদ্ধের শেষে পাকবাহিনীকে জেনেভা কনভেশনের আওতায় ভারতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং '৭১-এর বাংলাদেশের গভর্ণর ডা. মালিককেও সরকার ছেড়ে দেন, আইনগত কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে। শুধু গরীব রাজাকারদের উপরই শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়— অথচ তারা সেই সব নেতাদের কারণেই পাকবাহিনীর সঙ্গে কাজ করেছিল। এদের পক্ষে বক্তব্য নয়, রাঘববোয়ালদের সকলেই সমীহ করে— এটিই আমি বলতে চাচ্ছি।

শেখ মুজিব কাউকেই না জানিয়ে ভারতের সঙ্গে ২৫ বছর মেয়াদী এক গোপন চুক্তি করেন। এটি দাসখতের মত একটি চুক্তি। ভারত-বাংলাদেশ "মৈত্রীচুক্তির আড়ালে ভারত যে সাম্রাজ্যবাদী চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা তিনি (ভাসানী) কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন নি।"

শেখ মুজিবের লুটপাটের শাসনকালের পরিচয় ভাসানী, ১৯৭২ সালের ৩১-শে মার্চ আয়োজিত চট্টগ্রাম জেলার এক বিশাল জনসভায়, তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন, তাতে তিনি বলেন : "জানি না বর্তমান সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে কতটা যত্নবান হবে। আলামত যা দেখেছি, তা ১৯৪৭-পরবর্তী মুসলিম লীগের লুটপাট সমিতির পুনরাবৃত্তি মাত্র।" অতঃপর ১৯৭২ সালের ২-এপ্রিল ঢাকার জনসভায় মওলানা ভাসানী তাঁর ভাষণে বলেন : "স্বাধীনতার পূর্বে আওয়ামী লীগের যে সব লোকের থাকবার জন্য টিনের ঘরও ছিল না, তারা এখন বড় বড় বাড়ি ও গাড়ির মালিক। তারা আজ অন্যের কল-কারখানা, দালান-কোঠা নিজের নামে মিথ্যা দলিল করে নেবার জন্য তৎপর।... আজকের বন্যানিয়ন্ত্রক মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক, আজকের প্রধানমন্ত্রী মুজিবুর রহমান দুই আনার মুড়ি খেয়েও আওয়ামী লীগ করেছে। যদি দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র কায়েম করতে চাও, তবে শক্তিশালী বিরোধী দল গড়তে দাও।... খবরদার। মুজিবর। পক্ষপাতমূলক কথা বলো না।" ভাসানী একই বক্তব্যে আরো বলেন, "মুজিব-সরকারের প্রতি ইন্দিরা চক্রের নির্দেশ... বাংলাদেশের জন্য পৃথক কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখা যাবে না।" এছাড়া ভারতের ৮টি অধীনতামূলক চুক্তিও ভাসানীকে ব্যথিত করে।

একই গ্রন্থে (লেখক আ. রহিম) শাসনতন্ত্রের মূল স্পিরিটের উপর যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলেই বাংলাদেশের সরকার ও সরকারপ্রধানের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা কি তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। "বাংলাদেশের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার 'তড়িঘড়ি' করে যে শাসনতন্ত্রটি দান করেছিলেন, তার স্পিরিট ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী কালচারের বিজয়সূচক। এবং সেই বিজয়কে আরো অধিক অর্থবহ করে তোলার অছিলায় সে সময়ে বাংলাদেশের রেডিও, টেলিভিশনে হামেশা শোনানো হতো 'হাজার বছর পরে, আবার এসেছি ফিরে, বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে'। এ সংগীতটি অর্থাৎ বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী কালচারের যে বিজয় সূচিত হয়েছিল, তাকে আরো অর্থবহ, আরো সংহত করার অছিলায় হামেশা একটি গানের মাধ্যমে বোঝানো হতো।" এখানে কেন এ গান বাজানো হত তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'হাজার বছর পরে' এ গানটিতে হাজার বছর পূর্বের চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন সুচতুর গীতিকার,— যার ভিতর ব্রাহ্মণ্যবাদী কালচার, কৃষ্টি ও শাসনের সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় ১৯৭৩-'৭৪ সালে। এ থেকে হাজার বছর পেছনে যান, সেখানে পাবেন ৯৭৩-৯৭৪ সাল। আর এ সময় হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী বা বর্ণবাদী শাসক সেনরাজার রাজত্বকাল পাবেন। সে সময় ব্রাহ্মণ ও বর্ণহিন্দু সেনরা রাজত্ব করতেন, হাজার বছর পরে আবার সেন রাজত্বে ফিরে এসেছি বলে গৌরবে এরা আত্মহারা— তাহলেই বুঝুন ব্যাপারটি কি? আরো ব্যাপার আছে, এই সেনদের হাত থেকে মুসলমানগণ ক্ষমতা নিয়ে প্রায় হাজার বছর ধরে শাসন করেছে বাংলাদেশ। অবশ্য ইংরেজ এর মাঝে কিছু দিন ছিল। মুজিব সরকারের সময়কালীন গীতিকার এ সময়কালকে পরাধীন হিসেবে গণ্য করেছেন এবং সেনরাজরাই স্বাধীন ছিল—এটিই এ গানের মূল স্পিরিট। সেজন্য সরকার ও গীতিকার সেনরাজের সময়ে আবার ফিরে এসেছেন এটাই বলতে চান। অথচ সেনরাজাদের সময় এদেশের জনগণ পরাধীন ছিল। সেনরাজগণ বাংলাদেশের জনগণকে সংস্কৃতচর্চা ব্যতীত বাংলা ভাষায় লিখতে দিত না, সাহিত্যচর্চা করতে দিত না। ফলে তাদের রাজত্বকালে দুশো বছর ধরে বাংলাচর্চা বা বাংলা সাহিত্যচর্চা হয়নি। এজন্য এ দুশো বছর কালকে বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। একজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগ সরকার ও আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের কাম্য। সেজন্য 'হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে' গানটির মোজেজা কি তা বোধ হয় এতক্ষণে সকলে বুঝতে পেরেছেন। মুজিবের শাসনামলে জনগণের মাঝে আরাম বলতে কোনো কিছু ছিল না। বিদেশ থেকে প্রচুর সাহায্য-সহযোগিতা এসেছে, তা 'চাটার দল' চেটে নিয়েছে, চাটার দলের বাইরের জনগণ তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষ-মহামারী মুজিব সরকারের আমলে জন-জীবনের সঙ্গী হিসেবে বিরাজ করত। তলাবিহীন বাংলাদেশের কিছু অর্থ কয়েকজন নব্য পুঁজিবাদীদের হাতে এসে জমা হয়। এ দেশের দুর্ভিক্ষকে আরো বেশি ত্বরান্বিত করে পাকিস্তানের নির্যাতন ও সম্পদ পাচার এবং স্বাধীনতার পর অবস্থানরত ভারতীয় সেনাদের লুটপাট। ফলে অতিষ্ঠ জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা বদল করতে চাইল। তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বিরোধীদল শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি বা তাদের শক্তিশালী হয়ে উঠতে দেয়া হয়নি। আওয়ামী লীগের নমিনেশনের ব্যাপারেও তাজউদ্দীনবাদী ও মুজিববাদীদের মাঝে ১৯৭৩ সালের সংসদ নমিনেশন নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। তাজউদ্দীনের সমর্থকদের সংসদ নির্বাচনে নমিনেশন দেয়া হয় না এবং সর্বত্র দলীয় নেতৃত্ব থেকে দূরে রাখা হয়। তাজউদ্দীনের মতই সকলে মনঃকষ্টে জীবনযাপন করতে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ মেরুর মুজিব ভক্তদেরই সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করার চক্রান্ত চলে, রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি করে তাদের আবার রক্ষা করা হয়। প্রতিটি জেলা ও মহকুমায় তাদের কথা শুনতে রক্ষিবাহিনীর সদস্যদের বলে দেয়া হয়। একই দলের ভিতরে থেকেও তাই এসব আওয়ামী লীগের সদস্য তাদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন; অথচ তাঁরাই যে ভাষা আন্দোলন ও '৫৪-এ যুক্তফ্রন্টের সময় অবদান রেখেছিলেন, সে কথা খেয়াল করা হয় না। সংশ্লিষ্ট নব্য আওয়ামী লীগাররাই মুজিব সভা গুলজার করে থাকেন। তদুপরি '৭১-এর মুজিব বাহিনীর নেতা-কর্মী দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে মুজিবপুষ্ট আওয়ামী লীগ। ফলে নিবেদিত প্রাণ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা, সংসদ ও প্রশাসনের নানা কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকার ফলে সমাজ জীবনে নেমে আসে হতাশা,

www.nagorikpathagar.org

অনাহার, মৃত্যু, হত্যা, রাহাজানি, ধর্ষণ ইত্যাদি— যা বর্তমানে শেখ হাসিনার শাসনামলেরও এক বীভৎস চিত্র। সে কারণে জোহরা তাজউদ্দীনকে আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকতে দেখি না, বর্তমান তরুণ আওয়ামী লীগারদেরও মুজিব কোটেড ভেজাল রাজনীতির ক্যাপসুল গেলানো হচ্ছে। ফলে তাদের দ্বারা দেশের উন্নয়ন আর কোনো দিনই সম্ভব হবে না এবং একজাতিতত্ত্বের ফর্মুলার বিষপানে সকলকে ভারতমুখী করে ছাড়বে। ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে এদেশকে যুক্ত করার এক অশুভ পাঁয়তারা এখন চলছে। মুজিবের বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ভারতে ট্রেনিংরত পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি, শেখ হাসিনাকে মুখ্যমন্ত্রী বলে সম্ভাষণ, করিডোর প্রদানের পাঁয়তারা, আসামের ৭টি প্রদেশের বিরুদ্ধে অবস্থানের জন্য ভারতকে সহায়তাদানের ফলে সংশ্লিষ্ট সেভেন সিস্টারদের প্রকাশ্য শত্রু করে তোলা এবং এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করার পাঁয়তারা আমাদের দেশকে তারা কোন্ হাটে যে বিকাতে চায় তা জনগণ জানে এবং জানে বলেই এ আশঙ্কা। আর সে কারণে ভাসানী বলেন, "নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকারকে উৎখাত করতে হবে। ভাসানী সাহেব নির্বাচনের আগে ('৭৩-এর নির্বাচন) সরকারের পদত্যাগ দাবী করেছিলেন।" এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য তখন আওয়ামী লীগ সরকারকে অস্থায়ী সরকার গঠনের কথাও বলেছিলেন। কিন্তু মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার কোনো কথা শোনেনি। তাঁরা তখন নির্বাচনের মাধ্যমে একদল বাকশালের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পাঁয়তারা করছেন এ কারণে মুজিবের লোকদেরই শুধু সংসদ নির্বাচনে নমিনেশন প্রদান করা হয়, বিপরীতধর্মী আওয়ামী লীগকে সরিয়ে রাখা হয়। মহকুমা, জেলা ও কেন্দ্রে তাঁর মতের অনুসারীদের নেতৃত্ব দান করা হয় এবং নির্বাচনে বাকশাল বিল ১৫ মিনিটের মধ্যে পাসের জন্য ভক্তদের সাংসদ করে সে আইন পাসের জন্য প্রস্তুত রাখা হয় এবং সে কারণে শক্তিশালী বিরোধী দল তৈরি করতে দেয়া হয় না এবং জাসদকে নানাভাবে দমন করা হয়। অবশ্য জাসদের অনেকেই বর্তমানে তাঁদের স্বার্থের প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে মিশে গেছেন বা যুক্ত থেকে প্রভূত ফায়দা লুটছেন— এ কথা আমরা জানি।

এই হচ্ছে মুজিববাদী আওয়ামী লীগের এক ভাষাচিত্র, যা দেশের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনেনি। স্বাধীনতার দু-এক (১৯৪৭-এর স্বাধীনতা) বছর পূর্ব হতে (ইংরেজ আমলের) মুজিবের মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছুই মুজিবের অবদান এবং মুজিবের স্বপ্নের ফসল বলে মিথ্যাচারের ফোয়ারা ছুটিয়ে সকলের ঐতিহাসিক জয়ের জয়মাল্য, শুধু গায়ের জোরে, শেখ হাসিনা তাঁর পিতা মুজিবের গলায় পরিয়ে দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চান। অথচ সেগুলো তাঁর চেয়ে অনেক বড় বড় নেতাদের অবদান। মুক্তিযুদ্ধে না থেকেও বরং বিরোধিতা করেও কেউ মুক্তিযোদ্ধা সাজেন ও জাতীয় নেতা ভাসানী, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দীসহ ডজন ডজন অগ্রগামী জাতীয় নেতাকে বাদ দিয়ে একমাত্র মুজিবকে জাতীয় নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সোচ্চার হন; বাকশাল সৃষ্টিকারী মুজিবকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের স্রষ্টা বলতে তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করেন না কেউ। এসব কিছু না করেও তাঁরাই সব ভাল কাজ করেছেন বলে জাহির করেন। পরিশেষে দুঃখজনকভাবে জুনিয়র মিলিটারী অফিসারদের ক্যুর মাধ্যমে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। এত বড় শক্তিশালী একজন শাসককে এমনি পরিণতি ভোগ করতে হয়। এটি নিঃসন্দেহে

www.nagorikpathagar.org

দুঃখজনক। এরপরেই বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবেশ সৃষ্টি হয় বাকশাল উচ্ছেদের মাধ্যমে এবং স্বাধীনতার ঘোষক, সফল মুক্তিযোদ্ধা, জেড-ফোর্সের অধিনায়ক জিয়াউর রহমান এদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন।

১৫ আগস্ট ৭৫ শেখ মুজিবকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করার পর খন্দকার মোশতাককে বাংলার মসনদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত করা হয় এবং মোশতাক মুজিব মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মোশতাকও মুজিব মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তাজউদ্দীন, ক্যাপটেন মনসুর, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও কামরুজ্জামান হেনা এ মন্ত্রিসভার সদস্য হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এ চারজনই ছিলেন প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রী। এঁদের জেলে বন্দী করা হয় এবং নির্মমভাবে ২রা নভেম্বর রাতে হত্যা করা হয়। এ ক্ষতি আর কোনো কিছু দিয়েই পূরণ করা যাবে না। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জিয়াকে ২রা নভেম্বর সহসা বন্দী করেন বাংলার মসনদ দখলকারী খালেদ মোশাররফ। তাঁকে নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়িয়ে আছে, কেউ বলেন ; ভারতের ইঙ্গিতে ও র'-এর নির্দেশে এ বিপ্লব ঘটানো হয়েছে। কেউ বলেন: মুজিবের সমর্থনপুষ্ট কারো কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এ বিপ্লব সংঘটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ সদস্যগণই রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন বলে মোশতাককে খালেদ ক্ষমতায় রেখে দেন। জিয়া বন্দী জীবনযাপন করতে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতার ঘোষক এবং মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব পালনকারী জাতীয় নেতাকে রক্ষার প্রয়োজনেই সিপাহী-জনতা প্রতি বিপ্লবের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফকে পদচ্যুত ও হত্যা করেন। অতঃপর তাঁরা জিয়াউর রহমানকে পুনরায় সেনাবাহিনীর প্রধান করে তাঁর উপর দেশের শাসনভার ন্যস্ত করেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় বাকশালী শাসনের পর বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি ফ্রান্সের দ্যগলের মত এ দায়িত্ব পালন করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লে: কর্ণেল দ্যগল যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, জিয়াও এদেশের জাতীয় রাজনীতি ও স্বাধীনতা লগ্নে সেই দায়িত্ব পালন করেন। দ্যগল ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপকে জার্মানীর নাৎসী বাহিনী থেকে রক্ষা করার জন্য নির্ভীক হৃদয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যান। মেজর জিয়াও তাঁর মত একাত্তরের মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সিপাহী-জনতা ৭ই নভেম্বরের বিপ্লবের মাধ্যমে পরদেশের ইঙ্গিতবাহী খালেদ মোশাররফকে সরিয়ে দিয়ে জিয়াউর রহমানকে এ দেশের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। সেজন্য দ্যগলের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের সঙ্গে জিয়ার চরিত্রের অনেক মিলই খুঁজে পাওয়া যায়। দেশের স্বাধীনতা, দেশ রক্ষা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা ও দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে ভূমিকা জিয়া পালন করেন, তা-ই তাঁকে অবিস্মরণীয় ও কালজয়ী করে রাখবে; বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং এ দেশের উন্নয়নের ইতিহাসে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে ইতিহাসে। এজন্য দ্যগলের জীবনের সঙ্গে জিয়ার সামঞ্জস্য খুঁজে পাই। এ সম্পর্কে এখানে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হল।

ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় ১৯৩৯ সালের ১৪ মে ফ্রান্স ও প্যারিসের পতন ঘটে হিটলারের নাৎসী বাহিনীর হাতে। ১৬ মে হিটলার প্যারিসের রাস্তায় হাঁটেন। ফ্রান্সের জেনারেল চার্লস দ্যগল এসময় ছিলেন এক অখ্যাত কর্ণেল। তিনি হিটলারের এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে রেডিও ভাষণ দেন।

www.nagorikpathagar.org

১৯৩৯ সালে ১৮ মে বিবিসি রেডিওর মাধ্যমে চার্লস দ্যগল ফরাসী জাতি ও সারা বিশ্ববাসীর প্রতি জার্মানীর নাৎসীবাদ ও হিটলারের বিরুদ্ধে 'ওয়ার অব রেজিস্ট্যান্স' ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে ভাষণ দেন। সেদিন থেকে সারা বিশ্ব ও ফরাসী জাতির কাছে চার্লস দ্যগল একটি অবিস্মরণীয় নামে পরিচিত হয়ে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি কর্ণেল থেকে জেনারেল হোন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চতুর্থ রিপাবলিক (সংবিধান) প্রতিষ্ঠিত হবার পর ফ্রান্সে কোনো সরকারই দীর্ঘদিন থাকতে পারেনি। এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে চার্লস দ্যগল জনগণ ও সংসদের আহ্বানে ফ্রান্সের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পঞ্চম রিপাবলিকের (সংবিধান) তিনিই হলেন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। এরপর থেকে ফ্রান্স সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ফ্রান্সে একটি স্থিতিশীল ধারাবাহিক সরকার পরিবর্তনের সূচনা ঘটে।

জেনারেল জিয়াউর রহমানও বাংলাদেশের রাজনীতিতে চার্লস দ্যগলের মতোই আবির্ভূত হন। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ অখ্যাত এক মেজর হিসেবে জিয়া রেডিওতে স্বাধীনতা ঘোষণা দানের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে পরিচিত হন। '৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিজয়ীবীরের মতো জনগণের সরকারের ও রাষ্ট্রের প্রধান হন। এটাও ঘটেছিল পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে। যেমন দ্যগলের সময়ও পঞ্চম রিপাবলিকের মাধ্যমে (সংবিধান মাধ্যমে) দ্যগল পঞ্চম রিপাবলিকের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান হওয়ার পর (লন্ডনের বিবিসি থেকে ফ্যাসিবাদীর বিরুদ্ধে আহ্বান দেয়া সত্ত্বেও) তার মুখ্য ভূমিকাই ছিল বৃটেনকে ইউরোপের কমন মার্কেটে ঢুকতে না দেয়া। ইতিহাসের কি অমোঘ বিধান যে, স্বাধীনতার পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে তাঁর অন্যতম লক্ষ্যই ছিল ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরোধিতা করা। [একজন প্রেসিডেন্ট – সৈয়দ আবদাল আহমদ] ঃ

এখানে ৭ই নভেম্বরের প্রেক্ষাপটে খন্দকার আব্দুর রহিমের লেখা ভাসানীর জীবনী গ্রন্থ হতে কিছু অংশ তুলে ধরে তৎকালীন সময়ের একটি ইতিহাস এখানে তুলে ধরতে চাই। তৎপূর্বে আমরা '৭৫-এর আগস্টের একটি ভাষাচিত্র ও ৭ নভেম্বর ঘটনাবলীর আলোকে একটি প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করব। ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার সম্মিলিত সংগ্রামের মুখে বিদ্রোহী নেতা মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফের পতন ঘটে। অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই সামরিক সরকারের পতনের পর সিপাহী-জনতা জিয়ার হাতে দেশের ক্ষমতা তুলে দেয়। তিনি বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে প্রথমে প্রধান সামরিক অফিসার এবং পরবর্তীকালে দেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে সাংবিধানিক ক্যু'র মাধ্যমে মুজিব মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে, সংসদে কাউকে আলোচনার সুযোগ না দিয়ে, 'বাকশাল গঠন আইন' পাস করেন এবং গণতন্ত্রকে হত্যা ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাকশালের সদস্য হওয়ার আহ্বান জানান। ১৯৭৫-এর এ ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কুখ্যাত আইন হয়ে থাকবে। মুজিব বাকশাল প্রধান ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ও তাঁর উত্তরপুরুষদের এ পদে স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করলেন। বাকশাল বা একদলীয়

www.nagorikpathagar.org

সরকারপ্রধান মানুষের মৌলিক অধিকার, চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার হরণ করে। বিচার বিভাগের ক্ষমতা চরমভাবে খর্ব করা হয় এবং বিচারকের স্বাধীনতা লোপ করা হয়। ৪র্থ স্টেট হিসেবে পরিচিত দেশের (৪টি পত্র-পত্রিকা বাদে) সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয়া হয়। গণতন্ত্রকে রক্ষা ও দেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে স্বাধীনতা যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল, সেই স্বাধীনতার মৌল উপাদান গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়। মানুষ এর আওতায় অসহনীয় জীবনযাপন করতে থাকে। এ ব্যবস্থা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকে।

বাকশাল শাসনের আমলেই আগস্টে মুজিব ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করা হলে আওয়ামী লীগেরই মন্ত্রিসভার সদস্য খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রপতিত্বে তাঁদের দলীয় লোকদের নিয়ে আর একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তখনও জিয়া সামরিক বাহিনীর ডেপুটী প্রধান। কিন্তু জনগণের ইচ্ছার অনুকূলে অবশেষে জিয়া সামরিক বাহিনীর প্রধান হন। কিন্তু খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা দখলের পর ২রা নভেম্বর জিয়াকে বন্দী করে রাখেন। অতঃপর চার জাতীয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং হত্যাকারীদের বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। অবশেষে সিপাহী জনতার বিপ্লবের মুখে খালেদের পতনের পরে জিয়া মুক্ত হয়ে পূর্ব পদে বহাল হন। এখানে 'বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ (সম্পাদক : প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন) 'গ্রন্থের ভূমিকা হতে কিছু অংশ তুলে দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করব। "বাংলাদেশে রাজনীতি ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব অনেকটা বৈপ্লবিক। এটি দুই অর্থেই প্রযোজ্য। এক, তিনি ১৯৭৫ সালের ৭-ই নভেম্বরে সিপাহী জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রে সামরিক অভ্যুত্থান ও প্রতি অভ্যুত্থানের ফলে সৃষ্ট ক্ষমতার শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে। কোনো সামরিক অভ্যুত্থান অথবা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অথবা কোনো পূর্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাসীন হননি। জাতীয় পর্যায়ে ৭ই নভেম্বরের বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাসীন হন।"

দেশ স্বাধীন হয়েছে কিনা তাও মুজিব জানতেন না। হঠাৎ পাকিস্তান থেকে আসার পর তাজউদ্দীন যখন স্ব-ইচ্ছায় তাঁর হাতে ক্ষমতা তুলে দেন, তখন তিনি কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সেকারণে তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান হিসেবে, কখনও প্রধানমন্ত্রী সম্মানের উচ্চ আসনে বসার জন্য, কখনওবা রাষ্ট্রপতি হয়ে চলেছেন। শেষপর্যন্ত ক্ষমতাভিলাষী মুজিব দুই ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে বাকশাল গঠনের মাধ্যমে সকল ক্ষমতার মধ্যমণি রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করলেন। তাঁর পার্শ্বচর ও মোসাহেবের দল দুধ দুইয়ে নেয়ার জন্য শ্লোগান দিল একনেতা একদেশ— শেখ মুজিবের বাংলাদেশ। সকল স্তরের লোকজন তা শুনে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সকলে বলতে লাগল : সকল জয়কে ছিনতাই করে ও তাঁর তৃপ্তি হচ্ছে না কেন— আসলে তিনি কি চান? জোর করে তিনি যে জয়ের মুকুট মাথায় পড়লেন, জয়ের মালা গলায় দিলেন, তা কিন্তু কয়েক মাসও টিকল না। শেষ হয়ে গেল সব। ইতিহাসের পাতায় ম্লান হয়ে রইলেন জাতীয় নেতা শেখ মুজিব।

মুজিবের ঈর্ষাকাতর মনকে বিশ্লেষণ করার জন্য কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। তাজউদ্দীন বলেন : শেখ মুজিব ফিরে এসে দেশের স্বাধীনতা দেখে আনন্দে

www.nagorikpathagar.org

উদ্বেল হবেন, বুকে জড়িয়ে ধরবেন জিয়া ও তাজউদ্দীনকে, ওসমানীকে ধন্যবাদ দেবেন, ভাসানীর পায়ে কদমবুচি করে বলবেন আপনি থাকার জন্যই এসব সম্ভব হল। তিনি এসবের কিছুই করলেন না। এঁদের একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলেন না। মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেয়ার জন্য মুজিবের কথা মত যে দিন ধার্য করা হল সে আয়োজনেও তিনি গেলেন না। জিয়া-তাজউদ্দীন তাকে মুক্তিযুদ্ধের আনন্দের কথা, বেদনার কথা, জীবনের কথা, যুদ্ধের কথা শোনাতে চেয়েছিলেন— তা তিনি শুনলেন না তাদের নিকট থেকে। যেখানে ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল, প্রবাসী সরকার, প্রথম স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছিল, নাম রাখা হয়েছিল তাঁরই সম্মানে মুজিবনগর। সেখানে তিনি কোনোদিনই গেলেন না। সব জয় ছিনতাই করেও জয়ের মাল্য গলায় নিয়ে যেতে পারলেন না তিনি। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কার্যক্রমের বিশ্লেষণে দেখা যায় : তিনি অনেক পিছিয়ে রইলেন, তবু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এড়িয়ে তাঁকে যে খানিকটা সম্মানিত করা হত, হাসিনার স্বপ্নের পিতাকে পুনরায় সকল ক্রিয়াকর্মের মধ্যমণি করে উপস্থাপনের মিথ্যা চেষ্টার ফলে তাঁকে নিয়ে (মুজিবকে নিয়ে) যে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে, তাতে হয়ত কোনোটাতেই ধোপে টিকবেন না। আর পাঁচজন কর্মীর ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকেও থাকতে হবে। কোনো জয় ছিনিয়ে নেয়া যায় না। তাই জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে, '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে. তাই তিনি পিছনে পড়েই রইলেন। জাগ্রত জিয়া স্বাভাবিক নিয়মে ইতিহাসের পথ ধরেই জয়ের মালা গলায় পড়ে চলেছেন। কেউ তাঁকে জোর করে গলায় মালা পড়াতে চাননি। রাজনৈতিক নেতা না হয়েও একাত্তরের অবদানের জন্য জাতীয় চেতনা সৃষ্টির আঁচ লেগেছে আমাদের মাঝে। তাঁর প্রেরণায় তিনিই জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। জিয়াকে ৭ই নভেম্বরে আর একটি জয়মাল্য পরিয়ে দেয়া হয়। সেদিনটিকে সকলে 'সংহতি দিবস' হিসেবে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করে আসছে এদেশের জনগণ। "শহীদ জিয়া স্মরণে" প্রবন্ধের লেখক লে: জেনারেল (অব:) মাহবুবুর রহমান যেসব কথা বলেছেন তা ইতিহাসখ্যাত। আমি তার অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরছি।

ঃ সৈনিক জিয়া সম্বন্ধে দুটো কথা বলার পরে আমি আরো বড় পরিসরে রাষ্ট্রনায়ক জিয়া সম্পর্কে বলতে চাই। এখানে বাংলাদেশের ইতিহাসের দুই অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটে জিয়াকে বিশ্লেষণ করতে চাই। প্রাক '৭৫ এবং '৭৫-উত্তর। বিশেষ করে ৭-ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানকে জাতীয় ইতিহাসের এক water-shed তথা জল বিভাজিকারূপে গণ্য করে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় : প্রাক্ '৭৫-এর সরকারের যেখানে ব্যর্থতা, '৭৫ উত্তর জিয়ার সেখানেই সার্থকতা। প্রাক '৭৫-এর আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ৪র্থ সংশোধনী, যা আমাদের সংবিধানকে চরমভাবে কলঙ্কিত করেছে। যে গণতন্ত্রের জন্য এ দীর্ঘ সংগ্রাম, এ মুক্তিযুদ্ধ, সেই গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করা হল। জিয়া '৭৫- উত্তরে বহুদলীয় গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। জিয়া ছিলেন সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, ধারক ও বাহক। তিনি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।

www.nagorikpathagar.org

প্রাক্ '৭৫-এ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের মূর্ত প্রতীক বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে অবহেলিত রাখা হয়েছিল। ছিল না সাংগঠনিক কাঠামো। তারই সমান্তরালে একটি আধাসামরিক বাহিনীকে অত্যন্ত ক্ষমতাধর করা হয়েছিল। তার ছিল উচ্চমানের অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন, পোশাক-আশাক, বাসস্থান ও রসদের ব্যবস্থা। '৭৫-উত্তর জিয়া সশস্ত্র বাহিনীকে তার যথাযথ মর্যাদায় সমাসীন করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে সম্প্রসারিত করেন, সুসংগঠিত করেন। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করেন, সুশিক্ষিত করেন এবং সবচেয়ে বড় কথা সেনাবাহিনীর হারানো গৌরব (Pride)-কে ফিরিয়ে দেন। তার পাশাপাশি তিনি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একটি বৈপ্লবিক চেতনার সৃষ্টি করেন। তিনি লক্ষ্য করলেন : দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও বহিঃশক্তির আগ্রাসন নস্যাৎ করতে প্রয়োজন সামরিক বাহিনী ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, যেমনটা হয়েছিল '৭১-এ। তিনি এই বৈপ্লবিক চেতনায় আনসার ও ভিডিপি প্রতিষ্ঠা করে গ্রামে-গঞ্জে ব্যাপকভাবে তাদেরকে অস্ত্রপরিচালনায় প্রশিক্ষিত করেন এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। একই লক্ষ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ ক্যাডেট কোর।

প্রাক্ '৭৫ জাতি তার জাতিসত্তা ও সত্যিকার জাতীয় পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তিতে ভুগেছে। সেখানে সঠিক দিকনির্দেশনার অভাব ছিল। বাস্তবের সাথে ছিল সমন্বয়হীনতা। '৭৫-উত্তর জিয়া জাতিকে তার সত্যিকার পরিচয়ে পরিচিত করালেন বিশ্ব দরবারে। দেশবাসীকে দিলেন জাতির মহান মর্যাদা। জাতীয়তাবাদের মহান আদর্শে দীক্ষিত জিয়া গণমানুষকে নতুন করে বাংলাদেশকে ভালবাসতে শেখালেন। গর্ববোধ করতে শেখালেন। বাংলাদেশের মানুষ ও মাটির মিশ্রিত রসায়নে যে সংস্কৃতি, যে কৃষ্টি, যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে কয়েক শ বছর ধরে, তাকে অবলম্বন করলেন। জিয়া জাতীয়তাবাদী দর্শনের রূপকার এবং এই অনবদ্য অনন্য, অকৃত্রিম, অপরূপ রূপকে তিনি বাংলাদেশের অতিবিস্তৃত ক্যানভাসে অঙ্কন করলেন। ঃ

কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার স্থপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকারী জিয়ার আজও সঠিক মূল্যায়ন হয়নি, হয়ত ভুলো জাতি স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী বেগম জিয়াকেও সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবে না; জয়ের মালা লুণ্ঠনকারী দল জনগণকে বিভ্রান্ত করবে। সে কারণে আমি আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতা দিয়ে লেখনীর মাধমে তাঁদের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছি। সে কারণে বলতে হয়, "দেশ শত্রুমুক্ত হবার পর তিনি তাঁর যোগ্য সরকারী স্বীকৃতি পাননি ..... পরিকল্পিতভাবে তাঁকে হেয় ও কোণঠাসা করা হয়েছিল। আমাদেরকেও কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল—সে বেদনা সহ্য হলেও স্বাধীনতার প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষক জিয়ার প্রতি এ অবহেলা জাতীয় জীবনে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। তিনি সেনাদের মধ্যে সিনিয়র ও যোগ্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সেনাবাহিনী প্রধান করা হয়নি।" এসবই হীন মানসিকতার প্রতিফলন অন্য কোনোভাবে একে দেখা যায় না।

'৭৫-এর ২-রা নভেম্বর খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান ও ক্ষমতা দখল এবং ৩-রা নভেম্বরের বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে মনে হয় : তাঁরা বাকশাল রূপ মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা ও ভারতের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ বিদ্রোহ করেন। ম্যাসকারেনহাস-এর মতে,

www.nagorikpathagar.org

"মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এই অভ্যুত্থানের (৩-রা নভেম্বর) সূচনা হয় বলে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা মানেই তার বাকশাল প্রতিষ্ঠা। ফলে প্রতি বিপ্লবের মাধ্যমে বাকশালরূপ মুজিববাদকে প্রতিহত করা হয় এবং সে কারণে ৭-ই নভেম্বর 'সংহতি দিবস' নামে খ্যাত।

খালেদের বিদ্রোহ ও সিপাহী জনতার প্রতি বিপ্লবের সময়ে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে।

১। ২-রা নভেম্বর রাতে খালেদ মোশাররফ বিদ্রোহের মাধ্যমে এদেশের ক্ষমতা দখল করেন।

২। এ রাতেই জিয়াকে বন্দী করা হয় এবং তাঁকে সামরিক বাহিনী প্রধান পদ থেকে অপসারিত করা হয়।

৩। খালেদের মা মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য মিছিল করেন ও শ্লোগান দেন।

৪। র'-এর তৎপরতা শুরু ও খালেদ মোশাররফকে সমর্থন করে ভারতীয় পত্রিকায় বড় আকারে খবর বের হয়।

৫। ২-রা নভেম্বরের রাতেই চার জাতীয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং ৩-রা নভেম্বর পর্যন্ত তাদের মৃতদেহ জেলে পড়ে থাকে।

৬। বিচারপতি সায়েমকে প্রেসিডেন্ট ও সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়।

৭। শোনা যায় : খালেদ মোশাররফ জেল হত্যাকারীদের দেশের বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন (এ নিয়ে আরো অনুসন্ধান দরকার)।

৮। ৭-ই নভেম্বরে ('৭৫ সাল) সিপাহী-জনতা প্রতি বিপ্লবের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফকে উৎখাত করে।

৯। সিপাহী-জনতা মিলিতভাবে জিয়াকে মুক্ত করে এবং পুনঃ সামরিক বাহিনীর প্রধান (চীফ অব স্টাফ) পদে অধিষ্ঠিত করেন।

১০। খালেদ মোশাররফের সামরিক আইন জারীর ধারাবাহিকতায় জিয়া পরবর্তীকালে নিয়মতান্ত্রিক পথে সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন।

১১। জিয়া অতঃপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং পরে রাষ্ট্রপতির আসনে নির্বাচিত হয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

১২। দীর্ঘ ২ বছর পর ১৯৭৭ সালের ২০-শে এপ্রিল জিয়া দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ প্রাপ্ত হন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন : সামরিক শাসনের আওতায় থেকে বিচারপতি সায়েম বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন। ফলে জিয়াকে সে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হয়।

'৭৫-এর ৭-ই নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহের আলোকে বলা যায় : "১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার সময় বাংলাদেশের মানুষ তাকে আপনজন হিসেবে নিজেদের পাশে পেয়ে আশা ও ভরসা করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ৭-ই নভেম্বরে তাঁরা জিয়াকে সামনে নিয়ে আসেন। তাঁদের আশা ছিল : যে বীর সেনানী এককভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধ করে দেশকে মুক্ত করেছিল, সেই

www.nagorikpathagar.org

পারবে স্বাধীন বাংলাদেশকে রক্ষা করতে। সেভাবেই বাংলাদেশের মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতার কাছাকাছি নিয়ে আসে জিয়াউর রহমানকে। আর জিয়াউর রহমানও যে স্বপ্ন নিয়ে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ পেলেন।"

'শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী' গ্রন্থে অধ্যক্ষ খন্দকার আবদুর রহিম বলেন : "১৯৭৫-এর ১৫-ই আগস্টের পর প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক এবং সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের পদক্ষেপগুলো ছিল রুশ-ভারতের তাবেদারী মনোভাব ঝেঁটিয়ে ফেলার জন্য আপোষহীন। সে জন্য মওলানা ভাসানী তাদের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ১৯৭৫-এর ৭-ই নভেম্বরের পরে বাংলাদেশে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে পূর্ণক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেখে মওলানা যথেষ্ট আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। সেসময় তিনি তাঁর এক বিবৃতির মাধ্যমে জিয়া-সরকারকে দেশপ্রেমিক সরকার হিসাবে আখ্যা দিয়ে সকল স্তরের জনগণকে সহযোগিতা দানের আহ্বান জানিয়েছিলেন।"

'৭৫ সাল ঘটনাবহুল বছর। এ বছরই ২৫ জানুয়ারি সাংবিধানিক ক্যু-এর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে কোনো আলোচনা ব্যতীত ১৫ মিনিটের সংসদ অধিবেশনে সকল দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাকশাল বা একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাকশাল সরকারের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন রাষ্ট্রপতি মুজিব। এ বছরের ১৫ আগস্ট মিলিটারী ক্যুর মাধ্যমে মুজিবসহ পরিবারের অনেক সদস্য নিহত হন, নিকট আত্মীয় পরিজনও মৃত্যুবরণ করেন। একই বছর ২-রা নভেম্বর দিবাগত রাতে খালেদ মোশাররফ একটি সামরিক বিদ্রোহের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং জিয়াউর রহমানকে বন্দী করেন ও তাঁর সামরিক বাহিনী প্রধানের পদটি থেকে তাঁকে সরিয়ে দেন। একই রাতে প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রীদ্বয় ক্যাপটেন মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান— এই চার জাতীয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ৭-ই নভেম্বরে সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে জিয়াকে মুক্ত করা হয় এবং সামরিক বাহিনী প্রধান হিসেবে তাঁকে পুনঃনিয়োগ দেয়া হয় এবং এখান থেকেই বহুদলীয় গণতন্ত্রের শুভ সূচনা হয়।

ইতোপূর্বে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক পাক-ভারতের স্বনামখ্যাত বর্ষীয়ান নেতা ভাসানীকে শেখ মুজিব বন্দী করেন এ সংবাদ ১৯৭৪ সালের ৪-ঠা জুলাইয়ের দৈনিক পত্রিকাগুলোয় প্রকাশ পায়। তা নিম্নরূপ 'আমি নজরবন্দী। শুধু ভেনু চেঞ্জ করা হয়েছে।' শেখ মুজিবের স্বরাষ্টমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী মানুষের মনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য বলেন, "মওলানার নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী রাখা হয়েছে।"

ভাসানী মুজিবের সমালোচনা করে হক কথা বলেন ও ভারত সম্পর্কে যা সত্য সে কথা বলেন বলে ভারতের "যুগান্তর" ও "আনন্দবাজার" পত্রিকাতে তাঁকে (ভাসানীকে) শয়তান, বেঈমান, ধূর্ত ঠগবাজ, ধুরন্ধর, পাগল, নিমকহারাম ইত্যাদি ভাষায় গালাগাল করা হয়। তাঁকে নিয়ে ভারতে আটটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়। ঢাকার বেশ কয়টি দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার কড়া জবাব দেয়া হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের 'ঘরেবাইরে' উপসম্পাদকীয় স্তম্ভে বিশিষ্ট কলামিস্ট 'সন্ধানী' লেখেন,

www.nagorikpathagar.org

"অধুনা আনন্দবাজার ও যুগান্তর যেভাবে মওলানা ভাসানীর ঠ্যাং কামড়াকামড়ি শুরু করেছে। সত্যি বলতে কি, ত্রিশোত্তর জীবনে কোনোদিন তা দেখিনি। তাই বিষয়টি যুগপৎ বিস্মিত ও মর্মাহত করেছে। আনন্দবাজার যা করেছে তা আলোচনার নয়, শুধু গালাগালি। এবং সেই সাথে উপদেশচ্ছলে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামী ইতিহাসকে বিকৃত করা ও সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়ার মত কাজ। আমরা জানি— স্বার্থে টান পড়লেই মানুষ ক্ষিপ্ত হয় বেশি।"

বাকশাল সৃষ্টির প্রস্তুতিলগ্নে মওলানা ভাসানীকে দেশ থেকে বিতাড়নের ষড়যন্ত্র করা হয়। আওয়ামী সমর্থনপুষ্ট মণিসিংহ এক "গণজমায়েতে মওলানা ভাসানীকে চিরদিনের জন্য বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করে টুকরো টুকরো করার হুমকি দিয়েছিলেন।" অথচ মুজিব, মোজাফফর, মণিসিংহ তিনজনই এককালে ভাসানীর বশংবদ শিষ্য ছিলেন।

এখানে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী অপকীর্তির এক চিত্র তুলে ধরা হল। ভাসানীর প্রচারপত্রের শিরোনাম ছিল : আওয়ামী লীগের ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সতর্ক হও।

১। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলা হইলেও, ভোলার তিনটি আসনে প্রার্থী ডা. আজাহারকে বলপূর্বক মনোয়নপত্র জমা দিতে দেয়া হয় নাই, অথচ রেডিও, পত্রিকায় ঘোষণা করা হইতেছে যে প্রধানমন্ত্রী ও তাহার দলের লোকেরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

২। ভোলার অপর আসনে ন্যাপ প্রার্থী আবু মোহাম্মদ নূরুল্লার কাগজপত্র ছিনাইয়া লইয়া তাঁহাকে মনোনয়ন প্রত্যাহারের চাপ দেওয়া হইয়াছে। তিনি উহা অস্বীকার করিয়া বরিশালে পালাইয়া আসিলে বরিশালেও তাঁহাকে গুম করার চেষ্টা করা হয়।

৩। ফরিদপুর নগরকান্দি আসনে ন্যাপ প্রার্থীকে বলপূর্বক আটকাইয়া রাখিয়া আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

৪। যশোরে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত মন্ত্রী সোহরাব হোসেনের বিরুদ্ধে ন্যাপ প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে দেয়া হয় নাই। ঢাকায় মুন্সীগঞ্জেও অনুরূপ ঘটিয়াছে।

৫। সর্বত্র ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধী প্রার্থীদের নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য অস্ত্রের মুখে জীবন নাশের ভয় দেখানো, এমনকি গ্রেফতার করা হইয়াছে।

৬। বিরোধী দলের কর্মী ও সাধারণ ভোটারদের কলাবরেটর আইন ও ডাকাতির মামলায় জড়িত করার জন্য অস্ত্র লইয়া হামলা, গুম ও খুন করার ভয় দেখানো হইয়াছে। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের এই হল চালচিত্র।

'হক কথা' পত্রিকায় রুশ-ভারতীয় চক্রান্ত শিরোনামের সংবাদে দেখি, "ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করে চলেছে তাতে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। মুজিব সরকারের প্রতি ইন্দিরা চক্রের নির্দেশ বলবৎ হয়েছে বাংলাদেশের জন্য পৃথক কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখা যাবে না।"

হক কথার সম্পাদক এরফান সাহেবকে মুজিব সরকার গ্রেপ্তার করার পর, ভাসানী হক কথার অস্থায়ী সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালে, একটি চুক্তি সম্পর্কিত প্রতিবেদনে

www.nagorikpathagar.org

বলা হয়, "'বাংলাদেশে ভারত ইচ্ছামত তার পছন্দসই লোক দিয়ে পছন্দসই নেতৃত্ব পাঠিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করবে, যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধা সামরিক বলে পরিচিত হবে, কিন্তু এদেরকে গুরুত্বের দিক থেকে ও সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের মূল সামরিক বাহিনী থেকে বড় তাৎপর্যপূর্ণ করে রাখা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, এই বাহিনীটি হচ্ছে রক্ষী বাহিনী।"

'৭৫ সালের পর স্বাভাবিক নিয়মে জিয়ার উপর কিছু রাজনৈতিক দায়িত্ব এসে পড়ে এবং তিনি তা সততার সঙ্গে পালন করে যেতে থাকেন। অতঃপর সামরিক শাসনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে যা সায়েম সাহেবের রাষ্ট্রপতি দায়িত্বে থাকারই ধারাবাহিকতা। অতঃপর ১৯৭৭ সালে জিয়াকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রের পথে পা বাড়ান। তিনি স্ব-ইচ্ছায় কোনো দিন ক্ষমতায় আসেননি, ঘটনা ও সময়ের প্রয়োজনে সে দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়েছে এবং জিয়া তা যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছেন। কাজেই জিয়াউর রহমান, সময়ের ও জাতির প্রয়োজনে, জনসমর্থনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। এটি তাঁর নিজস্ব ইচ্ছায় নয়। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা মিটানোর প্রয়োজনে জনতা তাঁকে এ দায়িত্ব অর্পণ করে। 'বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ' গ্রন্থে বলা হয়েছে শেখ মুজিব নিজেই শক্তিশালী সামরিক বাহিনী চাননি, তারা রাষ্ট্রের বিধিমত চলবে, কারো আদেশে চলবে না, সেজন্য তিনি তাঁর নিজস্ব বাহিনী যা সামরিক বাহিনীর প্যারালাল বাহিনীরূপে চিহ্নিত, সেই রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি করেন। এটি একেবারে তাঁর নিজস্ব বাহিনী, এ বাহিনী তাঁর ও তাঁর অনুগত আওয়ামী লীগারদের হুকুমে পরিচালিত হবে, এ বাহিনী দেশের বহু লোক হত্যা করে তাঁদেরই নির্দেশে। মুজিব দেশের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মানসে এবং বাকশাল গঠন করার একান্ত অভিলাষে জাতীয় সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা খর্ব করে ব্যক্তিগত ও দলীয় বাহিনী রক্ষীবাহিনীকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন, যেন যে কোনো সময়ে দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লব প্রতিহত করা যায়। কিন্তু তিনি তা পারেননি, তাঁর রক্ষীবাহিনী দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে, তাঁর প্রিয় দল বাকশালকেও বাঁচাতে পারেননি তিনি। জিয়া সেকথা ভাল করেই জানতেন, সেজন্য তিনি কোনোদিনই তাঁর পেশীশক্তি প্রয়োগ করেননি শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য। জনগণই বাংলার প্রশাসনে তাঁকে বসিয়েছে। 'জিয়াউর রহমানের বৈদেশিক নীতি প্রবন্ধে' ড. তারেক শামসুর রহমান বলেন—

ঃ সামরিক ব্যক্তি জেনারেল জিয়া কোনো সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেননি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের তিন মাসের মধ্যে জেনারেল জিয়াকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। ৭-ই নভেম্বরের '৭৫ সিপাহী বিপ্লব জেনারেল জিয়াকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার কারণে ১৯৭৬ সালের ২৯-শে নভেম্বর জেনারেল জিয়া নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে উন্নতি করেন। পরে বিচারপতি সায়েম পদত্যাগ করলে জেনারেল জিয়া ১৯৭৭ সালের ২১-শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। ঃ

জিয়াউর রহমান শাসন ক্ষমতায় বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। যা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনিই বাকশাল পরবর্তীকালে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের ব্যবস্থা

www.nagorikpathagar.org

করে গণতন্ত্রকে সরকার পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানিক রূপদান করেন। জিয়ার এটি একটি মহৎ অবদান। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াই দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তনে, দেশের সার্বিক উন্নয়নে, ভারতের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পেরেছিলেন।

২২ এপ্রিল '৭৭, রেডিও ও টিভি ভাষণে জিয়া বলেন : "১৯৭৫ সালে ৭-নভেম্বর বিভিন্ন সময়ে দেশ ও জাতি আমার উপর বিভিন্ন দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। আমি আমার সাধ্যমত সে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়েছি এবং আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তি হিসেবে আপনাদের সমর্থনের উপরই নির্ভর করেছি। দেশ পরিচালনার ব্যাপারে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিষয়ে ইতিমধ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং আরো কতিপয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এখন আমার উপর দেশের রাষ্ট্রপতির গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ এবারও আমি আপনাদের সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করবো।"

জিয়াই এদেশের মর্মমূল থেকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে উদ্ধার ও উত্তোলন করে আমাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সম্পর্কে বেগম খালেদা জিয়া প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ' গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেন।

ঃ বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী প্রত্যয়কে প্রাণবন্ত করে জাতীয় জীবনে তার সার্থক বাস্তবায়নে যিনি সর্বাধিক গুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তিনিই আমাদের প্রিয় নেতা জিয়াউর রহমান। একজন সাচ্চা জাতীয়তাবাদী হিসেবে তিনি সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে রাজনীতিকে করেছেন জনকল্যাণমুখী এবং এই কল্যাণমুখী উদ্যোগে সকল নাগরিককে সংশ্লিষ্ট করেছেন। তাঁরই নেতৃত্বের পরশমণির স্পর্শে বাংলাদেশে রাজনীতি হয়ে ওঠে সৃজনমুখী, আত্মপ্রত্যয়ী এবং বলিষ্ঠ। ঃ

জাতীয়তাবাদী জিয়া বুঝেছিলেন বাংলাদেশে একাধিক জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান, সেকারণে সকলে বাঙালি হতে পারে না। তবে বাংলাদেশী হতে পারে অর্থাৎ বাংলাদেশ সব জাতিকে তার বুকে ধারণ করতে পারে, বাঙালি পারে না। সেজন্য দেশের মর্মমূল থেকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে তুলে এনে জিয়া তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন। ১৯৭২ সালের ৩১-শে অক্টোবরে মি: লারমা বাংলাদেশে গণপরিষদে বলেছিলেন, "আমি একজন চাকমা। একজন মারমা কখনো চাকমা হতে পারে না। একজন চাকমাও একজন বাঙালি হতে পারে না। আমি একজন চাকমা। আমি বাঙালি নই।" কিন্তু শেখ মুজিব সকলকে বাঙালি হয়ে যাওয়ার উপদেশ খয়রাত করেন এবং এখানেই সৃষ্টি হয় চরম জটিলতা। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধিকার আন্দোলন সেই বাঙালি হয়ে যাওয়ারই সৃষ্টি। বাংলাদেশে আদিকাল থেকে কয়েকটি জাতি বাস করত। কাজেই সেসময় থেকেই স্বদেশী জাতীয়তাবাদ এদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল এবং বর্তমানেও আছে। জিয়ার সেই জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে স্বীকৃত। কাজেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ শত শত বর্ষ পূর্বেই জাতির জীবনে অন্তর্নিহিত ছিল। এ সম্পর্কে জিয়াউর রহমান তাঁর 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধে বলেন, "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন শতশত বর্ষ ধরে এদেশের আপামর জনগণের অন্তরে চির

www.nagorikpathagar.org

জাগরূক রয়েছে। যুগযুগান্তরে দেশপ্রেমিকদের হৃদয়ের মর্মমূলে নিহিত তাদের সর্ব উৎসাহ, উদ্যোগ ও প্রেরণার উৎস এই দর্শন।"

৭ নভেম্বর '৭৫-এ বিদ্রোহের পক্ষে-বিপক্ষে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা জড়িত ছিলেন, তবে জিয়াউর রহমানের সংশ্লিষ্টতা ৭-ই নভেম্বর হতে, তৎপূর্বে নয়। এ তিনজন হলেন; জেনারেল জিয়া, জেনারেল খালেদ মোশাররফ, কর্ণেল আবু তাহের। "মুক্তিযুদ্ধের অগ্নি পরীক্ষায় তিনজনই সফলভাবে উত্তীর্ণ মুক্তিযোদ্ধা।" তার মধ্যে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাকারী। জিয়া ও খালেদ দু'জনই মুক্তিবাহিনীর (৩টি বিভাগে বিভক্ত করেছিলেন জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী) দুই বিভাগেরই অধিকর্তা উক্ত দু'জন। কর্ণেল তাহেরও বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর কমান্ডার। জিয়া বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ যা বাংলাদেশ দীর্ঘ শতাব্দী ধরে অঙ্গে ধারণ করে আছে। জিয়া সেই পরশমণির স্পর্শে স্বচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, নিজেদের ঠিকানা সম্পর্কে সজাগ করতে চেয়েছেন, রাষ্ট্রধর্মের আলোকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন এবং বাঙালি জাতীয় চেতনা যা রাষ্ট্রধর্মকে অতিক্রম করে সমাজ ধর্মে বিস্তৃতি ঘটেছে। যা স্বদেশীয় সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ, ভারতীয় অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষার সঙ্গে যা সম্পৃক্ততা দাবী করে। ফলে বৃহৎ শক্তিধর ভারত বাঙালি জাতীয়তার পথ ধরে এগিয়ে এসে আমাদের স্বাধীনতার রক্তঝরা ফসলকে বর্গীর মত খেয়ে ফেলতে পারে, তার হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন, 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের ঢাল দিয়ে এদেশের রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্বকে বাঁচাতে চেয়েছেন। চেয়েছেন বাংলাদেশকে বিশ্বসভার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে; চেয়েছেন বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রকে সার্বজনীন মর্যাদা দান করতে, সকলের মতামত প্রকাশের অধিকার, চলার অধিকার, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করতে। রাষ্ট্রের ও তৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহির্বিশ্বের সামাজিক শক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে গণমুখী করতে এবং এসব ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করতে চেয়েছেন জিয়া।

কর্ণেল তাহের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সেক্টর কমান্ডার। তিনি আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এদেশের এক কৃতী সন্তান। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আলোকে প্রশাসন ও দেশ পরিচালনায় বিশ্বাসী। জিয়ার উদার নৈতিক গণতন্ত্রকে 'বুর্জোয়া' গণতন্ত্র বলে তাঁরা ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাহের প্রতিরক্ষা বাহিনী, সামাজিক শক্তিগুলো ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে গণমুখী করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে চান। এদের 'উৎপাদনমুখী খাত হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন'। সেজন্য তাহের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পরিকল্পনার পটভূমিরূপে দেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট, সামরিক বিভাগে বহুসংখ্যক বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গড়ে তোলেন। স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক দল জাসদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

খালেদ মোশাররফ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং একটি বিভাগীয় প্রধান। এস ফোর্সের অধিনায়ক। স্বাধীনতার পর তিনি সামরিক বাহিনীতে চাকুরীরত ছিলেন। পরদেশের প্ররোচনায় সামরিক বিদ্রোহের মাধ্যমে কয়েক দিনের জন্য সামরিক সরকার কায়েম করেন এবং স্বাভাবিক নিয়মে সামরিক আইনের ধারাবাহিকতা থেকে মুক্তি পেতে তাকে প্রলম্বিত করার কারণে খুব তাড়াতাড়ি উঠিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। খালেদের বিদ্রোহ

www.nagorikpathagar.org

ও ক্ষমতা দখলকে উৎসাহিত করে ভারতের পত্রপত্রিকায় সংবাদ শিরোনাম, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও ফিচার লেখা হয়।

শেখ মুজিব নতজানু পররাষ্ট্রনীতি ও ভারতের সঙ্গে ২৫ বছরের গোপনচুক্তি এবং বাংলার মসনদে ও ক্ষমতার উচ্চশিখরে চিরস্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত থাকার মানসে মোসাহেব দলের পরামর্শে ও স্বচিন্তায় অভিষিক্ত সম্পূর্ণ অনুপযোগী সমাজতান্ত্রিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'বাকশাল' বা একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার কারণে এবং সকল দলমত পত্রপত্রিকা (৪টি বাদে) নিষিদ্ধ ও বিচারবিভাগকে তাঁর অধীনে আনার চেষ্টা করেন এবং তাকে কল্যাণমুখী না করে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। শোষণ ও শাসনে নিগৃহীত ও নির্যাতিত দেশে বিশফোঁড়ার মত বাকশাল সমস্ত দেশকে পচন ধরিয়ে দেয়—যা থেকে মুক্তির কোনো পথ খোলা ছিল না। এখানে না ছিল উদার বহুদলীয় গণতন্ত্র, না ছিল গণমুখী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেতনা। সেজন্য "মুক্তিযুদ্ধের আগুনে পোড়া দু'টি খাটি সোনা" জিয়াউর রহমান ও আবু তাহের মুজিবের বাকশালকে মেনে নিতে পারেননি। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সাংবিধানিক 'ক্যু'-এর মাধ্যমে 'বাকশাল'-এর বিপরীতে তাঁদের অবস্থান ছিল। কিন্তু ঘটনা রাজ্য শাসনের নীতি এবং বাংলাদেশ সরকারের দু'জন অনুগত কর্মচারী হিসেবে আইনের শাসন (তা অসহ্য হলেও) মেনে নিয়েছেন। অবশ্য আবু তাহেরের বিদ্রোহ চেতনা নানাভাবে তার প্রতিবাদে মুখর ছিল। জিয়াও তুষের আগুনের মত জ্বলছিলেন। তাই হঠাৎ করে খালেদ মোশাররফের আক্রমণে জিয়া বন্দী হলেও আবু তাহের এ বিদ্রোহকে মেনে নিতে পারেন নি। সে কারণে ৭৫-এর ৭-ই নভেম্বরে সিপাহী-জনতা সম্মিলিতভাবে বিপ্লব ও বিদ্রোহ করে খালেদ মোশাররফের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং মেজর জেনারেল জিয়াকে সামরিক বাহিনী প্রধান হিসেবে পুনঃ দায়িত্ব অর্পন করেন। জিয়া দেশ ও জাতির প্রয়োজনে সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিচারপতি সায়েমকে প্রেসিডেন্ট রেখেই তাকে সহযোগিতা করতে থাকেন জিয়া।

খালেদ মোশাররফও একজন খাটি কৃতি মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু তাঁর কোন রাজনৈতিক দর্শন ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। ২-রা নভেম্বর রাতে সামরিক বাহিনী প্রধান জিয়াকে বন্দী করে তিনি দ্বিতীয় বার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বঙ্গভবন ব্যতীত সকল স্থানের কর্তৃত্ব ও অবস্থান গ্রহণ করে নিজেকে মেজর জেনারেল পদে প্রতিষ্ঠিত করে সামরিক বাহিনী প্রধানরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তার অভ্যুত্থান ছিল বাকশালকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা এবং ভারতের ইঙ্গিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। অবশ্য মোশতাক সমর্থিত ও আওয়ামী সদস্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিষদ ও মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে তিনি মোশতাককে তখনও ক্ষমতায় রাখেন এবং সামরিক আইন জারী করেন। ২-রা নভেম্বর রাতে চার জাতীয় নেতাকে জেলে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মোশতাক রাষ্ট্রপতির পদ পরিত্যাগ করলে ৬-ই নভেম্বর বিচারপতি এস এম সায়েমকে প্রেসিডেন্ট করা হয়। "পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে তিনি মেজর হাফিজের মধ্যস্থতায় বঙ্গভবনে অবস্থানকারী ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ওই যোগাযোগের ফলে স্থির হয় যে ৪ নভেম্বর ওই সব 'অভ্যুত্থানকারী'-রা বাংলাদেশ বিমানের এক ফকার

www.nagorikpathagar.org

ফ্রেন্ডশীপ (Fokker friendship) বিমানের মাধ্যমে নিরাপদে দেশত্যাগ করবে এবং পরিবর্তে তারা অস্ত্রসমর্পণ করবে। ঘটনাক্রম এভাবেই অগ্রসর হয়।" আজকের কাগজ, ৭-ই নভেম্বর ১৯৯৮।

"৭-ই নভেম্বরের বিপ্লব এবং সংহতি দিবসে সিপাহী-জনতার যে বৈপ্লবিক উল্লাস দেখা যায়, তাও খালেদ মোশাররফের থিসিসকে ভুল প্রমাণ করে। তাঁর অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয় কর্ণেল তাহেরের নেতৃত্বে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাসমূহের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে। ৬-ই নভেম্বর থেকে বিপ্লবের এক কৌশল হিসেবে খালেদ মোশাররফকে চিহ্নিত করা হয় 'ভারতীয় এজেন্টরূপে' এবং 'দিল্লী-মস্কোর' আধিপত্যবাদী ক্ষমতাবলয়ের প্রতিনিধি রূপে। ৭-ই নভেম্বর তাই ঢাকায় নতুন নতুন শ্লোগান উচ্চারিত হতে থাকে। 'সিপাহী জনতা এক হও', 'সিপাহী বিপ্লব ঃ জিন্দাবাদ,' 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' শ্লোগানে সমগ্র ক্যান্টনমেন্ট এলাকা মুখরিত হতে থাকে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরে যাবার সময় খালেদ মোশাররফ সৈনিকদের হাতে নিহত হন। শাফায়াত জামিল আহত হন। এভাবে ৩-রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সমাপ্তি ঘটে।" আজকের কাগজ, ৭-ই নভেম্বর ১৯৯৮।

নিঃসন্দেহে ৭-ই নভেম্বর বিপ্লবের প্রধান ছিলেন কর্ণেল তাহের। তাঁর বিপ্লবী সংস্থা যা সামরিক বাহিনীতে ছিল, তা এবং জনগণের সহযোগিতা (যা জিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল)— এ সম্মিলিত বাহিনীই খালেদ মোশাররফের পতন ঘটায়। তাহের অবশ্য বাকশাল ব্যবস্থাকে সহ্য করতে পারতেন না। "সমগ্র জনতার মধ্যে আমি প্রকাশিত' শীর্ষক তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক বিবৃতির ২৯ পৃষ্ঠায় তিনি শেখ মুজিবের বাকশাল ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন, 'গণতন্ত্রকে নোংরাভাবে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। জনগণ হয়েছে পদদলিত এবং ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্র জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।" ৭-ই নভেম্বরের প্রতি বিপ্লবের আলোকে যে কথাগুলো এসে যায়, তা হল খালেদ মোশাররফ প্রকৃতপক্ষে তাহের সৃষ্ট সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী সংস্থাগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে রাজনৈতিক আওতার বাইরে সামরিক বাহিনীকে রেখে দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত রাখা, সামরিক বাহিনীতে পদমর্যাদা ঠিক রাখা এবং রক্ষীবাহিনীর মত জাসদ সৃষ্ট গণবাহিনীকে প্রতিহত করা। বিপ্লবী সংস্থা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল খালেদ মোশাররফ তা সুজনরে দেখেননি। পরিকল্পনাবিহীন এ বিদ্রোহ বিপ্লবে রূপ নিতে পারেনি। খালেদের আর একটি মারাত্মক ভুল হল : যে উদ্দেশে বিদ্রোহ তা পরিকল্পিত পথে অগ্রসর না করানো এবং যাঁকে শত্রু বলে মনে করেন না, হঠাৎ উচ্চাশার বশবর্তী হয়ে সেই জিয়াকে বন্দী করাও একটি ভুল পদক্ষেপ। কর্ণেল তাহের সিপাহী-জনতার সমন্বয়ে প্রতি বিপ্লবকে সার্থক করে তোলেন এবং জয়ী হন। জিয়াকে পুনরায় সামরিক বাহিনীর প্রধান করা হয়। এর ফলে ২টি প্রত্যক্ষ ফল আমাদের জাতীয় জীবনে সমাগত হয়। একে সুফলও বলা যায়।

১। কর্ণেল তাহের বিপ্লবের মাধ্যমে বিজয়ী হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজনৈতিক বিজয় অর্জিত হয় না। জাসদের গণবাহিনী ও সামরিক বাহিনীর অন্তর্গত তাহের সৃষ্ট বিপ্লবী সংস্থার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় এবং বাকশাল ও জাসদ রাজনৈতিকভাবে আর শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

২। এ বিপ্লবের ফলে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন। জাতীয় প্রয়োজনে তাঁকে রাজনৈতিক মঞ্চে আনা হয় এবং কর্ণেল আবু তাহেরের প্রতি বিপ্লব ও স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের প্রতি জনগণের আস্থা এ কাজ সহজ করে দেয়।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে রাজনৈতিক সংগ্রাম '৭১ সালে শুরু হয়, তাকে স্বাধীনতায় রূপ দেয়ার জন্য জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। কাজেই এ দেশে গণতন্ত্র বজায় রেখে গণতান্ত্রিক পথে দেশ শাসন করতে হবে। মুজিব বাকশাল গঠনের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেন আর জাসদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নির্ভেজাল গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত হয়। ৭-ই নভেম্বরের বিপ্লবের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পথ সুগম হয় এবং জিয়া বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আলোকে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। আর বেগম খালেদা গণতন্ত্রের রূপ পরিবর্তন করে মন্ত্রিসভাশাসিত গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। এ সবই জিয়া ও খালেদার অবদান—অন্য কারো নয়।

কাজেই ৭-ই নভেম্বর বিপ্লবের যে মাধ্যমে বিজয়, সিপাহী-জনতার 'সংহতির' মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পথে দেশের যে প্রতিষ্ঠা এবং জিয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্বে যার সফলতা অর্জন, এর শিকড় কিন্তু বহুদূর বিস্তৃত ছিল; বাকশালকে পেরিয়ে ১৯৭২ সাল থেকে তার সূচনা। শেখ মুজিবের দেশে প্রত্যাবর্তন ও ক্ষমতা গ্রহণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক মর্যাদাদান থেকে বিরত থাকা, তাজউদ্দীনকে মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ, জিয়াউর রহমানকে সামরিক বাহিনীর প্রধান পদে নিয়োগ দান না করা ইত্যাদি পর্যন্ত এ সংহতি দিবসের বিস্তৃতি। "দিনে দিনে" যে দেনা বেড়েছে তার ঋণশোধের পালা শুরু হয় ১৯৭৫ সালে। নানা কারণে এ বছর জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তলাবিহীন বাংলাদেশে '৭২ সালে চাটার দল সব চেটেপুটে শেষ করে দেয়। ফলে শুরু হয় অভাব, অনাহার, দুর্ভিক্ষ। এই অনাহারক্লিষ্ট ও মৃত্যুপথযাত্রী এ দেশবাসীর আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য শুরু হয় নির্যাতন, হত্যা, বন্দীত্ব, রক্ষীবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে বিরোধী পক্ষকে দমন করার কাজ। হত্যার মাধ্যমে নির্যাতনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মুজিব সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি যখন দেখলেন এ জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে, তখন সকলকে চিরকালের জন্য নিস্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে সৃষ্টি করেন কালো আইনে নির্মিত দল 'বাকশাল'। কাজেই স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের আগমন ও শাসন ক্ষমতাকে নিজের হাতে তুলে নেয়ার সময় থেকেই 'সংহতি'র প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তা ধীরে ধীরে পুষ্ট হতে থাকে। এখানে আর এক বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাজতান্ত্রিক আলোকে বিশ্বাসী কর্ণেল জিয়া উদ্দীন রচিত প্রবন্ধ, যা ১৯৭২ সালের ১২ আগস্ট Holiday পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি। সংহতি দিবসের প্রস্তুতি যে ১৯৭২ সালেই শুরু হয়েছিল, এ থেকে তা বোঝা যায়। তিনি বলেন, "স্বাধীনতা জনগণের জন্য এক যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। রাস্তায় দাঁড়ান, দেখবেন শুধু উদ্দেশ্যবিহীন, উদাসীন, নির্জীব মুখগুলো যেন কোনো রকমে জীবন-ধারণ করে চলেছে। সাধারণত মুক্তিযুদ্ধের পরে নতুন এক শক্তির জন্ম হয় এবং শূন্য থেকেই দেশ পুনর্গঠিত হয়। বাংলাদেশে কিন্তু ঠিক উল্টোটা ঘটেছে। সমগ্রদেশ হয় ভিক্ষায় রত, না হয় শোকগীতি গাইছে অথবা অসচেতনভাবে চীৎকার করছে।"

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের এই যে চিত্র, তার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য কথা আমার চোখে পড়েছে। (১) সাধারণত মুক্তিযুদ্ধের পরে নতুন এক শক্তির জন্ম হয়, (২) বাংলাদেশ হয় ভিক্ষায় রত, না হয় শোকগীতি গাইছে অথবা অসচেতনভাবে চীৎকার করছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে : ৭২ সালে যা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি— জনগণের সীমাহীন দুঃখের কারণে যে নতুন শক্তির প্রয়োজন হয় এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। যাকে '৭২ সালে 'অসচেতনভাবে চীৎকার' বলা হয়েছে— তারই পথ ধরে ঘটল ৭-ই নভেম্বরের পরিবর্তন। তাঁর প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল '৭২ থেকে। জিয়ার ক্ষমতালাভের পর সে যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি ঘটে। সেজন্য ৭-ই নভেম্বর জাতির ইতিহাসে এক তাৎপর্যবহ ঘটনা এবং এদিন 'সংহতি দিবস' পালন সকল জনগণের বা দলমতনির্বিশেষে সকলের কাম্য।

জিয়ার মতে : বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মর্মমূলে যে জাতীয় উন্নয়ন ও মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের, প্রেরণা রয়েছে, তাকেই জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ বিষয়টি তিনি (জিয়া) নিজে সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন, তার প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উল্লেখ করা গেল। "বাংলাদেশী-জাতীয়তাবাদের ভিত্তিমূলে রয়েছে যে শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন, তাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে, জনগণের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে।"

রাষ্ট্রপতি জিয়া বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা তাঁর ভাষায় বলি।

ঃ এই পর্যায়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল বিষয়গুলো ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, যা ছাড়া জাতীয়তাবাদী দর্শনের আন্দোলন এবং তার মূল লক্ষ্য অর্থাৎ শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ হয়ে পড়বে অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। আমরা বলতে পারি : বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে মোটামুটি সাতটি মৌলিক বিবেচ্য বিষয় রয়েছে, যা হচ্ছে—

১। বাংলাদেশের ভূমি অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যবর্তী আমাদের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক এলাকা।

২। ধর্ম ও গোত্র নির্বিশেষে দেশের জনগণ।

৩। আমাদের ভাষা বাংলা ভাষা।

৪। আমাদের সংস্কৃতি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা ও আন্তরিকতার ধারক ও বাহক। আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি।

৫। দুশো বছর উপনিবেশ থাকার প্রেক্ষাপটে বিশেষ অর্থনৈতিক বিবেচনার বৈপ্লবিক দিক।

৬। আমাদের ধর্ম— প্রতিটি নারী ও পুরুষের অবাধে তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন ও রীতি-নীতি পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা।

৭। সর্বোপরি আমাদের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ— যার মধ্য দিয়ে আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন বাস্তব ও চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। ঃ

www.nagorikpathagar.org

আমার মনে হয়, জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণা এত স্পষ্ট ও বাস্তব চেতনাসম্পন্ন যে তা তাঁর প্রবন্ধগুলো পড়লেই আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। আর তাঁর চেতনাসম্পন্ন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আলোকে নিজেকে তৈরি করলেই দেশের কল্যাণসাধন সম্ভব।

বাংলাদেশী জাতিসত্তাকে জিয়া যে ৭ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, তার ভিতরই এ দেশের রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্বকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সে কারণে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বলতে জিয়া কেন উক্ত ৭টি মূল স্তম্ভের কথা বলেছেন এবং খালেদা তার বক্তব্যে "বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী প্রত্যয়কে প্রাণবন্ত করে জাতীয় জীবনে তার সার্থক বাস্তবায়নের কথা বলেছেন, তার মূল স্পিরিট কি, তা আমাদের জানা দরকার। মি: লারমা ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে বলেছিলেন, আমরা এক দেশের অধিবাসী হয়েও বাঙালি নই, হিন্দু নই, মুসলমান নই। কথাটি সত্য। জাতিসত্তার সমাজ বিস্তৃত। সে তার দেশ-কালকে অতিক্রম করতে পারে, আবার ক্ষুদ্র গণ্ডী বা দেশের এক কোণে চাকমা, মারমা, সাঁওতালদের মত কয়েকটি গ্রাম বা মহল্লা নিয়েও অবস্থান করতে পারে। আবার তা মুসলমান জাতির মত সমস্ত পৃথিবীময় বিস্তৃত হতে পারে। সেজন্য এক কোণে পরে থাকা চাকমাকে নিয়ে যেমন এক রাষ্ট্র হতে পারে না। তেমনি মুসলমান জাতিসমূহের সকলকে নিয়েও এক রাষ্ট্রধর্মের অধীনে বসবাস করা যায় না। কারণ সমাজ বিস্তৃত। জাতির ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতির আঙ্গিক এবং রাষ্ট্রধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ একাধিক জাতি তথা হিন্দু, মুসলমান, চাকমা ইত্যাদির কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ভিন্ন। অর্থাৎ আমরা যখন হজ্জ করতে যাব তখন বিশ্বময় মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ধারণ করেই হজ্জব্রহ পালন করবো। কারণ সেখানে পৃথিবীর সকল মুসলমানদের মহামিলন স্থল। কিন্তু এ দেশের বা রাষ্ট্রধর্মের অধীনে পালনীয় বিষয়গুলো যেমন ২১ ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং আমাদের স্ব স্ব ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আলোকে অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ, কখনও তা সম্মিলিতভাবে কখনও বা পৃথকভাবে পালন করতে হয়। এখানেই বাংলাদেশী ও বাঙালি জাতিসত্তার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাঙালি জাতিসত্তার স্বরূপ একদিকে যেমন ব্যাপক ও বিস্তৃত, যা এ দেশের গণ্ডীকে অতিক্রম করেছে— অপরদিকে তা এদেশের চাকমা জাতি ও কৃষ্টিকে অস্বীকার করেনি। কিন্তু রাষ্ট্রধর্মে তা প্রয়োগ সম্ভবও নয়, উচিতও নয়।

ধরা যাক, বাঙালি বলতে বাংলাদেশের জনগণ ও ভাষার লোকদের এবং পশ্চিম বঙ্গের জনগণ ও বাংলা ভাষা গোষ্ঠীকে বলা হয়। এই বিস্তৃত বাঙালি জাতীয়তা বা জাতিসত্তাকে কেমন করে আমাদের রাষ্ট্রধর্মে সম্পৃক্ত করা যায় ? আসলে যায়ও না। সে জন্য বাঙালি বলতে আমরা ভীত হয়ে পড়ি, দুই বাংলার জাতিসত্তায় হারিয়ে যাবার ভয় থাকে—আর জিয়াউর রহমানও সেই ভয় করেছেন বলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন। আর এ জাতীয়তায় সৃষ্টি হয়েছে উক্ত ৭টি স্তম্ভ। যথা এর ভূমি, জনগণ, রাষ্ট্র বা সার্বভৌমত্ব, এর ভাষা ও সংস্কৃতি, এর ধর্ম গোত্র (বহু ধর্মের অবস্থান), নারী-পুরুষের স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা। পাকিস্তানের দ্বিজাতিতত্ত্ব এ কারণেই ব্যর্থ হয়েছে। শত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও এটি ভাঙত না, যদি তারা আমাদের এ দেশীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

বৈষম্যগুলো দূর করতে পারত। সে কারণে শুধু ইসলামী বন্ধন ও ভাষা সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে টেকেনি। অপরদিকে ধরা যাক, আবারো বলছি ধরা যাক, পশ্চিমবঙ্গ পৃথক হয়ে গেল ভারত থেকে, তারা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করল। তাহলে তারাও তো বাঙালি, তখন যেমন ছিল এখনও তেমনি বাঙালি। আমরা যেমন বাঙালি তেমনি এক বাঙালি। তাহলে কি রাষ্ট্রধর্মের আলোকে সে বঙ্গের বাঙালি জাতিসত্তা এক হবে? হবে না। কারণ দু'টি রাষ্ট্র পৃথক ভৌগোলিক পরিবেশ ও বিভিন্ন কারণ এ দুই জাতি অবস্থানে আসীন। সেজন্য হয়ত তাদের পৃথক কোন নাম দিতে হবে, নয়ত আমাদের সঙ্গে একীভূত হয়ে বাংলাদেশ নাম ধারণ করতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়, তা আমরা চাই না। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তার নামে ওরাই বরং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে অবলুপ্ত করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে বিস্তৃত আঙ্গিকে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির চেতনার কথা বলছে। বাংলাদেশকে বিলুপ্ত করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃহৎ বাঙালি চেতনার অন্তরালে আগ্রাসী ভারতের একজাতিতত্ত্বে বিলীন হয়ে আমাদের রাষ্ট্রধর্ম বা রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করার এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ছাড়া এটি আর কিছুই নয়। সে কারণেই শত শত বছর ধরে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে দিল্লী-ভারতের বিরোধ চলে আসছে এবং দিল্লীকে অস্বীকার করে বাংলাদেশ চিরদিন স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থেকেছে। জিয়ার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের এটিই হচ্ছে মূল Spirit, যা ওই ৭টি স্তম্ভ ও আনুষঙ্গিক আরো বিষয় নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য জিয়া এদেশের উন্নয়নের জন্য যে কাজ করে গেছেন তা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আলোকেই এবং তাঁর সুচিন্তিত জাতীয়তাবাদী প্রবন্ধে তিনি সেই অনুভূতিই ব্যক্ত করেছেন। বেগম খালেদা জিয়া তাঁর পূর্বোক্ত মুখবন্ধে সেই অনুভূতির কথা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন। সে কারণে বেগম জিয়াকে এই জাতীয়তাবাদের আলোকে দু'টি দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। (১) স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী হয়ে এ জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রধর্মে অক্ষুণ্ন রাখা এবং বাঙালি জাতীয়তার আলোকে পরদেশে বিলীন হয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্রকে রোধ করা। (২) এ দেশের উন্নয়নে ও শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করা। বেগম জিয়া এ দুই দায়িত্ব পালনে একজন নিবেদিতপ্রাণ দেশনেত্রী হিসেবে কাজ করে চলেছেন।

প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদের ভাষায়, "বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান হল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা।" সে কারণে রাষ্ট্রপতি জিয়ার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রধর্মে ও দেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত করার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি এবং প্রসঙ্গত বলতে চাই, আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বা তৎকালীন সময়ে ভারতীয় সহযোগিতার প্রয়োজনে এবং শেখ মুজিবের মুখ হতে বেরিয়ে আসা (যা নাকি পেছন থেকে বলানো হয়েছিল) শ্লোগানকে (জয় বাংলা এবং পরে জয় পাকিস্তান) সে সময় জয় বাংলা বলে যতই উচ্চারিত করি না কেন, তা স্বাধীন বাংলাদেশে প্রযোজ্য নয় বা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সে কারণে প্রাক্ স্বাধীনতাকালে লিখিত ও ২৩ মার্চ মঞ্চস্থ ও প্রকাশিত রক্ত শপথ নাটকেও আংশিক সংশোধন করে বলা হয়েছিল 'জয় স্বাধীন বাংলা।' এই স্বাধীনতা লাভের সময়ে উঠে আসা 'জয় বাংলা' শ্লোগান এপার বাংলা ওপার বাংলার যেটি শ্লোগান হতে পারে বা সেই আলোকে বিস্তৃত সামাজিক প্রেক্ষাপটে

www.nagorikpathagar.org

ব্যবহৃত হতে পারে (যদিও তা ব্যবহারে দু দেশেরই জটিলতা ও সম্পর্কের অবনতি ঘটারও সম্ভাবনা রয়েছে)। কিন্তু একটি রাষ্ট্রে যার সীমানা আছে, জনগণ আছে, জাতীয় সরকার আছে এবং সর্বোপরি দেশের সার্বভৌমত্ব আছে তার ভাষা এ হতে পারে না বা সেই শ্লোগানধর্মী বাঙালি জাতীয়তাকেও গ্রহণ করা যায় না। সেজন্য বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদই আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল সুর। যা আবহমানকাল থেকে শত শত বছর ধরে আমাদের জাতি ধর্মকে লালন করে আসছে এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভে তা পুষ্ট ও পূর্ণতা লাভ করেছে। জিয়া এ দেশে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে স্বীকৃতি দিয়ে এক মহৎ কাজ করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। শুধু তাই নয়, এ বাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি একটি রাজনৈতিক দল গঠনেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এটি তাঁর উচ্চাভিলাষী কোনো পদক্ষেপ নয় বরং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম। সেজন্য তা প্রতিষ্ঠার জন্য 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' [Bangladesh Nationalist Party (B.N.P)] বি. এন. পি. নামক একটি দল গঠন করেন এবং সঙ্গত কারণেই তিনি তাঁর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে জিয়ার শাহাদাৎ বরণের পর বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে দলের ও দেশের জনগণ বেগম খালেদা জিয়াকে বি. এন. পি.-র চেয়ারপার্সন হিসেবে নির্বাচিত করেন। এটিও একটি সঠিক সিদ্ধান্ত বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিজেই তাঁর 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'– প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলেন, "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে শতশত বর্ষ ধরে এদেশের আপামর জনগণের অন্তরে চির জাগরূক রয়েছে। যুগ যুগান্তরের দেশপ্রেমিকদের হৃদয়ের মর্মমূলে নিহিত তাদের সর্ব উৎসাহ, উদ্যোগ ও প্রেরণার উৎস এ দর্শন। এ দর্শনে নিহিত রয়েছে বাস্তব আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী, যা দেশের ঐক্যবদ্ধ জনগণকে সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপযোগী, বাস্তবমুখী ও সময়োচিত শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্বুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংবদ্ধ করবে। জাতিকে সুনিশ্চিতভাবে অগ্রগতির ও সমৃদ্ধির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে এবং বিশ্ব জাতির দরবারে বাংলাদেশকে মর্যাদা ও গুরুত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।'

প্রেসিডেন্ট জিয়ার উক্ত রচনার আলোকে প্রতিভাত হয় যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এদেশের পুরানো কালের দেশীয় সীমানার মধ্যে সংস্কৃতিজাত, কৃষ্টি ও ভাষাজাত এবং সকল ধর্মজাত ও তা রাষ্ট্রের অধীনে শাসন সমর্থিত বা শাসন প্রক্রিয়াজাত। আমরা জানি ঃ বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি বহুপূর্ব থেকে শুরু হয়ে নানা ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের স্পর্শজাত আলোকে বিস্তৃত ও সুশোভিত হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক খোন্দকার মকবুল হোসেন তাঁর (এ গ্রন্থের লেখক) 'আমাদের সংস্কৃতি; আমাদের রাজনীতি; আমাদের কথা' প্রবন্ধে বলেন, "এদেশের আদিবাসী অনার্য ও দ্রাবিড়। তাদের নিজস্ব জীবনধারণ পদ্ধতি ও আচার-আচরণে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাদের প্রাকৃত ভাষা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ভাষারূপ লাভ করে। তাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে যা ছিল তা বাংলাদেশের জনগণের মাঝেও পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে বাংলা সংস্কৃতিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।" এটিই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল সুর

www.nagorikpathagar.org

যা নানাভাবে পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভের কারণে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

এ দেশের আদিবাসী অনার্য ও দ্রাবিড়, বাংলাদেশে বসবাস করার ফলে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে তাদের জাতিসত্তায় ধারণ ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশকে আক্রমণ করে দখলে নিয়েছে আর্য, শক, হুন, পাঠান, মোগল এবং পরিশেষে ইংরেজ। সেজন্য বর্ণহিন্দুগণও মুসলমানদের মত বিদেশ হতে এসেছে। তবে এতে একটু পার্থক্য বিদ্যমান। তা হল আর্যগণ এদেশের আদিবাসীদের অনার্য হতে শূদ্রে বা দাসে রূপান্তরিত করেছে, বর্ণহিন্দু মর্যাদা দেয়নি, কিন্তু মুসলমান এদেশের অনার্য ও শূদ্রদের শুধু ধর্মান্তরিতই করেনি, তাদের মুসলমানদের সঙ্গে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। যে বর্ণহিন্দু মুসলমান হয়েছে তার সঙ্গে ধর্মান্তরিত শূদ্রজাত মুসলমানদের মধ্যে আর কোনো পার্থক্যই নেই। সে যাইহোক পূর্বপুরুষদের আগমন ও মেলা-মেশার কারণে ও নারী-পুরুষদের বৈধ বা অবৈধভাবে একত্রে বসবাসের ফলে অনার্য বা দ্রাবিড় সভ্যতায় এসেছে সংকর জনগোষ্ঠী, এসেছে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়, শাসন করেছে তারা এ দেশকে, ধর্মান্তরিত হয়েছে আদিবাসী, নানা ধর্মে, নানা জাতিতে, নানা কৃষ্টিতে তারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে বাংলাদেশী জাতিসত্তায় বহুজাতি বসবাস করছে। ব্রাহ্মণ রাজা বর্ণবাদী সেন বংশীয় লোকেরা এদেশের জাতিসত্তাকে সর্বভারতীয় করার অভিপ্রায়ে বা বর্ণবাদী আর্যসভ্যতার অধীনে নিয়ে আসার জন্য বাংলা ভাষাকে লোপ করতে চেয়েছেন। এ ভাষায় সাহিত্যচর্চা বা লেখালেখি বন্ধ করে দিয়েছেন, 'হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে' বলে যাদের বরণ করে নেয়ার প্রয়োজন চলছে তারাই সেনরাজগণ। ফলে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী দুশো বছর ধরে সেখানে বাংলা ভাষাচর্চা বা সাহিত্যচর্চা হয়নি। বাংলাদেশী জাতিসত্তাকে এভাবে ধ্বংস করতে চেয়েও তাঁরা তা পারেনি। ১২০২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান এদেশ দখল করে নিয়ে সকল দ্বার খুলে দিয়েছে, বাংলা ভাষাকে রাজভাষার মর্যাদা দিয়েছে, বাংলা ভাষায় যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেছেন তাঁদের মুসলমান শাসক উৎসাহিত করেছেন, পুরস্কৃত করেছেন। এদেশের জাতিসত্তাকে সর্বভারতীয় জাতিসত্তায় রূপান্তরিত করার জন্য সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতা বালগঙ্গাধর তিলক বাংলাদেশে শিবাজী উৎসবের আয়োজন করেছেন, বর্গীদের নেতাকে উৎসবের শিরোমণি করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন সে সময়। শিবাজীকে জাতীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করানোর মাধ্যমে সর্বভারতীয় চেতনার জন্ম দিতে চেয়েছেন তাঁরা। কিন্তু বাংলাদেশের জনসমাজ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে এদেশের জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়ে নটরাজ গিরিশ ঘোষ তার "নবাব সিরাজদ্দৌলা" নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের মাধ্যমে এ দেশে প্রথম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক মুনীর চৌধুরীর 'কবর' এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক খোন্দকার মকবুল হোসেনের 'রক্তশপথ' নাটকে (প্রাক্ যুদ্ধকালীন সময়ে) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা" গানটি সেই চেতনাজাত। 'ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটি সঙ্গীত হিসেবে জাতীয় মর্যাদার অধিকারী হলেও তা শাজাহান, নাটকের সঙ্গীত হিসেবে সর্বভারতীয় চেতনাজাত। সে

www.nagorikpathagar.org

কারণে অনেকে সে সঙ্গীতকে "জাতীয় সঙ্গীত" হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলেও আমরা তা গ্রহণ করিনি।

জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানও তা করেন নি। একই চেতনার কারণে অবিভক্ত বাংলাদেশকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার যে আয়োজন সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম, শরৎবসু, চিত্তরঞ্জন দাস, মওলানা ভাসানী করেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিরোধিতার কারণে তা হয়ে উঠেনি। অতঃপর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অখণ্ড বাংলাদেশ খণ্ডিত হয়ে এক অংশ পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্বাংশ পূর্ব-পাকিস্তান নাম ধারণ করে। অতঃপর বহুজাতিতত্ত্বের আলোকে পাকভারতে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্বাধীন হয়। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আলোকে স্বাধীন এ দেশকে তার প্রেক্ষাপটেই অবস্থান করতে হবে। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ইতিহাসের সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেছেন বলে তিনি উক্ত বক্তব্য তাঁর রচনায় উত্থাপন করেছেন।

এপার বাংলা-ওপার বাংলার মধ্যে এপার বাংলার লোকই ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়। ফলে খণ্ডিত পূর্ববাংলা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পথ ধরে স্বাধীনতা অর্জন করে। তাই খোন্দকার আব্দুল হামিদ তাঁর "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" প্রবন্ধে বলেন, "বাংলাদেশের মানুষ ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আপোষহীন সংগ্রাম করে তাদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার রাজনৈতিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেছে। সে সংগ্রাম ছিল একান্তভাবে বাংলাদেশী মানুষেরই।"

মি. এম. এন. লারমা একজন সংসদসদস্য হিসেবে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর গণপরিষদে 'বাঙালি' জাতীয়তার বিরোধিতা করে বলেছিলেন, "আমি একজন চাকমা। আমার বাপ দাদা চৌদ্দপুরুষ কেউ বলেন নাই আমি বাঙালি। কোন দিনই নিজেদেরকে বাঙালি বলে মনে করি নাই।.... আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালি বলে নয়।" রাষ্ট্রপতি জিয়া আমাদের দেশের এ সমস্যা অনুভব করেছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গও বাংলাদেশের এককালের খণ্ডিত অংশ এবং বর্তমানে ভারতের অঙ্গরাজ্য বিধায় বাঙালি জাতীয়তা যে আমাদের জন্য মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, তা তিনি জানতেন এবং তিনি এও জানতেন বাঙালি হিসেবে নয় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী হিসেবেই আমাদের পরিচয় থাকতে হবে এবং এ জাতীয়তাবাদের মধ্যেই দেশের উন্নয়ন এবং এ পথেই তা অর্জন করতে হবে।

এখানে 'জাতি গঠনের মহানায়ক শহীদ জিয়া' নামক প্রবন্ধ হতে সাদেক খানের জবানীতে জিয়ার বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। "বাংলাদেশে উপজাতীয় জনসংখ্যার অনুপাত যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, বহু জাতির উপস্থিতি এদেশে রয়েছে। তাদের জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় ধারণ করে আমাদেরও জাতি রাষ্ট্র গঠনে বহুজাতিক সহনশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তাহলেই মাত্র আমরা প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীগুলোর শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করতে পারব। ... তাই জাতীয় কৃষ্টির মূল্যবোধের সারমর্ম তথা কোর ভ্যালুজ (Core Values) বজায় রেখে রাষ্ট্রকে ঘিরে সকল নাগরিকের ধর্ম, বর্ণ, উপজাতীয় পরিচিতি নির্বিশেষে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে সু-প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।" জিয়া তাই

www.nagorikpathagar.org

বলেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অন্তরেই এর উন্নয়নের সুর ধ্বনিত। সে কারণে আমরা আমাদের একমাত্র দেশের প্রয়োজনে অর্থাৎ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দ্বারা সম্পৃক্ত থেকে যদি উন্নয়নের পথে অগ্রসর হই, তাহলে কোন বিরোধ থাকবে না। বাঙালি জাতীয়তার পথ ধরে পশ্চিমবঙ্গের বুক চিরে এখানে এসে একজাতিতত্ত্বের কথা বলে দেশকে আত্মস্থ বা অঙ্গীভূত করার সুযোগ পাবে না ভারত বা কোনো পরাশক্তি। তাই, "সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ পরিচালনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশকর্মীর জাতি গঠন ও রাষ্ট্রীয় প্রবৃদ্ধি কাফেলাকে তার ভূরাজনৈতিক মর্যাদা অর্জন করে এগিয়ে নিয়ে যাবে, একথা সুনিশ্চিত।"

তাই আমরা যদি জিয়ার জাতীয়তাবাদী আদর্শের অনুসারী হয়ে বাংলাদেশকে পরাশক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারি এবং একই পথ ধরে জিয়া যে উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন, ১৯ দফাভিত্তিক বি. এন. পি.-র সেই কর্মসূচীর মত উন্নয়ন সাধন করতে পারি এবং বেগম খালেদা যে সংসদীয় ও মন্ত্রিসভা শাসিত সরকার প্রবর্তন করে ১৯৯১-'৯৬ পর্যন্ত নানা বাধার মধ্যেও যে উন্নয়ন সাধন করেছেন, তাঁর হাতকে শক্তিশালী করে তাঁকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে বি. এন. পি. ও তার নেতাকর্মী এদেশে অমর হয়ে থাকবে। আর সব ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে— এ কথা তাদের কর্মকাণ্ডে ও আমাদের নেত্রীসহ আমাদের ত্যাগ ও নিরলসভাবে কাজ করার মধ্য দিয়েই ফুটে উঠবে। আমরা জানি, '৯৫-পূর্ব বাংলাদেশের ধ্বংসের নায়করাও আজ ইতিহাসের পঙ্কিলগহ্বরে তলিয়ে গেছে। আজ যারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বা তার লালনকারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তারাও জাতীয়তাবাদের গণজাগরণে হারিয়ে যাবে। কেবল বেঁচে থাকবে জাতীয়তাবাদ প্রণয়নের নায়ক শহীদ জিয়া আর তাঁর উত্তরসূরী ধারক ও বাহকরা।"

জিয়া রাষ্ট্রপতি হয়েই একটি ঘোষণার মাধ্যমে গণতন্ত্রের কথা, দল গঠনের অধিকারের কথা প্রকাশ করেন। মুজিব বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ভীতি উপজাতীয়দের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন, জিয়ার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার কারণে তা দূরীভূত হয়। দূর হয় বাঙালি জাতীয়তার বেড়াজালে আবদ্ধ এদেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হওয়ার হুমকি ও ভীতি। এজন্য জিয়া "আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী সমন্বিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে আবর্তধর্মী ও প্রকৃতির বিধানের অনুরূপ" বলে চিহ্নিত করেছেন— যা নিম্নলিখিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বি. এন. পি.ও এ ভিত্তির উপরই দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। রেস বা জনগোষ্ঠী ঃ বাংলাভাষা ঃ ভৌগোলিক এলাকা বা সীমানা ঃ অর্থনীতি ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ সংস্কৃতি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল উক্ত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত, যার ভিতরে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদসহ উন্নয়নের সকল দিকনির্দেশনা বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতি জিয়ার এ রাজনৈতিক দল সৃষ্টির পিছনে এ দেশের উন্নয়নের যে চেতনা তাঁর মানসিকতা সমুজ্জ্বল প্রকাশই হল বি. এন. পি.। সে কারণে বি. এন. পি.-ই দিতে পারে জাতিকে দিকনির্দেশনা, উন্নয়নের সুচিন্তিত মতামত এবং তা বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা; যে দল তার সার্বভৌমত্বকে রক্ষার জন্য জীবন বাজী রাখতে প্রস্তুত, যে দল ভারত বা যে কোন পররাষ্ট্রের নিকট মাথা নত করা নয় বরং সমঅধিকারের ভিত্তিতে আপন মর্যাদা নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে চায়, যে দল জিয়ার আদর্শকে সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর। বি. এন. পি. তাই স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের মানসপ্রেরণা, বাস্তব এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বি. এন. পি. মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্নাত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের এক উজ্জ্বল ফসল। সেজন্য জাতির উন্নয়নের সঙ্গে এ দল একাত্ম হয়ে আছে— জাতি, দেশ ও দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষার দায়িত্বগ্রহণও অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। বি. এন. পি. দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। সেজন্য দেশের জাতিসত্তা থেকে এ দলকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই বি. এন. পি. এমন একটি দল, যা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে অতীত ও বর্তমানকে ধারণ করে রেখেছে— যা নানা বিবর্তন ও ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে স্বাধীনতার ফসল ঘরে তুলেছে। তাই বলি, "বাংলাদেশের জনসমষ্টির মন মানসিকতায় যে ঐক্যানুভূতি ছিল তা জন্ম দিল এক অনন্য স্থাপত্যের। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মহান সৌধের। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্যে যে পার্থক্য, তার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে। একুশে ফেব্রুয়ারির মর্মভেদী আহ্বানে। শহীদ মিনারের আকাশ ছোঁয়া স্পর্ধায়।" এসবকেই বি. এন. পি তার অস্তিত্বে ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি জিয়া উপলব্ধি করেন দেশের উন্নয়নে ও মঙ্গলের প্রয়োজনে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে অবলম্বন করেই এগুতে হবে। তিনি দেশের সার্বিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধজাত স্বাধীন দেশের স্বাধীন উপলব্ধি থেকে। তাঁর উন্নয়ন ও দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল চিত্র রূপায়িত হয়েছে নিম্নবর্ণিত বাণীচিত্রে। "আওয়ামী দুঃশাসন, নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য থেকে তিনি (জিয়া) সিদ্ধহস্তে দেশকে ধীরে ধীরে স্থিতিশীল করলেন। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের গর্বিত বাংলাদেশী হিসেবে বেঁচে থাকার আশার আলো দেখালেন। '৭৫ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দ্বারা বিধ্বস্ত আর্থিক অবস্থা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, নতজানু পররাষ্ট্রনীতি এবং দুর্ভিক্ষের কারণে সমাজে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে তার উপশম করেছিলেন। দেশবাসীকে তিনি অনুপ্রাণিত করলেন তাঁর সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও অনন্য দেশপ্রেম দিয়ে। স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে সম্প্রসারণবাদীর হাত থেকে দেশকে বাঁচালেন। মধ্যপ্রাচ্য, আল-কুদ্‌স্ ইত্যাদি বহুজাতিক সমস্যার সমঝোতায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্থান করে দিলেন।"

জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দল সৃষ্টি সম্পর্কে কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করেন, যা ধোপে টেকে না। সবচেয়ে প্রধান কথা, স্বাধীনতার ঘোষক একাত্তরের জেড ফোর্সের অধিনায়ক, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যুদ্ধরত ও বিজয়ী একজন সমরনায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী প্রধান, স্বাভাবিক নিয়মে উঠে আসা চিফ অব আর্মি স্টাফ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠাকারী একজন রাষ্ট্রপতির দল বি. এন. পি. যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি হবে এ নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। তাই জিয়া প্রতিষ্ঠিত বি. এন. পি.-তে যোগ দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সমর্থক, পরাশক্তির সঙ্গে সমন্বয়কারীর বিরুদ্ধে অবস্থানকারী ছাত্র-শিক্ষক ও জনতা, বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম, দল-মতের লোকজন এবং নেতা-কর্মী। এককথায় দেশের মঙ্গল কামনা যাঁরা করেন তাঁরাই বি. এন. পি.-র সদস্য, সমর্থনকারী। অথচ বি. এন. পি.-কে নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

অনেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। যা কাম্যও নয় উচিতও নয়। স্বাধীনতা বিরোধীদের আওয়ামী লীগে যোগদানের কারণে তারা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি হয়ে যায়, মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যায়, আর মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকরা বি. এন. পি.-তে যোগ দিলে হয়ে যায় রাজাকার। ইতিহাসকে বিকৃত করে সব জয়মালাকে যারা মিথ্যা করে মুজিবের গলায় পরাতে চায়— যে মুজিব '৭১-এ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। সত্যকে মিথ্যে দিয়ে ঢাকা যায় না। ইতিহাস স্বীকৃত সত্যকে গায়ের জোরে বিকৃত শব্দের দ্বারা ইতিহাসের ঘটনাকে বাদ দিয়ে অসত্য ইতিহাস সাময়িকভাবে হয়তবা সৃষ্টি করা যায়, সরকারী ক্ষমতাবলে এ সব অসত্য ঘটনা বা কাল্পনিক কাহিনী তৈরি করে গ্রন্থ লেখা যায়— কিন্তু সত্যকে ঢাকা যায় না। সত্য কালের কপোলতলে সত্য সমুজ্জ্বল হয়ে উদ্ভাসিত হবেই— ইতিহাস সত্য সুন্দরকে তুলে ধরবেই। তাছাড়া এদেশে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধপূর্ব ও মুক্তিযুদ্ধ উত্তরকালীন যে সমস্ত ইতিহাসজাত উপাদান দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে— তা থেকেই ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করে সত্য ইতিহাস লেখা হবে; ইতিহাসের সত্য থেকে কেউ বাঁচতে পারেনি, পারবেও না। যতই ৭ মার্চের ভাষণ হতে "জয় পাকিস্তান" বাদ দিতে চাই না কেন— তা ইতিহাসের সত্য হয়ে বেরিয়ে আসবেই। ইতিহাসের এ সত্য থেকে হিটলার শত মিথ্যাকথা বলেও বাঁচেনি। এদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, রাজাকার, আলবদর, আলশামস্ তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদেরও ইতিহাস ক্ষমা করবে না। যেসব বুদ্ধিজীবী পাক সরকারকে সমর্থন ও তাদের অধীনে চাকুরী করে পাঁড় মুক্তিযোদ্ধা বনে গেছেন, তাদের ছদ্মবেশ উন্মোচিত হবেই—ইতিহাসের এটিই বিধান। কারো ইতিহাসের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার উপায় নেই। তাই বলতে হয় মুক্তিযুদ্ধের সাগরে বিধৌত মুক্তিযুদ্ধের সার্বজনীন চেতনায় সমৃদ্ধ এবং গণতন্ত্রের দিশারী বি. এন. পি.-র সকল নেতা-কর্মীকে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আলোকপুষ্ট ও সমুন্নত বি. এন. পি.-র নেতাকর্মীরা। তারা মেজর জিয়ার আদর্শ সৈনিক। জিয়ার সঙ্গে থেকে যেমন কাজ করেছে, তেমনি তাঁরই আদর্শে লালিত স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদার সঙ্গে থেকে দেশের সার্বজনীন ও সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত আছেন, কোন অপশক্তিই তাঁদের এ আদর্শ থেকে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না— এ বিশ্বাস আমার আছে। প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ তাঁর সম্পাদিত— 'জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ' গ্রন্থের ভূমিকায় অতি সংক্ষেপে 'জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শকে তুলে ধরেছেন— যা জিয়ার দর্শন ও আদর্শের সার কথা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আমি জিয়ার সেই আদর্শময় জীবনের ব্যাপক আলোচনার পূর্বে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে সংক্ষেপে তার কর্মকাণ্ডকে এখনে উপস্থাপন করব। তিনি তাঁর ভূমিকাভ্যন্তরে বলেন—

> ঃ জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলে ছিল বাংলাদেশের জনসমষ্টির চিন্তা-চেতনাকে ধারণ করা এবং অবহেলিত ও বঞ্চিতদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন। এদিক থেকে বলা যায়, জিয়ার রাজনীতিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে গ্রামীণ জনসমষ্টির প্রতি ফজলুল হকের অকৃত্রিম ভালবাসা, বঞ্চিত ও জীবন যুদ্ধে পরাস্ত জনগণের প্রতি ভাসানীর প্রাণঢালা দরদ। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে জিয়ার রাজনীতিতে পরিস্ফুট হয়েছে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের

www.nagorikpathagar.org

ধারা। জিয়ার রাজনীতিকে যেদিক থেকে দেখবেন, খুঁজে পাবেন এই ত্রিধারার সংমিশ্রণ, অনেকটা ত্রিবেণী সঙ্গমের মতোই। শেখ মুজিবের সঙ্গে জিয়ার পার্থক্য এখানেই। শেখ মুজিব জনগণের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছেন বটে, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে জনগণ রয়ে গেছে শুধুমাত্র ক্ষমতার সোপানস্বরূপ। ঃ

বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলোর (Various social forces) দিকে তাকিয়েই জিয়াউর রহমান তাঁর নীতি নির্ধারণ করেছেন। এ মাটির সন্তান হিসেবে তিনি সঠিকভাবেই অনুধাবন করেন, মাটি আর মানুষই হল বাংলাদেশ। মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্যে তিনি শুরু করেন দেশব্যাপী খালকাটা বিপ্লব। খাল কাটলে কুমীর আসে, তা তিনি জানতেন। তিনি জানতেন, খালের পানি ব্যবহার করে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব এবং সে ক্ষেত্রে লাভবান হবেন বড়ো বড়ো ভূমি মালিকরা। তা জেনেও তিনি এ কর্মসূচীকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন যথার্থ কারণে। কৃষির উন্নয়নে যা প্রয়োজন তা হল আধুনিক প্রযুক্তি। এ আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তিমূল কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সেচ। পল্লীবিদ্যুৎ প্রকল্প সারা দেশব্যাপী সম্প্রসারিত করে বিদ্যুৎচালিত পাম্প ব্যবহার করা সম্ভব। এজন্যই প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে পানি সরবরাহ। খাল খনন, বিল সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের নিকট মাটির উপরকার (Surface water) পানির সরবরাহ এবং পল্লী বিদ্যুৎ প্রকল্প— এ ছিল তাঁর নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণ করে প্রতিবেশী ভারত পদ্মাকে যেভাবে গ্রাস করছে, অন্যান্য ৫৩ টি নদী সম্পর্কে ভারত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সে সম্পর্কেও তিনি ভালভাবেই জানতেন। (এখন সেসব নদীতেও ব্যারাজ দেয়া হয়েছে।) তাই পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাল খননের কোন বিকল্প আছে কি? শুধু আজ কেন, দেশপ্রেমিক যে কোনো বাংলাদেশের নেতা পঞ্চাশ বছর পরও এ ভাবনা ভাববেন এবং জিয়াউর রহমানের সমাধানকে যুগোপযোগী মনে করবেন। এ হল তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত পদক্ষেপের নমুনা। পল্লীবিদ্যুৎ প্রকল্প তাঁরই সৃষ্টি।

মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি তথা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পরেই তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের এক নম্বর সমস্যা অপরিকল্পিত জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান তথা মানব উন্নয়নের দিকে। পরিবার পরিকল্পনার সমন্বিত কর্মসূচী গৃহীত হয় ১৯৭৬ সালে। চারদিকে চোখ রেখে তিনি অনুভব করেন দেশ শুধু একটি ভূখণ্ড মাত্র। এ ভূখণ্ডকে সাজিয়ে গুছিয়ে, এর অতীতকে ধারণ করে, ভবিষ্যতের স্বপ্নে উদ্বেল জনসমষ্টিই দেশের মূল কথা। তাই জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করাই ছিল তাঁর (জিয়ার) শ্রেষ্ঠ অগ্রাধিকার। পরিবার পরিকল্পনাকে সার্থক করার লক্ষ্যে তিনিই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন নতুন মন্ত্রণালয়।

নতুন মন্ত্রণালয়টিকে তিনি আরো ছয়টি মন্ত্রণালয়ের সাথে মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, জনশক্তি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট করেন। আজকের বাংলাদেশে জনসংখ্যার নিম্নহার বিশ্বময় স্বীকৃত হয়েছে এবং এক্ষেত্রের সকল কৃতিত্ব জিয়াউর রহমানের।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জিয়ার ছিল এক সহজাত শ্রদ্ধাবোধ। তাঁর 'আমাদের পথ' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, "তাই আমাদের প্রয়োজন অনতিবিলম্বে জনশক্তিকে

www.nagorikpathagar.org

ঐক্যবদ্ধ করা। তবে কথা থেকে যায়, জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা হবে কিভাবে? একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে? নিশ্চয় নয়। 'ওয়ান পার্টি সিস্টেম' এবং 'রেজিমেন্টেশন ইন ফোর্স' করে যে সাফল্য অর্জন করা যায়নি, অতীত তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর সহজাত শ্রদ্ধাবোধই বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু গণতন্ত্রকে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে এর পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যেই জিয়া বাকশাল আমলের বহু প্রতিবন্ধকতা দূর করে সংবাদপত্র প্রকাশের পথ সুগম করেন। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল গঠন এবং উন্নত মানসম্পন্ন ও নির্মোহ সাংবাদিকতার লক্ষ্যে তিনিই এদেশে প্রেসইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবেই জিয়াউর রহমান জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। জাতীয় প্রেসক্লাবকেই তিনি 'স্বৈরাচারের সমুদ্রে গণতন্ত্রের দ্বীপ'(an island of democracy in the ocean of autocracy) হিসেবে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীকালে দেখা গেছে, স্বৈরাচার বিরোধী ভূমিকা পালন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, যা চতুর্থ সংশোধনী আইনে (মুজিবের বাকশাল সৃষ্টি আইনে) পদদলিত করা হয়, পুনরায় তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৮ সালের ২য় ঘোষণাপত্রের আদেশের মাধ্যমে সংবিধানের ১০১ এবং ১০২ অনুচ্ছেদে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দেবার জন্যে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদের প্রতিনিধিত্বদানের বিধানসহ সংবিধানে স্থাপিত হয় ৯, ১০ এবং ১১ অনুচ্ছেদ। চতুর্থ সংশোধনী আইনে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাঁচ বছরের জন্য যেভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করে নির্বাচন ব্যবস্থাকে অর্থহীন করে তোলা হয়, তার অবসান ঘটান জিয়াউর রহমান।

জিয়াউর রহমান শিশুদের খুব ভালবাসতেন। সহজ, সরল, অকৃত্রিম, ফুলের মতো সুন্দর ছেলে-মেয়েদের প্রতি তাঁর ভালবাসার একটি দিক ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই শিশুদের দিকে তাকিয়ে তিনি এ জাতির ভবিষ্যত অনুভব করতেন। তাদের জাতির ভবিষ্যত হিসেবে দেখতে ভালবাসতেন। তাই তিনি চেয়েছেন, দেশের শিশুরা সুন্দরভাবে বেড়ে উঠুক। দেশজ সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত হোক। বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়ে উঠুক। এলক্ষ্যে তিনি দেশে সর্বপ্রথম শিশুএকাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। রেডিও-টেলিভিশনে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন এবং জাতীয় পর্যায়ে শিশুকল্যাণমূলক তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃতিচর্চারও ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বি. এন. সি. সি. (Bangladesh National Cadet Corp) গঠনের ব্যবস্থা করেন। দেশে স্কাউট ব্যবস্থাকে জোরদার করার লক্ষ্যে স্কাউট জাম্বুরীর আয়োজন করেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উৎসাহ যোগানোর জন্য জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

জিয়াউর রহমান এমন এক কৃতী-পুরুষ যার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর দেখা যায় জাতীয় জীবনের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনে। আজকে যাঁরা নিজেদের স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে জাতীয় ঐক্যে ভাঙ্গন ধরিয়েও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না,

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতার পরপর তাঁরাই ছিলেন দেশের কর্ণধার। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের দলিলসংগ্রহ ও সংকলন করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পর্যন্ত তাঁদের দৃষ্টিতে আসেনি। (আদতে আসলেও তারা তা করতেন না। করলে আসল ইতিহাস বেরিয়ে আসবে, ফলে তাঁদের আর কিছুই থাকবে না। তা না করে বিকৃত ইতিহাস সৃষ্টি করা তাঁদের জন্য মঙ্গলকর হবে— এ ছিল তাঁদের অভিপ্রায়।) ক্ষমতা প্রয়োগ এবং ক্ষমতাপ্রসূত সুখ-সুবিধায় এমনভাবে তারা মগ্ন ছিলেন যে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পর্যন্ত উপেক্ষিত ছিল। ১৯৭৭ সালে হাসান হাফিজুর রহমানকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দান করে এবং ড. মফিজুল্লাহ কবীরকে সভাপতি, ড. সালাউদ্দীন আহমদ, ড. আনিসুজ্জামান, ড. এনামুল হক, ড. সফর আলী আখন্দ, ড. কে. এম. মহসিন, ড. শামসুল হুদা হারুন ও ড. এম. এ. করিমকে সদস্য নিয়োগ করে জিয়াউর রহমানই এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রায় পাঁচ বছরে সংগৃহীত হয় প্রায় তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিলপত্র। সেগুলো যাচাই বাছাই করে ১৬ খণ্ডে দলিল প্রকাশিত হয়। জিয়াউর রহমানের এ দূরদর্শিতা ও দেশপ্রেমের তুলনা নেই।

এ মৃত্যুঞ্জয়ী জাতীয় নেতার জীবনের বিভিন্নদিকের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনাসমৃদ্ধ নিবন্ধের এ সংকলনটি তৈরি হয়েছে জাতির সামনে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা উপস্থাপনের জন্য। কিছুসংখ্যক সংকীর্ণমনা স্বার্থান্বেষীর হাতে যেভাবে আমাদের জাতীয় ইতিহাস বিকৃত হয়ে চলেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং রাষ্ট্রীয় তথ্যমাধ্যমের সহায়তায় সুষ্ঠু জাতীয় জীবনের জন্য তা সত্যই মারাত্মক। অসত্য ও অর্ধসত্যের জগাখিচুড়ি দিয়ে সাময়িকভাবে লাভবান হওয়া যায়, কিন্তু চূড়ান্তভাবে তা সমূহ ক্ষতির ক্ষেত্র রচনা করে। অতীতকে বর্তমানের ভিত্তি হিসেবেই দেখা হয় এবং বর্তমান একবার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্নে উদ্বেল হয়ে উঠলেই জাতি অগ্রগতি ও উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য গতি অর্জন করে। একারণে জাতির সামনে তথ্য-নির্ভর অতীতকে তুলে ধরা জাতীয় কর্তব্য। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই এ সংকলনটি তৈরি হয়েছে।

ড. এমাজউদ্দীনের উক্ত প্রবন্ধের একাংশের আলোকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জিয়াউর রহমানের জীবনালেখ্য উপস্থাপন করা হল। তাঁর দীর্ঘ জীবনের বিশেষ করে বাল্য, কৈশোর ও যৌবনকালের সংক্ষিপ্ত চিত্র এবং সামরিক বাহিনীতে চাকুরী জীবন, মুক্তি যুদ্ধের ঘোষণা এবং তাঁর নয় মাস বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধেরও সাধারণ আলোচনা ও গবেষণা ধর্মী কিছু তথ্য আলোচনার মাধ্যমে তাঁর সঠিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাসমৃদ্ধ জীবনকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছি। এখন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সুমহান কর্মকাণ্ড যা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে সংগঠিত হয়েছে, তারও একটি তথ্যভিত্তিক আলোচনা করে পরবর্তী পর্যায়ে যেতে চাই।

প্রসঙ্গক্রমে আমি বলতে চাই, স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি হিসেবে মুজিব কন্যা যতই চীৎকার করুন না কেন, তাঁর পিতা বা তিনি স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি ছিলেন না। তাজউদ্দীনকে ও তাঁর সমর্থিত আওয়ামী লীগ ও সকল জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করতে হয়। কিন্তু তাঁকেই মুজিব মন্ত্রিত্ব থেকে বরখাস্ত করেন। যেহেতু ইতিহাসের ঘটনার নিরিখে মুজিব ও মুজিব কন্যা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি নন। সেজন্য সঙ্গত কারণে বেগম খালেদা জিয়ার, নভেম্বর ২০০০ সালে যথাক্রমে দৈনিক

www.nagorikpathagar.org

জনকণ্ঠে ও দৈনিক করোতোয়ায়, যে বক্তব্য এসেছে তা এখানে তুলে ধরছি (১) "খালেদা জিয়া তাঁর ভাষায় স্বাধীনতাবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে, বিজয়ের লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানান" (জনকণ্ঠ) এবং "খালেদা জিয়া আরো বলেন, যারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে, বিজয়ের পর তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে পারেনি। যুদ্ধ বিজয়ের পর ভারত সরকার (তাদের) ক্ষমতায় বসিয়েছে ওদের দোসর আওয়ামী লীগকে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসে বাংলাদেশকে ভারতের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করে।" বলা ভাল, তাজউদ্দীনকে তাঁদের নির্দেশেই চলে যেতে হয়।

ইতিপূর্বের আলোচনার প্রতিধ্বনি করেছেন খালেদা জিয়া। সে কারণে দেশের যে, যন্ত্রণাদায়ক চিত্র আমরা তুলে ধরেছি, তার পরবর্তীকালে সিপাহী-জনতার বিপ্লবের কারণে জিয়া ক্ষমতায় এসে যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে হাত দিয়েছিলেন, তারও একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আমরা তুলে ধরেছি। এখন জিয়ার কর্মকাণ্ডের, প্রতিটি দিক নিয়ে আলোচনা করতে না পারলেও, অধিকাংশ দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

জিয়া ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়ার পর যে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তার মধ্যে একটি হল গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন। মুজিব সমস্ত ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার লালসায় বাকশাল সৃষ্টি করে গণতন্ত্রকে হত্যা, বিচার- বিভাগের ক্ষমতা হরণ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ (৪টি বাদে) করে দেন। জিয়া ক্ষমতায় এসে আবার গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করেন। বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেমন অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের উৎসাহিত করেন এবং নিজেও একটি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন। এর নাম হয় 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বি. এন. পি. (Bangladesh Nationalist Party, B.N.P)।'

গণতন্ত্র কি, তা আগে আমাদের জানা দরকার। এ গণতন্ত্রকে মুজিব হত্যা করার ফলে যে ক্ষতি হয়েছিল, এখন আমরা তা বুঝতে পারব। জিয়াউর রহমান পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন— এর ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে সীমাহীন শুভ ফল বয়ে এনেছে, তাও আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।

১৯৯৮ সালে পাক্ষিক পালাবদল পত্রিকায় ১৫ জানুয়ারীতে 'বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত' শিরোনামে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক দেশে আইন পরিষদের সদস্যদের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। জনগণের পক্ষে তাঁরা কথা বলেন। জনগণের দাবীদাওয়া তুলে ধরেন। জনগণের ম্যাণ্ডেট প্রাপ্ত এসব ব্যক্তিবর্গের বক্তব্যে তাই কেউ উদাসীন থাকে না। প্রাধিকার তালিকায় (order of Precedence) কোন্ পর্যায়ে তাঁদের স্থান এ নিয়ে কেউ কোন কথা বলে না, কেউ ভাবেও না।" সেজন্য সংবিধানের ৭৮(২) অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোট দানের জন্য কোন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।" আমেরিকার প্রেসিডেন্ট গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা-ই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় পরিচয় : State-এর সরকার of the people, for the people এবং by the people. অর্থাৎ রাষ্ট্রের সরকার জনগণের, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকে। পুরোগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে মুজিব বাকশাল করে আমাদের সব

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে আমাদের দাস করে রাখার ষড়যন্ত্র করেন এবং জিয়া এসে গণতন্ত্রের সব দরজা খুলে দেন। দৈনিক দিনকালের ১ সেপ্টেম্বরের (১৯৯৮) 'গণতন্ত্র ও সংবাদপত্র' নামক ফিচারে বলেছেন,"মত প্রকাশের স্বাধীনতা যে সমাজে সীমিত ওই সমাজ শুধু অগণতান্ত্রিক নয়, হতশ্রীও বটে। ওই সমাজে গণতন্ত্রের সোনালী ফসল ফলে না। ওই সমাজে সৃজনশীল চিন্তার গতিধারা আরোপিত বাধানিষেধের মরুভূমিতে পথ হারায়।" এ সম্পর্কে স্টুয়ার্ট মিল তাঁর On liberty গ্রন্থে, বলেন ঃ "একটি মত প্রকাশকে বাধা প্রদান মানবজাতিকে লুণ্ঠনের মতো।"

এক মনীষী বলেছেন, আমাকে যদি রাষ্ট্র বা সংবাদপত্রের একটিকে নিতে বলা হয়, তাহলে আমি সংবাদপত্রকেই নেব। কারণ এতে তাঁর চিন্তা প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত হবে। মুজিব সরকার গণতন্ত্রকে হত্যার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রাণ মত প্রকাশের হাতিয়ার ৪র্থ রাষ্ট্র 'সংবাদপত্রকেও' (৪টি বাদে) বন্ধ করে দেয়। এখানে ড. এমাজউদ্দীন আহমদের 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও জিয়া'– প্রবন্ধে দেখি, চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে, "বহুদলীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সৃষ্টি করা হয় একদলীয় একত্ববাদ। মৌলিক অধিকার এবং ন্যায়নীতির অভিভাবক বিচার বিভাগকে আনা হল নির্বাহী বিভাগের পদতলে। গণতন্ত্রের অতন্দ্রপ্রহরী সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে অবাধ তথ্যপ্রবাহের পরিবর্তে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মাত্র চারটি সংবাদপত্র প্রচলনের বিধি গৃহীত হয়। যে, নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূল তাও অস্বীকার করে শেখ মুজিবুর রহমানকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত করা হল।"

এরপরই এল বাঁধ ভাঙ্গার পালা, শেকল ছেঁড়ার বছর ১৯৭৫ সাল। এল সেই ৭ই নভেম্বরের মহান দিবস, জিয়ার মুক্তিতে দেশও মুক্ত হল, বাকশাল থেকে মুক্ত হয়ে দেশ গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে গেল। জিয়া গণতন্ত্রের সকল দরজা-জানালা খুলে দিলেন, সংবাদপত্র, চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতা নিয়ে তার পাখা মেলে দিল। তাই রিয়াজ উদ্দীন আহমদের ভাষায় বলি, "গণতন্ত্র হয়েছিল নির্বাসিত। জিয়া ক্ষমতায় এসেই গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তিনি একদলীয় বাকশালের স্থলে বহুদল গঠনের আইন করেন। সংবাদপত্র প্রকাশের উপর থেকে প্রত্যাহার করে নেন নিষেধাজ্ঞা। ফলে একের পর এক সংবাদ প্রকাশ হতে শুরু করে। পেশায় ফিরে আসতে থাকেন বেকার সাংবাদিকরা।" কারণ, "জিয়ার নিকট গণতন্ত্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাই ছিল না, গণতন্ত্রকে তিনি দেখেছেন এক জীবন ব্যবস্থারূপে", জীবন, সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়নের চাবিকাঠি রূপে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের মাঝেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভরশীল, সেকথা আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। তবে অধ্যাপক ড. এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ভাষায় বলি, "২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা সংগ্রাম এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ আমাদের চূড়ান্তভাবে একটি বিশিষ্ট জাতিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে" এবং ৭ই নভেম্বর "বিপ্লব এবং প্রতি বিপ্লবের দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার মাঝে তিনি যখন নিজেই শৃঙ্খলিত ও বন্দী, তখন সিপাহী-জনতার বিপ্লব তাঁকে দেশের শাসনভার গ্রহণ করে দেশকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়ে উত্তপ্ত রাজনীতির মধ্যবলয়ে নিক্ষেপ করলো। জিয়াউর রহমান বাধ্য হলেন একটি অরাজক উচ্ছৃঙ্খল বুভুক্ষু দেশের হাল

www.nagorikpathagar.org

ধরতে।" হাল ধরেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক দেশের উন্নয়নের জন্য একটি দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন এবং মুক্তিযোদ্ধা, জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রী, সমাজসেবক, দেশপ্রেমিক লোকদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম দিলেন— তা আগেই বলেছি। তিনি দেশ ও জাতির উন্নয়নে ১৯ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং দলীয় বা বি. এন. পি.-এর ১৯ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে যত্নবান হলেন। ড. চৌধুরী বলেন, "সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ১৯ দফা। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের প্রতিজ্ঞা ১৯ দফা। সামাজিক অনাচার দূরীভূত করার প্রবল ইচ্ছা এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির অঙ্গীকার ১৯ দফা।" আর এই উন্নয়নে জিয়ার ত্যাগ, পরিশ্রম ও মেধা সর্বকালের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ড. চৌধুরীর ভাষায়, "সবচাইতে সাধারণ খাবার খেয়ে (প্রায়ই চাপাতি, ঝোল এবং ডাল) পুরানো কাপড় পরে (অনেকেই যে স্থলে দিনে ৩ বার স্যুট বদলে দেখা দেন), প্রেসিডেন্ট হয়েও সুটকেসে রশি বেঁধে ব্যবহার করে, বেতনের টাকার অংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দান করে, ঘুষ-দুর্নীতির ঊর্ধ্বে জীবন যাপন করে, রাষ্ট্রপতি হয়েও রাজধানীতে কোন বাড়ির মালিক না হয়ে যে, উদাহরণ রেখে গেছেন তা তৃতীয় বিশ্বে অসাধারণ (রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের রাষ্ট্রপতি)। সকাল থেকে রাত ১টা পর্যন্ত অবিরাম পরিশ্রম তাঁর দৈহিক এবং মানসিক চরিত্রের অঙ্গীভূত বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম।"

জিয়া জানতেন জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের পূর্ণ রূপায়ন ব্যতীত দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সে জন্য তিনি জাতীয়তাবাদকে সাংবিধানিক মর্যাদা ও বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, "শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে কয়েকটি বাস্তব পদক্ষেপও গ্রহণ করলেন তিনি। এগুলো সবই ছিল তাঁর সুস্পষ্ট ও বিপ্লবী চিন্তাধারার ফসল।" (১) কৃষি ও খাদ্য বিপ্লব, (২) গণশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প, (৩) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা, (৪) স্বনির্ভর বাংলাদেশ, (৫) গ্রামসরকার গঠন, (৬) খালকাটা প্রকল্প, (৭) জিয়ার পররাষ্ট্রনীতি ও সার্ক সম্মেলন, (৮) অর্থনীতি ও শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব, (৯) স্বাস্থ্য ও বাসস্থান প্রকল্প। আমরা এখন উক্ত বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন, কর্মসূচী প্রণয়ন ও কার্যক্রমের আলোকে বিপ্লবী জিয়ার মূল্যায়ন করার প্রয়াস পাব।

১. কৃষি ও খাদ্য বিপ্লব— জিয়াউর রহমানই কৃষি ও খাদ্য বিপ্লবের সূচনা করেন। তিনি ৫ বছরের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি ভূমি হতে বার মাসই যেন বিভিন্ন ফসল পাওয়া যায় সে চিন্তা করেই খাল কাটা প্রকল্প হাতে নেন। শীতেও যেন সেচের পানি পাওয়া যায় তার জন্য পানি আটকানোর জন্য খাল কাটা ও রিজার্ভ ট্যাংকের ব্যবস্থা করেন। শীত মৌসুমেও ফসল বাড়ানোর জন্য পানি আগে থেকেই জমা রাখার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। জিয়া বলেন, "আমাদের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে। মাছের চাষ, হাস-মুরগী ও গবাদিপশু পালন ও প্রজনন কয়েকগুণ বাড়াতে হবে। সারাদেশকে সেচের আওতায় আনতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জিত হবে আগামী প্রায় পাঁচ বছরের মধ্যে। জমির মালিকানা ব্যবস্থা দেশবাসীর কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য একটা পন্থায় পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। তেমনি প্রয়োজন উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্র থেকে জমি উদ্ধার করা, বন সম্পদ বৃদ্ধি ও পর্যায়ক্রমে কৃষি ও চাষী সমবায় গঠন করা।"

www.nagorikpathagar.org

২. **গণশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প—** জিয়া গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। তিনি জানতেন, আপামর জনগণের সার্বজনীন শিক্ষার উপরই দেশের উন্নয়ন নির্ভর করছে। প্রত্যেকের নিজস্ব কর্ম ও পেশাকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাই সকলকে অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ শিশুগণ সকলে শিক্ষিত না হলে, তারা মূর্খ থেকে গেলে, আবার তাদের শিক্ষিত করার প্রয়োজনে গণশিক্ষা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সকল শিশু শিক্ষিত হলে এমন একদিন আসবে যখন আর গণশিক্ষার প্রয়োজন হবে না। সেজন্য তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি জানতেন, জাতীয় চেতনা সৃষ্টির প্রয়োজনে গণশিক্ষা বা সার্বজনীন শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। একবার কোনো পরিবার বা পরিবারের সদস্য শিক্ষিত হলে সে পরিবারে পরবর্তীকালে আর কেউ মূর্খ থাকবে না— তা তিনি জানতেন। দৈনিক দিনকাল পত্রিকায় (২৯/১০/৯৮) বলা হয়, "সার্বজনীন শিক্ষাই শুধু পারে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে সংকীর্ণ ক্ষমতা কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত করতে এবং ক্ষমতা কেন্দ্রের বলদর্পী মানসিকতা পাল্টাতে।" শহীদ জিয়া সমগ্রদেশের লোকদের অতি অল্পসময়ের মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় শিক্ষিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। "গণশিক্ষা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের শিক্ষিত জনশক্তিকে ব্যবহার করে স্বল্প সময়ের মধ্যে সকলকে অক্ষরজ্ঞান দান।" এজন্য জিয়াউর রহমান গণশিক্ষাকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয় প্রত্যেক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের একজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে অক্ষরদান করলে সে সেই জাতীয় পরীক্ষায় পাসের উপযুক্ত হবে এবং এ বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। তিনি এ জন্য ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও শিক্ষিত লোকদের এ কাজে নিয়োগ করেন। আর এ গণশিক্ষার জন্য প্রাথমিক স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, মাধ্যমিক স্কুল ও নাইট স্কুলে তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ফলে নিরক্ষরতার হার কমতে থাকে। জিয়া ২১-শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভাষা দিবসে গণশিক্ষা কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন এবং তাঁরই পথ ধরে খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির প্রবর্তন ও নারী শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা করেন খালেদা। তিনি ১৯৮০ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিতে গোপালগঞ্জের 'সাতপাড়' গ্রামে বিপ্লবের ২য় পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান শুরু করেন।

এ ছাড়া ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও করেন জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানকে নিয়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এককথায় গণশিক্ষা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষাসহ উচ্চ শিক্ষার মানবৃদ্ধি ও প্রসারের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন জিয়া। জিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে মানবতাবোধ, মানবকল্যাণ, সমাজকল্যাণ ও মানবসত্তার বিকাশে ধর্মীয় চেতনাজাত শিক্ষাকেও প্রাধান্য দান করেন। অপসংস্কৃতি ও অপশিক্ষার হাত থেকে সকল শিক্ষার্থীদের রক্ষার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। "আজকের বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুকে

www.nagorikpathagar.org

অক্ষর জ্ঞানদান বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হলে ভবিষ্যতে শিক্ষিত ও নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ সৃষ্টি হবে।" এ বিশ্বাস নিয়ে জিয়া শিক্ষাক্রম শুরু করেন।

৩. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা— আমাদের দেশে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে সেই হারে খাদ্য ও কার্য সংস্থানের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। জিয়ার পূর্বে এ পরিকল্পনা ধীর গতিতে চলছিল। তিনিই একে গতিশীল ও জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁর সময়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়। এজন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিবার পরিকল্পনা বা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ খুলে একজন পরিচালকের অধীনে তা ন্যস্ত করে তাকে কার্যকরী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি এজন্য জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়ে কর্মকর্তা ও প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কর্মী ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মী নিয়োগ করে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। তাঁর সময়ে পরিবার পরিকল্পনার ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণ সফলতার দিকে এগিয়ে যায় এবং জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি কমতে থাকে।

৪. স্বনির্ভর বাংলাদেশ— স্বনির্ভরতাই বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল সোপান এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে এক সফল কার্যক্রম। "শহীদ জিয়া উন্নয়নের রাজনীতি"তে বিশ্বাস করতেন। তিনি এও জানতেন, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য জিয়া তাঁর ধ্যানধারণায় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে হলে "সকল শ্রেণীর মানুষের জীবন থেকে শোষণ আর বঞ্চনার" কালিমা মুছে ফেলতে হবে এবং এভাবে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে— তা তাঁর চেতনা জুড়ে ছিল। এই চেতনা জিয়াকে সবসময় তাড়িত করত বলে তিনি তাঁর 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধের একস্থানে লিখেছেন, "শোষণমুক্ত সমাজ বলতে মূলতঃ বুঝায় ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা। একথা স্পষ্ট বুঝতে হবে যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি শোষণমুক্ত সমাজ—যেখানে থাকবে সমতা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার।.... (এজন্য) সমাজে সম্পদ ও সেবার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন হওয়া উচিত।"

গ্রামই হচ্ছে বাংলাদেশের মূল ভিত্তি। আমাদের দেশে গ্রামই উৎপাদন, অর্থ, শস্য, জনশক্তি, গবাদিপশু, হাসমুরগী ও মৎস্য পালন (চাষ), বন ও বৃক্ষ, কুটির শিল্প ইত্যাদি হতে আর্থিক আয় বৃদ্ধি ও জীবন ধারণ উপযোগী উপাদানসমূহের প্রধান যোগানদার, শহরে বৃহৎ শিল্প-কারখানা থাকলেও তার কাচামাল সরবরাহকারী স্থানই হচ্ছে এ গ্রাম। সেজন্য স্বনির্ভর বাংলদেশ গড়তে হলে গ্রাম ও গ্রামের মানুষদের উন্নয়নে যত্নবান হওয়া উচিত। সেজন্য স্বনির্ভর বাংলাদেশ জিয়া গড়তে চেয়েছেন এবং এ গড়ার পশ্চাৎভূমি হিসেবে গ্রামের উন্নয়নের উপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। সেকারণে তিনি "কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে উৎপাদনের রাজনীতি এবং কৃষির আধুনিকায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।"

গ্রামসরকার প্রতিষ্ঠাও স্বনির্ভর বাংলাদেশ সৃষ্টির এক গণমাধ্যমিক হাতিয়ার এবং সমাজ ও দেশ সেবার প্রাথমিক স্তর। সেজন্য জিয়া গ্রামসরকার প্রতিষ্ঠা করেন। খাদ্য-

www.nagorikpathagar.org

শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তিনি সেচপ্রকল্প হাতে নিয়ে খাল কাটা প্রকল্প চালু করেন এবং প্রায় ১২০০ খাল তাঁর আমলে খনন করা হয়। এর কারণে খাদ্যশস্য দ্বিগুণ হারে উৎপন্ন হতে থাকে। কুটির শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য কুটির শিল্প ঋণ প্রথা প্রবর্তন করে কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঋণদানের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া আখ, শাক, সবজী, ফল-মূল উৎপাদনের উপরও তিনি যেমন গুরুত্বারোপ করেন, তেমনি এর জন্য ঘরে ঘরে গমন করে মানুষকে উৎসাহিত করেন— এমন নানা কাহিনী জিয়াকে নিয়ে জড়িয়ে আছে। গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ইত্যাদি পালন, হাঁসমুরগী পালনের ব্যবস্থা ও মৎস্য চাষের জন্য তিনি শুধু উৎসাহদানই করেননি, তার জন্য তিনিই প্রথম জনগণকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে গ্রামের উন্নতি হতে থাকে এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। দেশের স্বনির্ভরতা অর্জনের পদক্ষেপ নেয়ায় তাঁর আমলে দেশের রপ্তানী আরও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৭২-'৭৩ সালে আওয়ামী শাসন আমলে দেশের রপ্তানী আয় ছিল ৬৬.২২ কোটি টাকা, যা ১৯৮০-'৮১তে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৩৪.৩৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। "১৯৭২-'৭৫ সময়ের সাড়ে তিন বছরে দেশের অর্থনীতি প্রায় পঙ্গু হয়ে" গিয়েছিল। "শহীদ জিয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের রুগ্ন অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে।" তলাবিহীন ঝুড়ির তলা মজবুত করে জিয়া তা পূর্ণ করে তোলেন। এমনিভাবে দেশ যখন অগ্রগতির পথে ধাবিত হতে থাকে তখনই স্বাধীনতার সফলতাকে ব্যর্থ করে দেয়ার মানসে জিয়াকে ১৯৮১-এর ৩০ মে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এভাবে স্বনির্ভর বাংলদেশ গড়ার প্রকল্প অর্ধপথেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে এবং ছাত্তার সাহেবের নিকট থেকে এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের পর সে তার গতিপথ হারিয়ে ফেলে। অতঃপর ১৯৯১ সালে, গণতন্ত্রের মশালবাহী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ক্ষমতায় আসার পর হারিয়ে যাওয়া উন্নয়নের পথকে ১৯ দফার আলোকে মুক্ত করে আবার দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। দেশনেত্রী বেগম খালেদার শাসনামলের প্রথম দু'বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয় এবং "শহীদ জিয়ার উন্নয়নের ধারা বেগম জিয়ার আমলে আরো গতি পেয়েছে।"

অতএব এ কথা স্বীকার করতেই হয়, জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, শ্রেষ্ঠ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, কূট-কুশলী, পররাষ্ট্রনীতিবিদ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপকার, একদলীয় বাকশাল পরবর্তী বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, দেশ ও সমাজ উন্নয়নের অগ্রসেনা, সার্বজনীন গণশিক্ষা প্রবর্তনের এক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও স্বধর্ম পালনে উৎসাহ দানকারী একজন সমাজ সংস্কারক, একজন অর্থনীতিবিদের মত অর্থ সম্পর্কে পরামর্শদানকারী ব্যক্তিত্ব, একজন সফল রাজনীতিবিদ রাষ্ট্রনায়ক ও অর্থনৈতিক সংস্কারক। আমরা জানি, জিয়ার দলীয় কর্মসূচি ১৯ দফার আলোকে সরকারের দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। ১৯৭৮ সাল থেকে তা কার্যকরী হয়, পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে তা লিপিবদ্ধ আছে। এ দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জিয়াউর রহমান উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরনির্ভরশীলতা কমাতে চেয়েছিলেন। এছাড়া উন্নয়নের হার বাড়ানো, জনসংখ্যা পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে কমিয়ে আনা, আয়ের সুসম বন্টন এবং এ উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এ সবের মধ্যে ছিল

www.nagorikpathagar.org

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় ক্ষমতার সামঞ্জস্য বিধান ও তা ক্ষমতার আয়ত্তে রাখার ব্যবস্থা, জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা, রপ্তানী আয় বৃদ্ধি এবং আমদানী কমিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিল্পজাত পণ্যের মান উন্নয়ন এবং এ লক্ষ্যে ঋণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। দেশের বা বিদেশ হতে আমদানীকৃত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থাই ছিল জিয়ার স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার এক বৃহৎ পরিকল্পনা, একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃষি, বন ও ফলজ বাগান উন্নয়ন তথা সবুজ বিপ্লবের প্রয়োজনে জিয়া খাল খনন ও বৃক্ষরোপণে অগ্রাধিকার দান করেন। ১৯৭৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর স্বনির্ভর বাংলাদেশ কর্মসূচির সূচনা হয় এবং "ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে' রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে স্বনির্ভর বাংলাদেশ আন্দোলন গড়ে ওঠে। জিয়ার ১৯ দফা ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনের চেতনা থেকেই প্রফেসর ড. ইউনূস "গ্রামীণ ব্যাংক" প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়িত হয়।

৫. গ্রামসরকার গঠন— জিয়ার গ্রামসরকার গঠন একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। গ্রাম সরকার গঠন সম্পর্কে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধে জিয়াউর রহমান তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যার উপর নির্ভর করেই গ্রামসরকার গঠনের পরিকল্পনা নেয়া হয়। তিনি বলেন, "আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মানুষের প্রতিভা ও নিজস্ব ক্ষমতার পূর্ণসদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা। সেজন্য জনগণকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইউনিটে সুসংগঠিত করা এবং সর্বনিম্ন গ্রাম পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য বহুদলীয় গণতন্ত্রের ধারণাকে কাজে লাগান। এজন্য আমাদের দলকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে সুসংগঠিত করে ধাপে ধাপে উপরে আসতে হবে।"

জিয়া বি. এন. পি.-কে গ্রামসরকার গঠন ও বাস্তবায়নে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য একথা বললেও, প্রত্যেক দলীয় সরকার জিয়ার এ আদর্শকে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়া সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে জিয়ার অবদানকে স্বীকার করে নিয়ে অগ্রসর হলে জনগণ আরো উৎসাহিত হবে। কিন্তু আমাদের দেশের অন্যান্য সরকার বা দলের সে উদারতা আছে বলে আমার মনে হয় না।

গ্রাম-বাংলার উন্নয়নের পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করেই জিয়া গ্রামসরকার গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উৎস হিসেবে গ্রাম-বাংলাকে চিহ্নিত করেন। তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই গ্রামীণ অর্থনীতি বা শিকড়স্পর্শী অর্থনীতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এসব কারণে জিয়ার অনুপ্রেরণাতেই গ্রামসরকার গঠন ও তা আইন গ্রাহ্য করার বিধান রাখা হয়। এছাড়া তাঁর নির্দেশেই ভিডিপি, যুব-কোঅপারেটিভ কমপ্লেক্স গঠন ও তার কার্যক্রম শুরু হয়। তাঁরই সৃষ্ট পল্লী উন্নয়নবোর্ড কয়েকটি স্থানে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। এর আওতাধীন ছিল সেচ ব্যবস্থা, খাল খনন, মৎস্য চাষ ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি। কৃষক, কুটিরশিল্পের উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও পশু-পাখী পালনের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করণ। সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জিয়া "তাঁর উৎপাদনের এ রাজনীতি সারা বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার এক ব্যাপক বিশাল কর্মসূচি

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণ করেন।" সেজন্য "বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামকে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য তিনি ব্যাপকভিত্তিক একটি গ্রামসরকার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি প্রতিটি গ্রামকে গ্রামে বসবাসরত সকল শ্রেণীর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সরকার কাঠামো দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন।"

জিয়ার চিন্তা ছিল গ্রামের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও উন্নয়নের জন্য যদি সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে একটি অভিজ্ঞ, দক্ষ কার্যক্রমের স্থিতিশীল গ্রামসরকার গঠন করা যায়, তাহলে তারই ভিত্তিতে কেন্দ্রে একটি সক্ষম, শক্তিশালী স্থিতিশীল কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা সম্ভব হবে। "বাংলাদেশের মানুষগুলো জিয়ার সেই আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশ গড়ার নতুন সংগ্রামে।"

এ গ্রামসরকারই পরবর্তীকালে বিভিন্ন সরকারের সময় ভিন্ননামে খ্যাত হয়েছে। প্রথম প্রতিষ্ঠাকারীর এ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে এলে তাদের রাজনীতি শেষ হয়ে যাবে, সে কারণে তার মৌল প্রেরণা ঠিক রেখে তার নাম বদলের পালা শুরু হয়। তবু এ কথা বলতে হয় : জিয়া যে কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, পরবর্তী সরকার তাকে তেমন আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। ফলে তা এখন স্থবিরতার অন্ধকারে তলিয়ে যেতে বসেছে। ১৯৮০-তে প্রতিষ্ঠিত জিয়াউর রহমানের "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" ১৯৮৯ সালে এসে এরশাদের আমলে তা "পল্লীপরিষদ" আইনে রূপান্তরিত হয়। ১৯৯৭ সালে এসে হাসিনা সরকার আবার তার চেহারা পাল্টে নাম রেখেছে "গ্রাম পরিষদ"। তবে জিয়ার প্রতিষ্ঠিত "স্বনির্ভর গ্রামসরকার "গঠনপ্রণালীতে যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হতো, গণতন্ত্রের সেই নিরপেক্ষতা পরবর্তীকালে আর ছিল না এবং হাসিনার আমলে এসে আর সব কিছুর মত একেও দলীয়করণ করা হয়েছে এর গঠনে, কার্যক্রমে ও অন্য দলমতকে নিশ্চিহ্ন করার মানসে। ফলে এ সরকার বা পরিষদ তার নিরপেক্ষতা ও উন্নয়নের চেতনা হারিয়েছে ও মানুষের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কারণ হাসিনা এ পরিষদে নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে মনোনয়ন দানের ব্যবস্থা দলীয়করণের জন্যই করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলতে হয়, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে খালেদা আরো উদারতার পরিচয় দিয়ে তাকে আরো স্বাধীনতা দান করেছেন এবং এ সব সংস্থায় মহিলা সদস্য রাখার বিধান খালেদাই প্রথম চালু করেন— যা এখনও বহাল আছে, এটি তাঁরই অবদান। স্থানীয় সরকার কমিশন যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাতে কমিশন লেখেন, "১৯৯১ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপিত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১০-এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারে মহিলাদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেয়ার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করা হয়েছে।" কমিশন রিপোর্ট।

বড় বড় ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট ধনিক সম্প্রদায় এ গ্রামসরকারকে নানা কারণে সহ্য করতে পারেননি। তার প্রধান কারণ হল কার্যপ্রণালী বিভক্ত ও গ্রামমুখী হওয়ার কারণে এবং বহু জনগোষ্ঠী এ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণে আর্থিকভাবে সমর্থ হবে বলে তাঁরা এর বিরোধিতা করেন। কিন্তু জিয়া তাঁদের এ ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তাই, "জিয়া আজ বেঁচে থাকলে যেখানে অন্ততপক্ষে বেশির ভাগ গ্রাম সমৃদ্ধিশালী হয়ে গড়ে উঠতে পারত এবং যার লক্ষণ ও প্রমাণ দেখা দিয়েছিল, তা জিয়ার মৃত্যুর পরপরই স্তব্ধ

www.nagorikpathagar.org

হয়ে যায়।" পরিশেষে বলি, প্রেসিডেন্ট জিয়ার মত সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন ত্যাগী, পরিশ্রমী ও দেশপ্রেমিক নেতার আজ বড় প্রয়োজন, যিনি চক্রান্তকারীদের সকল জাল ছিন্ন করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আশার কথা, সে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছেন স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বি. এন. পি.-এর চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর হাতকে শক্তিশালী করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

৬. খাল কাটা প্রকল্প— স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার মৌল উপাদান হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। সেজন্য খাল কাটা প্রকল্পকে তিনি খুবই গুরুত্ব দান করেছেন। জিয়া স্পষ্ট অনুধাবন করেছেন, গ্রাম-বাংলার সমৃদ্ধির উপরই দেশের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। সেজন্য ভারী শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচামাল গ্রামের ভূমি থেকেই সংগ্রহ করতে হবে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে ফসলের দ্বিগুণ উৎপাদন করতে হবে। বনজ সম্পদ বৃদ্ধিসহ যে কোন কাজে পানি সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে এ দেশের পদ্মা একটি মরা নদীতে পরিণত হয়েছে। ভারত এদেশ মুখী প্রায় সব কটি নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছে, ন্যায্য পানির হিস্যা থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। কাজেই সেচপ্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য খাল কাটা অত্যন্ত দরকার। সেজন্য জিয়া খাল কাটাকে গুরুত্বদান করেছেন অনেক বেশি। বিরোধী দল ব্যঙ্গ করে বলত খাল কেটে কুমীর আনা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের চৌদ্দপুরুষ কেউ কোনদিন খালে কুমীর দেখেনি—কারণ খালের পাশের জমিগুলো সাধারণতঃ গরীব চাষী ও ভাগী চাষীদের। পদ্মার পানি প্রবাহের পথ বন্ধ হওয়ার কারণে খাল কাটা ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। খাল কাটার ফলে এদেশের ফলন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। জিয়া নিজেই বহু খাল কাটায় হাতে কোদাল নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। সেজন্য খাল কাটা কার্যক্রম একটি সামাজিক বিপ্লবে পরিণত হয়। শত শত, হাজার হাজার লোক বিনা পারিশ্রমিকে এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। খাল কাটা এলাকায় আনন্দমেলার সৃষ্টি হয়। ফলে এদেশে ১২০০ টি খাল খনন সম্পন্ন হয় এবং জিয়া নিজে থেকে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে ১১০ টিরও বেশি খাল খনন প্রকল্প বাস্তবায়িত করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া সেচ কর্মসূচি সম্প্রসারিত করার অভিপ্রায় খাল কাটা বা খাল খনন প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন। তিনি নিজে থেকে এবং তাঁর দলীয় নেতাকর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় এদেশে প্রায় ১২০০ খাল খনন করা হয়। ফলে সেচের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে এবং খাদ্যশস্য তথা বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। একটি পরিসংখ্যান থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। "৭৩—৭৪-এ যেখানে ৩৫ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৭২ একর জমি সেচের আওতায় ছিল, তা ৮০—৮১ সনে ১.২ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪২ লক্ষ ৬৪ হাজার একরে উন্নীত হয়। হেক্টর প্রতি প্রধান প্রধান কৃষি দ্রব্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। ৭৪—৭৫ অর্থবছরে ধান, গম ও পাটের হেক্টর প্রতি উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১.১; ০.৯; ৬.১ মেট্রিক টন। জিয়াউর রহমানের প্রচেষ্টায় ১৯৮০—'৮১ সনে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ধানের ক্ষেত্রে ১.১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.৩; গম ০.৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.৮ আর পাট ৬.১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৮ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়।" অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যও সেই হারে বা তার চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পায়।

www.nagorikpathagar.org

৭. জিয়ার পররাষ্ট্রনীতি ও সার্ক সম্মেলন— বৃহৎ ভারত বাংলাদেশের প্রায় চারদিক বেষ্টন করে আছে। বৃহৎ রাষ্ট্রের এ বেষ্টনীর মাঝে ছোট্ট বাংলাদেশ স্বাভাবিক নিয়মে চলতে পারে না। সে কারণে একটি ভীতি নিয়ে বাস করতে হয় আমাদের। তাছাড়া তাদের আগ্রাসী আচরণ আমাদের আরো বেশি তটস্থ করে তোলে। দুই রাষ্ট্র সার্বভৌমত্বের দিক থেকে সমান হওয়া সত্ত্বেও, ভারতের বিগব্রাদারসুলভ আচরণ, এ ভীতির কারণকে আরো বদ্ধমূল করে দিয়েছে। আমরা জানি, ভারত ও বাংলাদেশ দুটিই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র, সে কারণে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্টেট টু স্টেট বা রাষ্ট্রের প্রতি রাষ্ট্রের যে সম্পর্ক, তা বজায় রাখলে কোন অসুবিধাই হত না। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে সম্পর্ক তা স্টেট টু স্টেট না হয়ে হয়েছে তাদের স্বার্থে এবং এদেশের কোনো একটি দলের কারণে স্টেট টু পার্টি, কখনওবা স্টেট টু গভর্ণমেন্ট, আবার গভর্ণমেন্ট টু গভর্ণমেন্ট রিলেশন্স। এটি বাংলাদেশের জন্য অসম্মানজনক, তা সকলেই জানেন। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের সময়ে এবং এখনও তারা ভারতের সঙ্গে নতজানু সম্পর্ক রাখেন ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতজানু সম্পর্ক স্থাপন করার কারণে জনগণের ভারত বিরোধী-মনোভাব তীব্ররূপ লাভ করেছে। আর এ কারণে রাষ্ট্রপতি জিয়া সমান মর্যাদা নিয়ে সম অবস্থান ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসী। সেই আলোকেই জিয়া পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেন। তার সঙ্গে তিনি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতারও সূত্রপাত করেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে এবং সকলে সমঅধিকার নিয়ে মিলেমিশে অর্থাৎ 'স্টেট টু স্টেট রিলেশন'-এর পথ ধরে বেঁচে থাকার একটি সার্বজনীন পন্থার নির্দেশ দেন। অবশ্য হাসিনা সরকারের আমলে এবং ভারতের অনাগ্রহের কারণে তা এখনও অকার্যকর হয়ে পড়েছে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপকে বাদ দিয়ে ভারত চাইছে, "দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ" গড়তে। এতে থাকবে ভারত, নেপাল, ভূটান ও বাংলাদেশ। এ ব্যবস্থা হাসিনা সরকার ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ মানলেও জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ উন্নয়ন চতুর্ভুজের কারণে আমরা ভারতের প্রভাব বলয় থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারব না। যেমন— নেপাল-ভূটান পারেনি। কিন্তু দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থা (যা জিয়ার প্রচেষ্টায় গঠিত) (South Asian Association for Regional Co-Operation-SAARC) মূলত অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক সংস্থা হলেও ভারত, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভূটান ও বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত হওয়ার কারণে, সকল বিষয় নিয়ে আলোচনার দ্বারা সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারব। এর ফলে প্রভাব বলয় বহির্ভূত থেকে এতে ক্ষমতার বা সহযোগিতার ভারসাম্যও রক্ষা করতে পারব—যা চতুর্ভুজের দ্বারা সম্ভব হবে না। চতুর্ভুজে ভারতের বেশি লাভ হবে। এতে তাদের আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার সহজ হবে বলে সার্ককে অকার্যকর করে দিয়ে চতুর্ভুজ উন্নয়ন কর্মকে উৎসাহিত করছে ভারত— যা আওয়ামী লীগ ব্যতীত বি. এন. পি. বা জনগণ মানেনি। ডিপ্লোম্যাট জিয়া এ কারণে সার্ক গঠনের প্রথমে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন। "জিয়াউর রহমান বুঝেছিলেন, প্রতিবেশী ভারতের বিরাটত্ব ও আগ্রাসী চেতনা এবং ফারাক্কাসহ নানাভাবে আমাদের দেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার চেষ্টা চলছিল। ফারাক্কার কারণে দেশ

www.nagorikpathagar.org

মরুভূমি হতে চলেছে— এসব কারণে জিয়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে এ বিষয়ে দেন-দরবার করেন, এতে ভারতের ও এদেশেরও কারো কারো গাত্র দাহ হয়। এ দেশের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে, "১৯৭৬ সালে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র মণ্ডলীর সভায়, এমনকি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩১তম অধিবেশনে উত্থাপন করে বিশ্ব জনমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। শেষপর্যন্ত তাঁকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়।" অতঃপর বৃটেনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে জিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী (তৎকালীন)-এর সঙ্গে আলোচনা করে কিছুটা সমস্যার সমাধানে আসেন। "১৯৭৭ সালের নভেম্বরে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং বাংলাদেশের বিপথগামীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়।" এসব দেখে শুনে জিয়া বোঝেন : বাংলাদেশের স্বার্থে ভারতের পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তি বা রাষ্ট্রগুলো যারা ভারতের চারদিকে অবস্থান করছে, তাদের নিয়ে গঠনমূলক কার্যক্রমের জন্য একত্র হওয়া উচিত। ফলে স্টেট টু স্টেট-এর যে স্ট্যাটাস, তা বজায় থাকেবে। সেজন্য তিনি সার্ক (SAARC) সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন বা দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক ঐক্যজোট গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু ভারতের উৎসাহহীনতার কারণে তা আজও শক্তিশালী হতে পারেনি। কারণ ভারত নিজের স্বার্থে এ ধরনের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক জোট করতে তেমন উৎসাহ বোধ করছে না। অথচ সার্ক সংগঠনকে শক্তিশালী ও সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা উচিত। আমরা বন্ধুর মত সকলের সঙ্গে বাঁচতে চাই সমান অধিকার নিয়ে।

"বাংলাদেশের আকাশচুম্বী 'স্পর্ধা' কোনোদিন ভারতের বলদৃপ্ত আচরণকে মানেনি। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো চেয়েছে ভারতকে বন্ধু হিসেবে। চেয়েছে মহান প্রতিবেশী হিসেবে। কোনোদিন চায়নি 'বিগ ব্রাদার' বা 'অভিভাবক'-রূপে। তাই এসব রাষ্ট্র একদিকে যেমন চেয়েছে ভারতের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে, অন্যদিকে তেমনি চেয়েছে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে।" আমাদের পররাষ্ট্রনীতি সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও জোটনিরপেক্ষতা এবং সে কারণে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করেই ভারত ও সকলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় বাংলাদেশ। জিয়া সে পথেই অগ্রসর হয়েছেন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে।

জিয়া একবার বলেছিলেন, আলোচনার এক পর্যায়ে, "বাংলাদেশ হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা এশিয়ার সঙ্গে সেতুবন্ধন।... তিনি মার্কিন অধ্যাপক মাকুর্স ফ্রান্ডারকে একবার বলেছিলেন, 'আমাদের নিয়মে (ইসলামী ভাবাদর্শে) এটা করেছি' (অর্থাৎ শোষণমুক্ত সমাজ) রাশিয়াতে তারা যেভাবে তা কায়েম করেছে, তা আমাদের এখানে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।" অবশ্য জিয়ার এ আদর্শিক ধারায় শোষণমুক্ত সমাজের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পাকিস্তানের শোষণের কারণে আন্দোলন করা হচ্ছিল। আর এ আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। যিনি প্রাচ্যের বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আবুজর গিফারী নামে খ্যাত। এই ধারাবাহিকতার সফল বাস্তবায়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, জিয়া তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেজন্য "জিয়াউর রহমান বৈদেশিক নীতি' প্রবন্ধে ড. তারেক শামসুর রহমান বলেন, "ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধ, ধর্মীয় চেতনা ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে ইসলামী বিশ্বের সম্পর্ক অনেক পুরানো। এক সময় ছিল তখন বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য

www.nagorikpathagar.org

সুফী সাধকরা ট্রাডিশনাল মুসলিম দেশগুলো থেকে আমাদের দেশে এসেছিলেন। এসব আউলিয়া, পীর, দরবেশদের অনেকেই এদেশে স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কের ইতিহাস হাজার বছরের পুরানো।" কাজেই ইসলামী দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিই জিয়ার পররাষ্ট্রনীতির মূল আদর্শ ছিল এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে স্টেট টু স্টেট সম্পর্ক রাখার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

জিয়াই প্রথম আমাদের দেশের সজীবতা বিনষ্টকারী কর্মের বিরুদ্ধে তথা আন্তর্জাতিক নদীতে ভারতের ফারাক্কা ব্যারাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ হেতু আন্তর্জাতিক ফোরামে তা তুলে ধরেন এবং ভাসানীর ফারাক্কা চলো মিছিলকে উৎসাহিত করেন। ড. রহমান বলেন "১৯৭৬ সালের মে মাসে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ৪২ জাতি শীর্ষক ইসলামিক পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশ ফারাক্কা প্রশ্ন উত্থাপন করে। প্রেসিডেন্ট জিয়া সেদিন ব্যক্তিগতভাবে ফারাক্কা সমস্যা উত্থাপন করেছিলেন। একই বছরের আগস্ট মাসে কলম্বোতে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ ফারাক্কা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল এবং ন্যাম সদস্যদের সহানুভূতি আদায় করতে সমর্থ হয়েছিল। পরে বাংলাদেশ জাতিসংঘের (খালেদা জিয়া এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন) ৩১তম সাধারণ অধিবেশনে প্রশ্নটি উত্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার এ ভূমিকার মধ্য দিয়ে তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি অবিচল থাকা ও দেশপ্রেমের একটি ছবি ফুটে উঠে।" কিন্তু হাসিনা গ্যারান্টি ক্লোজ ছাড়াই ফারাক্কা চুক্তি করায় নতজানু বা পরাভূত পররাষ্ট্রনীতির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু জিয়ার সঙ্গে ভারতের যে ফারাক্কা চুক্তি হয়, তাকে অনেক রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিক 'ভারতের কুটনৈতিক পরাজয়' নামে অভিহিত করেছেন।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় এবং এদেশে স্বাধীনতাযুদ্ধে নিরপেক্ষ থেকেও কিছু বুদ্ধিজীবী ও লেখক বি. এন. পি.-তে যোগ দিয়েছেন, এদেশের নাগরিক হিসেবে তাঁদের গ্রহণও নীতিসম্মত। আওয়ামী লীগও তা করছেন, এমনকি স্বাধীনতা বিরোধীদেরও নিচ্ছেন, তবে তাঁদের মুক্তিযোদ্ধার লেবাস পরিয়ে নেয়া হচ্ছে, এত বড় মিথ্যাচার আর হতে পারে না। অবশ্য তার কারণও আছে। শেখ মুজিব নিজেই স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান করে যদি মুক্তিযুদ্ধের নেতা বা ঘোষক হতে পারেন, তবে এরা পারবেন না কেন। ওদের সমর্থন না করলেই তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা না হয়ে রাজাকার। হাসিনার ইঙ্গিতে ঘাদানী বাতকুক্কুটের মত নড়ছেন। গোলাম আজম যখনই হাসিনার বগলে তখনই নীরব, আর বেরিয়ে আসলেই রাজাকার ঘাতক। খালেদা জিয়ার আমলে ঘাতক গোলাম আজমকে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে ফাঁসির আদেশ দেয়া হল— খালেদা জিয়া বেআইনী এ ব্যবস্থার কথা বলাতে খালেদাকে বিতর্কিত করা হল। খালেদা ন্যায় বিচারের প্রয়োজনে গোলাম আজমকে এ্যারেস্ট করে আদালতে সোপর্দ করলে তিনি জামিনে বেরিয়ে এলেন। পরে হাসিনর সঙ্গে মি. আজম যুক্ত হলে বাতকুক্কুট ঘাদানী একেবারে নীরব। বর্তমানে হাসিনার ইঙ্গিতে আবার সোচ্চার। কেন জোট বাঁধল খালেদার সঙ্গে এই তাঁর অপরাধ। তবে হাসিনাও বলেছেন, প্রচলিত আইনের বিচারেই তাঁকে শাস্তি দেয়া হবে। ঘাদানী কেন এ কথায় চুপ করে আছে বা উন্মুক্ত মঞ্চে শাস্তির আদেশ দিচ্ছে না, তাও আমরা জানি। পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে এ কথাগুলো বলা হল।

www.nagorikpathagar.org

পররাষ্ট্রনীতির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন। '৭৫ এর ১৫ আগস্টের পর চীন বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান করে এবং জিয়ার মধ্যস্থতায় সুসম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়। কাজেই চীন-বাংলাদেশ সুসম্পর্কের স্থপতি প্রেসিডেন্ট জিয়া। জিয়া প্রথম ১৯৭৭ সালের ২৩ জানুয়ারি (স্বাধীনতার পর) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে চীন সফরে যান। এ সফর মূলত বাংলাদেশের নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। ১৫ আগস্টে মুজিব সরকারের পতন হলে মুজিববাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ও মুজিব সরকারের সুবিধাভোগীদের ভারত স্থান দেয় এবং আগ্রাসী ভারত তাদের মাধ্যমেই এদেশের পতন ঘটানোর চেষ্টা করে। খালেদ মোশাররফের বিদ্রোহ ও ক্ষমতা দখল সেই কার্যক্রমের একটি অংশবিশেষ। ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে পানি প্রত্যাহার করে এদেশকে চাপের মুখে ঠেলে দেয় ভারত। এসব কারণে ভারতের আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে চীনের সমর্থন আদায় ও এদেশের সে আন্দোলনকে চীন যেন সমর্থন করে, সেজন্য কূটনৈতিক কারণে জিয়া চীনে যান এবং সফলতা অর্জন করেন। এখনও চীনের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখা দরকার, তানা হলে ব্যালান্স পাওয়ার হিসেবে টিকে থাকা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। জিয়া সেই কাজটিই করেছিলেন।

ফিলিস্তিনী সংগ্রামকে জিয়া সমর্থন করেন এবং বিশ্বের, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের জনগণের সঙ্গে এ নিয়ে তিনি অনেক দেনদরবারও করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলো নিয়ে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য তিনি সার্ক সম্মেলনের প্রথম প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু বর্তমানে ভারতের কারণে তা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ভারত তার পররাষ্ট্রনীতির কৌশল হিসেবে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপকে বাদ দিয়ে এবং তার একান্ত অনুগত দুই দেশ নেপাল ও ভূটানকে নিয়ে চতুর্ভুজ সংগঠন তৈরির প্রস্তাব দেয়। অর্থাৎ ভারত, নেপাল, ভূটান ও বাংলাদেশ নিয়ে চতুর্ভুজ গঠন করতে চায়, যা আমাদের গ্রহণ করা মোটেও সম্ভব নয়, হাসিনা নাকি একে সমর্থন করে বাংলাদেশকে নেপাল বানাতে চাচ্ছেন।

জিয়ার বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি দেশ-বিদেশে সমর্থন লাভ করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এতে বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধি পায় এবং বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। এতে করে মুজিবের আমলে যে সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল তার দ্বিগুণেরও বেশি আসে জিয়ার আমলে। জিয়ার বৈদেশিক নীতির সফলতার কারণে তা সম্ভব হয়।

শহীদ জিয়া একজন স্বাধীনতার ঘোষক, একজন সফল ও সার্থক মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, সফল রাষ্ট্রনায়ক, সার্থক কূটনীতিবিদ, বৈদেশিক নীতি প্রণয়নের এক সফলকাম নেতা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর কারণেই তলাবিহীন বাংলাদেশ সম্পদে ভরে ওঠে, বিদেশ নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, দেশ আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত হয়— পররাষ্ট্রের সঙ্গে স্টেট টু স্টেট স্ট্যাটাচ বজায় রাখতে সমর্থ হয়। তিনি একজন কিংবদন্তীর নায়ক, একজন প্রবাদ পুরুষ। তাঁর দৈহিক মৃত্যু আমাদের আহত করলেও, তাঁরই আলোকে আলোকোজ্জ্বল বাংলাদেশ প্রগতি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। হাসিনা–ভারতের পিছুটানও এ প্রগতির পথকে রুদ্ধ করতে পারবে না। কারণ এদেশের জনগণ যে জিয়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ, জিয়ার সেনা; অগ্রযাত্রার অগ্নিপুরুষ। এ জনতার অগ্রযাত্রাকে তাই রুদ্ধ করবে কোন্ শক্তি? কেউ পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

৮. অর্থনীতি ও শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব— জিয়ার অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় শিল্পের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির কারণে অর্থনীতি এ দেশে এক নতুন পথ পেয়েছে। এর ফলে এ দেশের শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যেমন উন্নতি সাধন হয়েছে, তেমনি রপ্তানি আয় বেড়েছে অনেক বেশি। এছাড়া এর ফলে বৈদেশিক সাহায্য এসেছে প্রায় দ্বিগুণ (পূর্বের চেয়ে)। স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রকল্প চালুর ফলে এ দেশের অর্থনীতিকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ জিয়া জানতেন, "সংস্কৃতি একটি জাতির প্রাণসত্তা আর অর্থনৈতিক উন্নয়নই কোন দেশের প্রকৃত পরিচয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, জীবন দর্শন এর কোনটিই অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। (অধ্যাপক হারুণ-অর রশীদ খান)"

জিয়াউর রহমান একজন স্বাধীনতার ঘোষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, "তাই দেশের উন্নয়নের পক্ষে তাঁর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।" তাঁর বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের, গণতন্ত্রের ও স্বাধীনতার ধারণা ও তার আলোকে আলোকপ্রাপ্ত দল বি. এন. পি. গঠন এবং ১৯ দফা কর্মসূচি জাতীয়তাবাদে ৭টি ধারা (ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) এবং সেই প্রেক্ষাপটে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনের কর্মসূচি গঠনের প্রত্যয়ে গ্রামসরকার গঠন, খাল কাটা প্রকল্প ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে একদিকে চাঙ্গা করেন তিনি এবং অপরদিকে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় অনেক বেশি। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, কৃষি, পশু-পাখি পালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপণসহ নানাবিধ কর্মসংস্থানের প্রকল্পগুলোতে ঋণ প্রদান করা হয়। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠে। তাছাড়া অধ্যাপক ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যা পরবর্তীকালে দেশবিদেশে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন—তা জিয়ার স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রকল্প, গ্রামসরকার ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রকল্প অধ্যাপক ইউনুসকে গ্রামীণ ব্যাংক সৃষ্টিতে প্রভাবিত করে এবং এ পরিকল্পনা সৃষ্টির দ্বার খুলে দেয়। "ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে" পরিণত করার জন্যই তিনি ১৯৭৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর স্বনির্ভর বাংলাদেশ কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার আন্দোলনের শুভসূচনা করেন। তার শান্তিপুর্ণ বিপ্লব হচ্ছে ১৯ দফা কর্মসূচি যার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

যে জাতি জ্ঞানে বড় সে জাতি মনে বড় ও ধনেও বড়। সে কারণে গণশিক্ষাকে জাতীয় প্রকল্প হিসেবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং ১৯৮০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তা গোপালগঞ্জে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। তিনিই প্রথমে যুব কমপ্লেক্স গঠন ও এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী বিষয়সমূহের উপর ট্রেনিং দান ও তাদের ঋণ দানের ব্যবস্থা করে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সুব্যবস্থা করে বেকার সমস্যা দূর এবং অর্থনীতিকে সার্বজনীনরূপে বিকশিত করেন। শিল্পে বেসরকারী খাতকে উৎসাহ দান এবং রপ্তানী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উৎসাহ দান করে শিল্প-কারখানার বিকাশ সাধন করেন। দেশী-বিদেশী পুঁজিকে শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থা করেন ও তাকে উৎসাহিত করার জন্য ছুটি, কর রেয়াত, রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ঋণ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। পোশাক শিল্প দেশে প্রসার লাভ করলে ও বৈদেশিক বাজার সৃষ্টিতে ও পোশাক শিল্পের প্রসার ঘটানোর প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন জিয়াউর রহমান। তারই প্রচেষ্টায় প্রথম জুয়েল পোশাক শিল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং বর্তমানে তার চূড়ান্ত রূপ লাভ করে বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হয়। তিনিই প্রথম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ৭টি দেশ নিয়ে সার্ক (SAARC) গঠনের পরিকল্পনা করেন, যা পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। জিয়া সরকারের আমলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে "পূঁজি বিনিয়োগ কর্পোরেশন" গঠন করা হয়। এর মাধ্যমে বিনিয়োগ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা, মূলধন গঠন ও মূলধন বাজারের উন্নয়নের পথ খুলে যায়। স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির উপর এক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লেখেন আনোয়ারুল করিম চৌধুরী। প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয়, "বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা"। এ প্রবন্ধে মি. চৌধুরী লিখেছেন, "আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে আহূত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একাদশতম বিশেষ অধিবেশনে বাংলাদেশ অত্যন্ত অর্থবহ ও বাস্তবধর্মী ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের পক্ষে এ অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট (জিয়াউর রহমান)। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে পারস্পরিক স্বার্থে একটি বাস্তব কর্মসূচির মাধ্যমে 'উত্তর' ও 'দক্ষিণ' উভয় শিবিরের দেশগুলোকে একত্র করার ক্ষেত্রে এ অধিবেশনে বাংলাদেশের বিশেষ ভূমিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।"

অধ্যাপক রশীদ খানের ভাষায় বলি, "একটি সমৃদ্ধদেশ এবং স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলাই ছিল জিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য।.... এ দেশের ভাগ্য বিড়ম্বিত বিপুল জনগোষ্ঠীকে একটি আলোকিত জীবনে পৌঁছে দিতে হলে চাই উন্নত জীবনবোধ এবং উন্নয়নের নিজস্ব মডেল।" জিয়া এদেশের সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, গ্রামীণ অর্থনীতি, স্বনির্ভর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তিনি মানুষের জন্য উন্নত জীবনবোধ ও উন্নয়নের আলোকে নিজস্ব অর্থনৈতিক মডেল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন—তাঁরই পথ ধরে আজ মুজিব আমলের তলাবিহীন ঝুড়ি তলাযুক্ত হয়ে ঝুড়ি অর্থনীতির আলোকে পূর্ণ হয়েছে— যার সুবিধা পরবর্তী সরকারগুলো ভোগ করলেও জিয়ার মত তার সঠিক ব্যবহার না করায় তা আবার ভাটার দিকে অগ্রসর হতে চলেছে, তবে বেগম জিয়ার সময় ১৯ দফা দলীয় কর্মসূচির আদর্শগত কারণে তা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তা আবার শেখ হাসিনার সময় অধোগতির পথে ধাবিত হচ্ছে। এ সরকারের পরিবর্তন ছাড়া এবং জিয়ার আদর্শের উত্তরসূরি ব্যতীত একে চাঙ্গা করা হয়ত সম্ভব হয়ে উঠবে না।

শান্তিপূর্ণ বৈপ্লবিক কর্মসূচি ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ—স্বনির্ভর বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমে যে পরিবর্তন ও উন্নয়নের বন্যায় দেশ প্রগতির দিকে এগিয়ে যায় এবং সর্বশ্রেণীর জনসমর্থন ও বি. এন. পি.-র নেতা-কর্মীর নিরলস পরিশ্রমে তা বাস্তবায়িত হয় এবং প্রেসিডেন্ট জিয়া নিজেই এ কর্মকাণ্ডে বিলীন হয়ে যান এবং ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করে এসব কর্মসূচীকে সার্থক করে তোলেন। আমরা এ নিয়ে আলোচনা করলাম এবং

www.nagorikpathagar.org

যেসব বিষয় নিয়ে এখনও আলোচনা করা হয়নি, তা কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে আভাসিত হলেও, আমরা তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। আলোচিত বিষয় ছাড়াও বিচার বিভাগকে স্বাধীনতা প্রদান, প্রশাসনিক সংস্কার, আইন সংস্কার, শ্রম আইন, জনশক্তির উন্নয়ন ও জনশক্তির ব্যবহার, জনশক্তিকে বিদেশে প্রেরণের মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থ উপার্জন, শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টা ও তাদের বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দান, ধর্মকে জীবনের সকলক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে স্বীকৃতি ও ব্যবহার এবং ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে সকলকে উৎসাহ দান ছিল জিয়ার ধর্মীয় মূল্যবোধের চেতনা। জিয়া খনিজ সম্পদ ও সকল প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান, আহরণ এবং এসব কর্মকাণ্ডে দক্ষ শ্রমিক ও দক্ষ কারিগরী জ্ঞানদানের ব্যবস্থা এবং সেসব সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য শিল্প-কারখানা, প্রযুক্তিগত প্রকল্প গ্রহণ ও তা রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উৎসাহিত করেন তিনি। অপসংস্কৃতিকে পরিহার করে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন ও জাতীয় প্রয়োজনে সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহিত করাই ছিল জিয়ার উদ্দেশ্য। গবেষণা সেল সৃষ্টির মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন— এসব কর্মকাণ্ডে জিয়া অকৃপণ হাতে অর্থ সরবরাহ করেছেন। এসব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জ্ঞান লাভ ও শিক্ষা লাভের প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টিতে উৎসাহিত করেন।

৯. স্বাস্থ্য ও বাসস্থান প্রকল্প— স্বাস্থ্য ও বাসস্থান প্রকল্পকেও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য থানায় থানায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিন্তাভাবনা জিয়ার আমল থেকেই শুরু হয় এবং এ নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প ও কমিটি গঠিত হয়। জিয়া সরকারের আমলে গ্রামে গ্রামে পল্লী চিকিৎসক তৈরি করা হল। থানায় প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসব পল্লী চিকিৎসক পল্লীরই শিক্ষিত অধিবাসী, স্বাস্থ্য সম্পর্কে ট্রেনিং এবং রোগ ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান এবং ঔষধ প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে পল্লীতে বসে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করে। গ্রামের গরীব লোকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা এসব চিকিৎসকের নিকট থেকেই গ্রহণ করতে থাকে। এতে স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ঘটে। সহজ রোগ ও সহজ রোগ প্রতিরোধে এরা অবদান রাখতে সক্ষম হয়। কঠিন রোগীকে তারা থানা বা জেলায় পাঠাত। ফলে চিকিৎসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কারণে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা কাজ সহজ হয়। জিয়ারই প্রচেষ্টায় ২৭ হাজার পল্লী চিকিৎসক তৈরি হল। পরবর্তী সরকার আসার পর এ গণমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থা, গণশিক্ষার বিপ্লব ও গ্রামসরকার বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্বনির্ভর বাংলাদেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয়— বলতে গেলে বন্ধ হয়ে যায়।

জিয়ার বৃহত্তর ও ব্যাপক জীবনকে এখানে অতি সংক্ষেপে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেছি। তবু তাঁর জীবনের বহুদিকই এ গ্রন্থে উপস্থাপন ও আলোচনা করা গেল না। তবে তাঁর জীবন নিয়ে, খালেদা জিয়াকে নিয়ে, বি. এন. পি ও বি. এন. পি.-র অগ্রসেনাদের নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনার এখনই সময়, তা না হলে ইতিহাসের গভীরে তা হয়ত হারিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, এ ইতিহাসকে বিকৃত ও লুপ্ত করার যে চক্রান্ত চলছে, তা থেকে তাদের বাচাতে হলে তার জন্য লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের এগিয়ে আসা উচিত এবং এসব বুদ্ধিজীবীদের সহায়তা করা উচিত বি. এন. পি. ও তার সপক্ষ

www.nagorikpathagar.org

শক্তিগুলোকে। একটি জাতির জন্ম যে কত পথ পরিক্রমার ফলে সার্থক হয় তাও আমাদের জানা দরকার। সেজন্য সঠিক ইতিহাসের আলোকে জাতিতত্ত্ব, জাতীয়তা, জাতীয়তার বিকাশ, জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে অগ্রসেনাদের ভূমিকা, ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, '৫৪ নির্বাচন, '৭০ নির্বাচন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধের পরবর্তীকালের ঘটনাবলী সঠিকভাবে চিত্রায়িত করা দরকার; তা না হলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিলাসী নেতা ও তাঁর সহচর যাঁরা মন্ত্রী হতে পারতেন, তাঁরা এ স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি বলে জাহির করছে এবং জিয়া, খালেদা জিয়া ও আমাদের মত নিবেদিত প্রাণ মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টায় রত আছে তাঁরা। বি. এন. পি.-র অনেক নেতা-কর্মীও নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি বা বি. এন. পি. যে মুক্তিযুদ্ধের রক্তসাগরে স্নাত দল তা বলতে লজ্জাবোধ করছে। এ চেতনার পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়ার আদর্শ ও তাঁর প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধের যে বিপ্লবী চেতনার কথা ব্যক্ত হয়েছে তারই আলোকে বি. এন. পি.-ই স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি— তা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে প্রমাণ করতে হবে। অপরদিকে তাজউদ্দীনের সমর্থকগণ ইতিহাসের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি এটি স্বীকার করলেও মুজিব ও হাসিনা এবং তাঁদের সমর্থিত আওয়ামী লীগ যে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি নয়, তার প্রমাণ দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকা, গ্রন্থাদি ও নানা সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে আছে সেসব উদ্ধার করে মুজিবকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার বিরোধী শিবিরে অবস্থানকারী হিসেবে প্রমাণ করতে হবে ন্যায় সঙ্গতভাবেই। কারণ ইতিহাসের সত্য কাউকে মিথ্যা আড়ম্বরের দ্বারা ছিনিয়ে নিতে দেয়া যাবে না। এজন্য বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা ও প্রচুর আর্থিক সহযোগিতা দান করতে হবে। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অগ্রসেনা আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এ দায়িত্ব দিয়ে আমরা তাঁর সহকর্মী হিসেবে কাজ করতে প্রস্তুত। তা না হলে তাঁদের মিথ্যা প্রচারের বন্যায় বি. এন. পি. দিশেহারা হয়ে পড়বে এবং দলীয় শক্তি হারিয়ে ফেলবে। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের দলের অনেকের নাক সিটকানি আমাকে ভীত করে তুলেছে। এসব প্রমাণ আমাদের হাতে প্রচুর আছে। এদিক থেকে দলের মধ্যের নেতা ড. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ওলি আহমদ, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাদেক হোসেন খোকা, ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম, কবির সাহেব, মীর শওকত আলীসহ অনেকেই, এখানে আরো নাম দেয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ফসল। জিয়া তার ঘোষক। বি. এন. পি. মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্নাত দল, এটি ভুললে জিয়া ও বি. এন. পি. এ দেশের ইতিহাস থেকে বিলীন হয়ে যাবে ইতিহাস বিকৃতির কারণে। বুদ্ধিজীবী এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারেন। আমি এখন ওলি আহমদের প্রবন্ধের আলোকে জিয়ার কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করলাম।

১। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতিকালীন সংগঠক জিয়া।

২। স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষক।

৩। যুদ্ধকালীন সময়ে পূর্বাঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠাকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা।

www.nagorikpathagar.org

৪। বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর তিন বিভাগীয় সেক্টরের এক বিভাগীয় সেক্টর 'জেড' ফোর্সের অধিনায়ক।

৫। সমরনায়ক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা।

৬। গণতন্ত্রের পূজারী ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা।

৭। জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক জিয়া।

৮। কুটনীতিবিদ জিয়া।

৯। রাজনীতিবিদ জিয়া।

১০। রাষ্ট্রনায়ক জিয়া।

১১। পররাষ্ট্রনীতিতে এদেশের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য সার্ক-এর জন্মদাতা জিয়া।

১২। বাংলাদেশের ক্ষমতা প্রদানকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে তা গ্রহণকারী জিয়া।

১৯৭৫ সালের ২৫-শে আগস্ট হতে ১৯৮১ সালের ৩০-শে মে পর্যন্ত জিয়ার উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহের তালিকা—

১। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী।

২। সংবিধানে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে সন্নিবেশকরণ।

৩। চতুর্থ সংশোধনী বাতিল ও বাকশাল আইন বাতিল।

৪। মুক্তিযুদ্ধের রক্তসাগরে স্নাত মুক্তিযুদ্ধজাত দল বি. এন. পি.-র প্রতিষ্ঠাতা।

৫। স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনের প্রবক্তা।

৬। দ্বিধা বিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা ও সমন্বয় সাধনকারী।

৭। আইন শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী, জাতিকে দিক-নির্দেশনা দানকারী, গ্রামগঞ্জে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী, খাল কাটা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী, গ্রামসরকার প্রতিষ্ঠাকারী ও প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণকারী এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনকারী।

৮। মাদ্রাসা শিক্ষার পূর্ণ মর্যাদা দান এবং সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা গ্রহণকারী এবং আলাদা মাদ্রাসা বোর্ড গঠনকারী।

৯। শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনয়নকারী এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য প্রয়াজনীয় অর্থ বরাদ্দকারী।

১০। গণশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষায় বিপ্লব সৃষ্টিকারী।

১১। মসজিদ, মন্দির, গীর্জার জন্য সরকারি বরাদ্দের ব্যবস্থা প্রদানকারী।

১২। ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে উৎসাহ দানকারী।

১৩। যুব কমপ্লেক্স সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণকারী।

১৪। সর্বস্তরের জনগণকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একতাবদ্ধ করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সকলকে জড়িত করার জন্য প্রক্রিয়া আরম্ভকারী।

১৫। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে পল্লী চিকিৎসক সৃষ্টিকারী।

১৬। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, গৃহায়ন ও কৃষিজ ফসল, খাদ্যশস্য এবং শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধিকারী।

১৭। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এদেশের জনগণকে নতুন দিক নির্দেশনা দানকারী।

www.nagorikpathagar.org

১৮। নিরপেক্ষ ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণকারী।

১৯। ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক সৃষ্টিকারী।

২০। মুজিব আমলের বিচার ব্যবস্থাকে শৃঙ্খলমুক্ত করে বিচার ব্যবস্থাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানকারী।

২১। শ্রমিক সংস্থা গঠনের মাধ্যমে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষাকারী।

২২। আইন ব্যবস্থাকে গণমুখী করার উদ্যোগ গ্রহণকারী।

২৩। দেশের আপামর জনসাধারণের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করার জন্য সকলকে প্রবর্তন দানকারী।

২৪। গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে দেশের সকলকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাজনৈতিক দল গঠনে উৎসাহ দানকারী।

২৫। সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানকারী।

২৬। প্রকাশনা শিল্পকে উৎসাহ দানকারী।

২৭। এদেশের সশস্ত্র বাহিনী, বি. ডি. আর., পুলিশ এবং আনসারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকারী।

২৮। গ্রামসরকার, খাল খনন প্রকল্প ও সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণকারী।

২৯। অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনয়নকারী।

৩০। শিশু একাডেমীসহ শিশুদের জন্য বিভিন্ন সংস্থা গঠন ও সংস্থা গঠনে উৎসাহ দানকারী।

৩১। দুর্নীতি দমনে কঠোর হস্তে ব্যবস্থা গ্রহণকারী।

৩২। জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের আলোকে দেশ পরিচালনাকারী।

৩৩। বলদীপ্ত ভঙ্গীতে ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সতর্ক অবস্থায় অবস্থানকারী।

৩৪। যে কোন সমস্যার মোকাবিলায় এগিয়ে আসার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত এমন মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন জিয়াউর রহমান।

তাই অধ্যাপক ড. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ভাষায় বলি, "জিয়াউর রহমানের ইতিহাস লুণ্ঠিত বাংলাদেশের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর ইতিহাস। ঐক্যবদ্ধ জাতির ইতিহাস। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠার ইতিহাস। দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেয়ার ইতিহাস—"সাবাশ বাংলাদেশ"।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে সিপাহী-জনতা বাংলাদেশের ক্ষমতার মসনদে বসান। তবু তিনি এ ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি কোনদিন। তিনি ক্ষমতায় এসেই লুপ্ত গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করেন। তিনি পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় বাকশাল প্রথাকে চিরতরে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেন। জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল জিয়া এবং মানুষের মত প্রকাশের ও সমালোচনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে একান্ত আগ্রহী জিয়া বোঝেন যে দেশের মঙ্গলের জন্য দেশের মতামত গ্রহণ এবং ইচ্ছামত যে কোন দলকে ভোট প্রদান নিশ্চিত করা না গেলে দেশ ও জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। সেজন্য পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি বাকশাল আইন বাতিল এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করেন। শুধু তাই নয়, গণতন্ত্র উচ্ছেদকারী দল আওয়ামী লীগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মালেক উকিলকে জিয়াউর রহমান আহ্বান করেন। ফলে

www.nagorikpathagar.org

আওয়ামী লীগসহ বহুদল আত্মপ্রকাশ করে। এমনকি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বাকশাল একটি বহুদলীয় গণতন্ত্রের একটি দল হিসেবে টিকে থাকে। পরবর্তীকালে আ: রাজ্জাক বাকশাল বিলোপ করে দিয়ে দলবলসহ আওয়ামী লীগে যোগ দেন। মুজিব-সৃষ্ট বাকশাল এবং বাকশাল গর্ভজাত '৭৫-পরবর্তী আওয়ামী লীগ তাই বাকশালী বা একদলীয় চেতনাকে ধারণ করে আছে। মুজিবকন্যা উত্তরাধিকারসূত্রে এ বাকশালী চেতনাকে লালন করে চলেছেন। সেজন্য দেশের জনগণ এঁদের কাছ থেকে কোন ভাল ফল আশা করতে পারে না। নিম গাছকে পরবর্তীকালে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, ওর নিকট থেকে ভাল ফল আশা করা বাতুলতা মাত্র। আওয়ামী লীগ, আওয়ামী বুদ্ধিজীবী এবং ঘাদানী একজাতিসত্তার পক্ষে সোচ্চার থেকে ভারতের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টির রামরাজ্য প্রতিষ্ঠাকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করে যখন বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোকে মৌলবাদী দল বলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেন এবং এসব দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন, তখন লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়। হিন্দু সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীকে গ্রহণের আকুল বাসনায় ইসলামী চেতনাকে মৌলবাদী বলার মত হীনমন্যতা এদেশের কিছু লোকই প্রকাশ করতে পারেন।

সে যাই হোক জিয়ার গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের ফলে বহু দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক জগতে প্রবেশের কারণে তিনিও একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রয়োজন বোধ করেন। সেজন্য দেশের মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ জনগণ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এবং ভারত বিরোধী অবস্থানকারী ও ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার প্রতি অনুগত জনগোষ্ঠী, রাজনৈতিক কর্মী, সমাজসেবক, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে প্রথমে জাগদল এবং জাগদল ভেঙ্গে দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি. এন. পি. (Bangladesh Nationalist Party) গঠন করেন এবং বি. এন. পি.-র কাউন্সিলরদের সর্বসম্মতিক্রমে বি. এন. পি.-র চেয়ারম্যান হন জিয়া। অতঃপর এর কয়েকটি অঙ্গসংগঠন, যথা— ছাত্রদল, যুবদল, শ্রমিক দল, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধাদল, কৃষক দল, সাংস্কৃতিক দল ইত্যাদি দল গঠিত হয়ে মূল দলকে সহযোগিতা করতে থাকে, অল্পদিনেই স্বাধীনতার ঘোষককে যেমন ৭ নভেম্বরে সিপাহী-জনতা বাংলাদেশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে নীত করেন; অতঃপর একই কারণে বি. এন. পি. অচিরেই সার্বজনীনভাবে দেশের সকল মহল থেকে সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। এটিও জিয়ার একটি গণতান্ত্রিক বিজয়, একথা বলা যায়। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে যারা স্বাধীনতা এনেছে তাদের ও সকলের সমর্থনপুষ্ট এ দলটি দেশের প্রয়োজনে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। গণভোটে এ দল বার বার বিজয়ী হয়েছে। জনগণ বাকশাল চেতনাপুষ্ট দলগুলোকে প্রত্যাখ্যান করছে। সেজন্য বি. এন. পি. মুক্তিযুদ্ধ স্নাত ও স্বাধীনতা অর্জনকারী নিবেদিতপ্রাণ জনগণের একান্ত আপন ও স্বাধীনতার সূর্যস্নানে দীপ্ত এক জাতীয়তাবাদী দল। একাত্তরের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বা অবস্থানকারী শেখ মুজিবের সমর্থনপুষ্ট আওয়ামী লীগকে যতই স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি হিসেবে রেডিও, টেলিভিশনে বা হাসিনা সরকারের প্রচার মাধ্যমগুলোতে ঘোষণা করুক না কেন, তা কখনই স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃতি পাবে না। পিতলকে সোনা বলে যতই চালিয়ে দেবার চেষ্টা করুন

www.nagorikpathagar.org

এবং সোনা বলে প্রচার করুন না কেন অথবা সোনা মনে করে সিন্ধুকে ভরে রাখুন, তা পিতলই। ঠগের পাল্লায় পড়ে হয়ত কিছু লোক ভুল করবে ও ঠকবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত তার স্বরূপ প্রকাশ পাবেই। যারা ভুল করবে তাদের তার জন্য খেসারত দিতেই হবে। সে কারণে আসল সোনা চিনে নিয়ে এগুতে হয়। সোনাকে যতই পিতল বলা হোক না কেন, সোনা সোনাই থাকে।

আমরা জানি, এক একটি যুগসন্ধিক্ষণে এক একটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ রাজত্বের সমাপ্তিলগ্নে ভারত ভেঙ্গে যে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল মুসলিম লীগের নেতৃত্বে। মুসলিম লীগের সেই নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন জিন্নাহর সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী, অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট, আবুল হাসিম ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল, আসাম প্রদেশের মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। এছাড়া ছিলেন এ্যাডভোকেট মনসুর, শামসুল হক, আতাউর রহমান খান, আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশসহ অনেকেই। স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই দেশ ও জাতির প্রয়োজনে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করতে হল এবং সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, আতাউর রহমান খানরা তখন মুসলিম লীগ দল ত্যাগ করে পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালে গঠিত হল। অতঃপর ১৯৫২ সালে পাকিস্তান মুসলিম লীগকে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নামে অভিহিত করা হল। এসবই রাজনৈতিক প্রয়োজনে করতে হল। এরা সকলেই পাকিস্তান সৃষ্টির সপক্ষ ব্যক্তি ছিলেন।

একই নিয়মে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। এ মুক্তিযুদ্ধে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। তবে '৭০-এর নির্বাচিত দল প্রধান মুজিবকে সম্মান করে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারপ্রধান করা হয়। অতঃপর আওয়ামী লীগের নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণের ইতিহাস আমাদের জানা আছে। আর সেই প্রেক্ষাপটেই আওয়ামী লীগের বিপ্লবী তরুণ বা রাজনৈতিক দল জাসদ বা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। মুসলিম লীগের বিপ্লবী নেতাগণ অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী যেমন তার পুরানো দল থেকে বেরিয়ে আওয়ামী লীগ গঠন করল, একই কায়দায় আওয়ামী লীগের বিপ্লবী তরুণরা অর্থাৎ আ. স. ম. আব্দুর রবেরা বেরিয়ে এসে জাসদ গঠন করলেন। এটিই হয়, এটিই করতে হয়। একই কায়দায় '৭৫ সালে মুজিবের বাকশাল গঠনের ফলে বিদ্রোহ, বিপ্লব, বিদ্রোহ আবার বিপ্লবের মাধ্যমে সিপাহী-জনতা খালেদ মোশাররফকে বিতাড়িত করে জিয়াকে ক্ষমতায় বসায়। তখন একই নিয়মে বিপ্লবী আওয়ামী লীগের সদস্য ও জাতীয় নেতা-কর্মী জিয়ার নেতৃত্বে বি. এন. পি. গঠন করে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, '৪৭- পরবর্তী আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগজাত এবং '৭১-পরবর্তী জাসদ আওয়ামী লীগজাত। কিন্তু '৭৫-পরবর্তী বি. এন. পি. আওয়ামী লীগ, অন্যান্য জাতীয় দল ও মুক্তিযোদ্ধাজাত। সেজন্য বি. এন. পি. বাংলাদেশের মানুষের চেতনাজাত দল। সেজন্য এ দলকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দাবী ছিল এদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, ভাষা আন্দোলন ও '৬৯ গণঅভ্যুত্থান এবং একাত্তরের গণজাগরণের ফলে দেশ যখন স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একাংশ

www.nagorikpathagar.org

স্বায়ত্তশাসনকে ভিত্তি করেই, এ দেশের রাজনৈতিক গতিধারাকে অক্ষুণ্ন রেখেই পাকিস্তানের প্রধান হওয়ার জন্য আলোচনা চালিয়ে যান। শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের এ রক্ষণশীল ধারার উত্তরপুরুষ। অপরদিকে আওয়ামী লীগের অন্য অংশ তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনের ধারাকে অতিক্রম করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। আমরা পরবর্তী ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তুলি। আমরা পরবর্তী ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম বলে স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে ৭-ই নভেম্বরের পটপরিবর্তনের পর, স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণে, জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করি। এটি ১৯৪৭-পরবর্তী কালের জাতীয় প্রয়োজনে রাষ্ট্রধর্ম পরিবর্তন ও রাষ্ট্রধর্মের সংকটের পরবর্তী কালে স্বাভাবিক নিয়মে যে সব দল পূর্ববর্তী দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন দল গঠন করে আসছে—বি. এন. পি.-ও সেই ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট, তবে এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এ দল মুক্তিযোদ্ধা, অন্য দল হতে আগত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব,সমাজসেবক, দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি, দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, অধ্যাপকসহ সব শ্রেণীর লোকজন নিয়ে গঠিত।

সেজন্য '৭৫ সালে সাংবিধানিক ক্যু-এর মাধ্যমে তৎকালীন আওয়ামী লীগের একাংশ নিয়ে যে বাকশাল গঠিত হয়ে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়, অতঃপর গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের ফলে জিয়ার সৃষ্ট বি. এন. পি.-তে তাদের দেখা যায় না, হঠাৎ যদি কাউকে দেখা যায় তাহলে দেখতে হবে বাকশাল বা আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পছন্দ না করার কারণে বা আদর্শবান লোক হেতু দল ও নেতৃত্ব কর্তৃক অবহেলার কারণে বিচ্যুত ব্যক্তি। জিয়া ১৯ দফার আলোকে জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করে যে জাতীয়তাবাদী দল বি. এন. পি. গঠন করেন– তারা জিয়ার জাতীয়তাবাদী, স্বাধীনতার ঘোষক, মুক্তিযুদ্ধের আগুনে পোড়া সোনা স্বরূপ এবং জিয়ার আদর্শে বিশ্বাসী এক একটি 'জিয়ার দলীয় সেনা'। এ সেনা সততার সহিত ও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে দেশ ও দলকে একটি সমুন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবেন সে বিশ্বাস এজন্য করতে পারি, এর পেছনে জিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে ১৯৬০ সাল হতে জিয়ার সকল কাজে সহায়তাকারী পরামর্শ দানকারী, সংকটকালে (মুক্তিযুদ্ধে, বিপ্লবে ও নানা কাজে) সহযোগিতা দানকারী স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আছেন। এ দল কলঙ্কহীন শুভ্র-সমুজ্জ্বল। এ দলকে কলুষিত করার জন্য আওয়ামী পুশইনের মাধ্যমে কেউ এসে আপাতত দলকে ম্লান করার চেষ্টা করলেও তারা টেকতে পারবে না, যেমন টেকেনি স্বপন, যেমন টেকেনি আলাউদ্দীন, যেমন টেকেনি আক্তার সাহেব।

তাই বলি, একাত্তরে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী, পাক-সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনাকারী ও তার সমর্থনপুষ্ট বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হাসিনা, তার মন্ত্রিসভা ও হাসিনা পরিচালিত আওয়ামী লীগ হতে বি. এন. পি.-র পার্থক্য অনেক, ব্যবধান আকাশ-পাতাল। এ. বি. এন. পি.-র কর্ণধার বি. এন. পি.-র সংগঠক ও প্রাক্তন চেয়ারপার্সন শহীদ জিয়াউর রহমানের সুখ-দুঃখের সাথী, বর্তমান বিরোধী দলীয় নেত্রী, স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর নেতৃত্বে বি. এন.

www.nagorikpathagar.org

পি.-কে এগিয়ে নিতে হবে, তবেই দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন, ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা এবং পরদেশীর লালসা-লোলুপ থাবা থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারব এবং তাদের এদেশীয় চরকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে। তানা হলে মুক্তিযুদ্ধের এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থানকারী শেখ মুজিবের উত্তরসূরি ও তাঁর সৃষ্ট বাকশাল আদর্শে বিশ্বাসী কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী (১৯৯৬—২০০০) শেখ হাসিনা ও তাঁর সমর্থনপুষ্ট ভারতের আগ্রাসী থাবা থেকে দেশ রক্ষা করা সুকঠিন হয়ে পড়বে এবং জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হবে না কোনো দিন।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জীবন ও তাঁর সৃষ্ট দল সম্পর্কে কি ধারণা তা এখানে তুলে ধরে, ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে বলতে চাই জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ব থেকে চট্টগ্রামে স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য নেতৃত্বদান এবং স্বাধীনতার ঘোষণাদান, নয় মাস মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন, জেড ফোর্সের ('৭১) অধিনায়ক ও '৭৫-এর ৭ নভেম্বর-পরবর্তী কার্যক্রম, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা; রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন ও বি. এন. পি. প্রতিষ্ঠাপর্ব সম্পর্কে জিয়ার নিজস্ব যে ধারণা তা তাঁর প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করব।

একটি জাতির জন্ম—জিয়াউর রহমান।

ঃ ঢাকানগরী প্রতিশোধ নিল জিন্নাহ ও তার অনুসারীদের নষ্টামির। .... পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের সপ্তাহ খানেক পরে একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, সেই দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলো সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা লিখতে। আমি একজন সৈনিক। আর লেখা একটা ঈশ্বরপ্রদত্ত শিল্প। সৈনিকেরা স্বভাবতই সেই বিরল শিল্প ক্ষমতার অধিকারী হয় না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ছিল এমনই আবেগধর্মী যে আমাকেও তখন কিছু লিখতে হয়েছিল। তখন কলম তুলে নিতে হয়েছিল হাতে। ... ১৯৫২ সালে মশাল জ্বললো। আন্দোলনের।... কেউ বলত (পাকিস্তানীর) ভেঙ্গে দাও শিরদাঁড়া। এদের থেকেই আমার তখন ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানীরা বাঙালিদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায়। ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হল নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের বিজয় রথের চাকার নিচে পিষ্ট হল মুসলিম লীগ। বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক যুক্তফ্রন্টের বিজয় কেতন উড়লো বাংলায়। ..... এ সময়েই একদিন কতকগুলো পাকিস্তানী ক্যাডেট (পাকিস্তানে) আমাদের জাতীয় নেতা ও জাতীয় বীরদের (সোহ্‌রাওয়ার্দী, ফজলুল হক, ভাসানী) গালাগাল করলো। আখ্যায়িত করলো তাঁদের বিশ্বাসঘাতক বলে। আমরা প্রতিবাদ করলাম। অবতীর্ণ হলাম তাদের সাথে এক উষ্ণতম কথা কাটাকাটিতে।... আইয়ুব খানের উন্নয়ন দশকে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতিকে বিকৃত করার। আমাদের জাতীয়তা খাটো করার। বাংলাদেশের বীর জনতা অবশ্য বীরত্বের সাথে প্রতিহত করেছে এ হীন চেষ্টা। এ ছিল এক পালাবদলের কাল। এখান থেকেই আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছে এক নতুন পথ। আমাদের বুদ্ধিজীবী মহল, ছাত্র-জনতা আর প্রচার মাধ্যমগুলো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য পালন করেছে এক বিরাট ভূমিকা। আমাদের দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতি

www.nagorikpathagar.org

জনগণ ও সৈনিকদের মনোভাবকে গড়ে তোলা আর আন্দোলনে দ্রুততর গতি সঞ্চারণে এদের রয়েছে এক বিরাট অবদান। জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার একমাত্র উপাদান হচ্ছে এর সংস্কৃতি। ... তাঁরা চাচ্ছিলেন, বাংলাদেশটাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করে রাখতে।... খেমখারাণ রণাঙ্গনে... আমাদের (জিয়ার) ব্যাটালিয়ন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল।... এসব কিছুতে পাকিস্তানীরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল।... তারা ঠিক করলো প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালিদের আনুপাতিক হার কমাতে হবে।... এসব কিছুই আমাকে ব্যথিত করতো। এ সামরিক একাডেমীতেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করল।... এ মামলার (আগড়তলার ষড়যন্ত্র মামলা) পরিণতি এক করে দিল বাঙালি সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকদের।.. এক কণ্ঠে (মিলিটারী-জনতা) সোচ্চার হল স্বাধীনতার দাবীতে। ... ময়মনসিংহের এক ভোজসভায় সে (কমান্ডার আ: কাইয়ুম (পাক) সেকেন্ড কমাণ্ডার জিয়া) ঘোষণা করল (১৯৬৯) 'বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে তাহলে সামরিক আইনের সত্যিকার ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তপাত। ... ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে (জার্মানী থেকে ট্রেনিং নিয়ে) আমাকে নিয়োগ করা হল চট্টগ্রামে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড।.... কমান্ডার। (পাক আর্মী) বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারীদের বাড়িগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারীদের ট্রেনিং দিচ্ছে। ক্যাপ্টেন সমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে, স্বাধীনতার জন্য আমি (জিয়া) তার নেতৃত্বে যদি অস্ত্র তুলে নেই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। ক্যাপটেন ওলি আহমদ আমাদের মাঝে এসব খবর আদান-প্রদান করতেন।... ৪ঠা মার্চে আমি ক্যাপটেন ওলি আহমদকে ডেকে নিই। আমাদের ছিল সেটা (গোপন পরামর্শের) প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, 'সশস্ত্র সংগ্রাম করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে'। আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপটেন ওলি আহমদ আমার সাথে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি। ... প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানী করা হল। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। ... ১৩ই মার্চ শুরু হল ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা। ... ১৭-ই মার্চ স্টেডিয়ামে ইবি আর সি'র লেফট্যান্যান্ট কর্ণেল এম. আর চৌধুরী, আমি, ক্যাপটেন ওলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লে: কর্ণেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে। দুদিন পর ই পি আর ক্যাপটেন আমার বাসায় গেলেন এবং ই পি আর বাহিনীকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। .... ২৫ ও ২৬-শে মার্চের মধ্যবর্তী কালোরাত।.... এ আদেশ (চট্টগ্রামে অস্ত্র খালাস আদেশ) পালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।.... আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হল। পথে ছিল ব্যারিকেড। এ সময় এল মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন ওলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায়

www.nagorikpathagar.org

হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বললো, 'তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে ওরা হত্যা করেছে।... এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমি বললাম, 'আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। ওলি আহমদকে বলো ব্যাটালিয়ন তৈরি রাখতে, আমি আসছি। ... তারা ছিল আট জন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলেছিল।..... বললাম আমি তোমাদের গ্রেফতার করলাম। ... অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্ণেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। জানালাম 'আমরা বিদ্রোহ করেছি।' শওকত আমার হাতে হাত মিলালো।.... ব্যাটালিয়নে ফিরে দেখলাম। সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লে: কর্ণেল এম আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারপর টেলিফোন করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম, 'ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, কমিশনার, ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আর্ম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা। ... সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও আর জোয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানত। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্ট চিত্তে এ আদেশ মেনে নিল, আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।.... তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬-শে মার্চ ১৯৭১ সাল। রক্তের অক্ষরে বাঙালিদের হৃদয়ে লেখা একটি দিন (এদিনে জিয়া বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন)। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এ দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালবাসবে। এ দিনটিকে তারা কোন্ দিন ভুলবে না কো-ন-দিন না। ঃ

আমাদের পথ— জিয়াউর রহমান।

ঃ রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার পেছনেও রয়েছে একটা ভিত্তি। এ ভিত্তিটা কি? অপরাপর বিরোধী রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক দর্শনকে যথার্থভাবে যুক্ত ও কর্মসূচিসহ মোকাবিলা করে স্বীয় জীবন বোধের আলোকে সমাজ ও জাতিকে গড়ে তোলা এবং কখনও কখনও পথভ্রষ্ট স্বেচ্ছাচারের কাছ থেকে বাঁচার তাগিদই হচ্ছে একটি রাজনৈতিক মতের পতাকাতলে সমবেত হবার মৌল কারণ। ...... বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটিতে অতীতে অনেক উত্থান-পতন ঘটে গেছে। হাজার হাজার বছরের পটপরিবর্তনের ইতিহাসকে বুকে ধারণ করে আছে বাংলাদেশ। .... বাংলাদেশের ছিল এক বিরাট স্ট্রাটেজিক অবস্থান এবং বলাবাহুল্য যে সেই অবস্থান আজও গুরুত্বপূর্ণই রয়ে গেছে। এ কারণেই বাংলাদেশের ভূখণ্ড এবং বঙ্গোপসাগরের জলরাশির উপর এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশ এবং পরাশক্তিগুলোর অশুভ দৃষ্টি রয়েছে, যা আমাদের জন্য

www.nagorikpathagar.org

মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। ..... আমরা খণ্ডিত চেতনায় বিশ্বাসী নই। তাই আমাদের জাতীয়তাবাদ হল সার্বিক ভিত্তিক। এ জাতীয়তাবাদের মধ্যে রয়েছে জাতিগত চেতনা, ভাষার ঐতিহ্য, ধর্মীয় অধিকার, আঞ্চলিক বোধ, অর্থনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের প্রচেষ্টা এবং সংগ্রামের উন্মাদনা। ... "ওয়ান পার্টি সিস্টেম এবং রেজিমেন্টেশেন ইন ফোর্স" করে যে সাফল্য অর্জন করা যায় না, নিকট অতীত তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাই জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশের জনগোষ্ঠীকে একটা পথে পরিচালিত করাই সর্বোত্তম পথ বলে আমি মনে করি।.....

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ— জিয়াউর রহমান।

ঃ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন শত শত বর্ষ ধরে এদেশের আপামর জনগণের অন্তরে চিরজাগরূক রয়েছে।... আমাদের মূল লক্ষ্য তথা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিমূলে রয়েছে যে শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন, তাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে, জনগণের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, একটি শোষণমুক্ত সমাজ যা অত্যন্ত বাস্তব ও প্রগতিশীল একটি সমাজ, যাতে থাকবে সমতা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায় বিচার। .... আমাদের মনে ধর্মের বিশেষ স্থান রয়েছে। আল্লাহতায়ালা— এক ও অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তালার প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ ও অবিচল বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে। সেজন্য প্রতিটি মানুষের তার নিজের ধর্ম পালনের পরিপূর্ণ অধিকার আমাদের কাছে স্বীকৃত সত্য। সর্বোপরি আমাদের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে একমাত্র আমরাই সর্বাধিক নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিলাম এবং এ অঞ্চলের অন্য কোনো দেশকে তার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে হয়নি। স্বাধীনতাযুদ্ধ আমাদের মধ্যে ত্যাগের, সার্বভৌমত্বের যে মহান প্রেরণায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে সে মহান চেতনা ও প্রেরণার ব্যাপারে কোন আপস নেই। যারা আমাদের দেশ ও জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং তাদের বিদেশী প্রভুদের ইঙ্গিতে পবিত্র ধর্মের নামে মিথ্যা প্রতারণা ও চক্রান্তের জাল বুনে বিদেশী প্রভুদের আদেশ মেনে কাজ করে তারা আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও তার জনগণের পরম শত্রু। কাজেই একথা বুঝতে হবে যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র ভাষাভিত্তিক বা ধর্মভিত্তিক কোনো দর্শন নয়। বস্তুতঃ বিভিন্ন উপাদান এ দর্শনের ভিত্তি এবং সেজন্য তা পূর্ণাঙ্গ ও সবার কাছে সমাদৃত।... আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তিগর্ত ও সমষ্টিগতভাবে মানুষের প্রতিভা ও নিজস্ব ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা। সেজন্য জনগণকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইউনিটে সুসংগঠিত করা এবং সর্বনিম্ন গ্রামপর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য বহুদলীয় গণতন্ত্রের ধারণাকে কাজে লাগানো। এজন্য আমাদের দলকে (বি. এন. পি.) সর্বনিম্ন পর্যায়ে সুসংগঠিত করে ধাপে ধাপে উপরে আসতে হবে। এ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের (মূল) ভিত্তিসমূহ ★ রেস বা জনগোষ্ঠী ★ স্বাধীনতা যুদ্ধ ★ বাংলা ভাষা ★ ধর্ম ★ ভৌগোলিক এলাকা ★ সংস্কৃতি ★ অর্থনীতি।

· স্বাধীন জাতির স্বাধীন উপলব্ধি— জিয়াউর রহমান।

www.nagorikpathagar.org

ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস গত দুই হাজার বছরের ইতিহাস।... বঙ্গ, বাঙ্গাল, বাংলাদেশ। দুনিয়ার অন্যান্য দেশে এ বাঙ্গাল কথাটার উল্লেখ আছে। ..... যখন সূত্র খুঁজবেন তখন বাংলাদেশের সঙ্গে এক সূত্র খুঁজে পাবেন। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে নয়।..... ১৯৭১ সালে আমি রাজনীতিবিদ ছিলাম না। ১৯৭১ সালে আমরা যে যুদ্ধ করলাম, কোনো ক্ষমতার লোভে করিনি। আমরা টাকা পয়সার লোভে করিনি। আমি জানিনা যে, আমি যুদ্ধে নেমেছিলাম। আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলাম। .... বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শ যার আদর্শ আমি ছোটবেলা থেকেই পেয়েছিলাম। আমি দেখলাম যে, বাংলাদেশকে কিভাবে শোষণ করা হচ্ছিল এবং হচ্ছে। সেই সময়, ১৯৭৪ সালের আগে, বর্তমানের বাংলাদেশকে কিভাবে শোষণ করা হয়েছে। কলিকাতাকেন্দ্রিক শোষণ দিল্লীকেন্দ্রিক শোষণ, করাচীকেন্দ্রিক শোষণ, লন্ডনকেন্দ্রিক শোষণ এবং অন্যান্যকেন্দ্রিক শোষণ।... আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের রাজনীতি ছিল না। সেখানে তারা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আসল কথাটা হল, আওয়ামী লীগ কেবল পাকিস্তানের ক্ষমতার গদিতে বসতে চেয়েছিলো। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, ছাত্রগোষ্ঠী তারা স্বাধীনতা চেয়েছিলো। নেতারা যারা ছিলেন তারা এ অনিশ্চয়তার মধ্যে যেতে চাচ্ছিলেন না। এটা করতে গিয়ে যদি আমরা ক্ষমতা না পাই। কারণ, আমরা তো অনেক দিন ধরে রাজনীতি করলাম, অনেক কাজ করলাম, আমাদের ক্ষমতায় যেতেই হবে। সেইখানে তাদের একটা আত্মসংঘাত লেগে গিয়েছিল। ১৯৭১ সালে আমি যেটা লক্ষ্য করলাম, মার্চ মাস থেকে আওয়ামী লীগের মধ্যে দুটো ডিভিশন হয়ে গিয়েছিল। যারা যুব সমাজের প্রতিনিধি, তারা বলেছিল স্বাধীনতার কথা। কেউ কেউ অটোনমির কথা বলেছিল। কেউ স্বাধীনতার কথা। কিন্তু জনগণের মানসিকতা স্বাধীনতার জন্য ছিল। তারা বুঝে ফেলেছিল যে পাকিস্তান দিয়ে আমাদের কিছুই হবে না। আওয়ামী লীগের নেতারা চেয়েছিল ক্ষমতার আসন (মুজিব, কিন্তু তাজউদ্দীন নয়)। যার ফলে সেনাবাহিনী কি করল? তারা চিন্তা করে দেখল, আমাদের এখানে ঝুঁকি নিতে হবে। .... তাদের বোঝা উচিত ছিল যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা এমন এক পর্যায়ে গেছে সেখানে আর কিছু করা যাবে না। এটার সমাধান হল বাংলাদেশকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়া একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ...আমরা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম।... চরম অবস্থা মানে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ। ... বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গড়ে একটা ঘাত-প্রতিঘাতের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। একটা ঘাত প্রতিঘাত না খেলে কোনো রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে ওঠে না। এই যারা আমাদের ঘাত-প্রতিঘাত দিচ্ছে বাকশালীরা ও অন্যান্য, এর ফলে আমরা মজবুত হয়ে উঠেছি।... ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধ শেষ হল ১৬ ডিসেম্বরে। আমরা লক্ষ্য করলাম যে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঠিক একই কাজ করতে শুরু করল, যেটা পাকিস্তানী সেনাবাহিনী করেছিল বিভিন্নভাবে। আমরা খবর পেতে শুরু করলাম যে, তারা এখানে ওখানে লুট করছে, অন্যায় করছে, এমনকি মেয়েদের উপর পর্যন্ত অত্যাচার তারা শুরু

www.nagorikpathagar.org

করে দিয়েছিল। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ? আমাদের ছেড়ে কেউ কথা বলবে না। কিন্তু আমাদের বাকশালী ভাই সাহেবরা এটা বুঝতে পেরেছেন? আমাদের ইতিহাসতো বঞ্চনার ইতিহাস। আমাদের ইতিহাস এটা বাকশালীরা কিভাবে ভুলে যায় আমিতো এটা বুঝি না।... তাদের (আ: লীগ) কোন রাজনৈতিক দর্শন ছিল না। তাদের মাথার মধ্যে আর কিছুই ঢুকবে না বাকশালী ছাড়া। .... আমার মনে হয় '৭৩ সালেই পরিত্যাগ করে দিয়েছিল আওয়ামী লীগকে। কারণ আওয়ামী লীগ যে নির্বাচন করেছিল সেটি কোন ন্যায়সঙ্গত নির্বাচন ছিল না। তারপর '৭৫ সালে একদলীয় ব্যবস্থা করে দিল বাকশালইজম। .... ১৯৭৮ এবং ১৯৭৯ সালের প্রথমদিকে যে দু'টি জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ; প্রেসিডেন্ট এবং সংসদের নির্বাচন, ১৯৭৬-'৭৭ সালে এর জন্য আমাদেরকে অনেক প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। আমরা সংকল্পবদ্ধ ছিলাম যে, নির্বাচন যেন একেবারে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে হয় এবং সেটা হয়েছে।.... আর একটা কথা মনে রাখবেন, জাতীয়তাবাদের সৃষ্টিকর্তা জনগণ। এর উত্তরাধিকারীও জনগণ। এটা কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হয়নি। এর দর্শন কোন ব্যক্তি দেয়নি। জনগণ দিয়েছে এবং এটা গড়ে উঠেছে শত সহস্র বছর ধরে। .... আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয়তাবোধের প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে আমাদের জাতীয় সত্তা হিসেবে একেবারে গড়ে দেয়া। ... আমাদের স্বাধীনতা আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে এবং আপনারা দেখবেন কোন দেশ যদি সাহায্য করে, এতটুকু সাহায্য করলে বলবে এতটা আর তার পরিবর্তে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাবে আরো এতটা যেটা '৭১ সালে (ভারতের দ্বারা) হয়েছে। .... যুদ্ধ করলাম আমরা। বাংলাদেশের মানুষ মরল। যখন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল তখন অন্য সাহেবরা আসলেন। হয়ে গেল তাদের নাম ধাম। কিন্তু সত্যকে তো ঢাকা যায় না। আমরা যদি স্বাধীন না হতে চাইতাম তাহলে কে আমাদের স্বাধীনতা দিতে পারত। আর যখন আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, কে আটকাতে পারত। কোনো বিদেশী যদি নাও আসত তা হলেও আমরা স্বাধীন করে নিতাম দেশটাকে।... ১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযোদ্ধারা অর্থাৎ যারা সেই সেনাবাহিনী হোক, গেরিলা হোক, যারা দেশের মধ্যে যুদ্ধ করছিল তখন আওয়ামী লীগেরা কলিকাতায় বসে দেখল যে, আরো যদি বেশি দিন যুদ্ধ চলে তাহলে আমাদের হাত থেকে নেতৃত্ব চলে যাবে। তখন তারা তাদের গুরুদেরকে বলল যে, ভাই সাহেব বাঁচাও। এরকম চলতে থাকলে আমাদের অস্তিত্ব হারাব।... স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছে তাদের হাতের মধ্য দিয়ে যেন স্বাধীনতা না আসে সেজন্য একটা ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল আওয়ামী লীগ এবং বিদেশী কেউ কেউ মিলে। .... রাজনীতিকে ঠিক রাখতে হবে। রাজনীতি কোন সময়েই দাঁড়িয়ে থাকে না। আমাদের কিছু মৌলিক বিষয় রয়েছে এগুলোকে ঠিক রেখে রাজনীতিকে সময়োপযোগী করতে হবে। নইলে রাজনীতিতে ফাটল ধরে যাবে। আর একটা জিনিস মনে রাখবেন— জাতীয়তাবাদের রাজনীতি বহির্মুখী— অন্তর্মুখী নয়। ইংরেজীতে তাকে আউট ওয়ার্ড লুক বলে। আপনাকে ঝর্ণার মত ছড়িয়ে যেতে

www.nagorikpathagar.org

হবে। রাশিয়ানরা রাজনীতি করছে তা ভিতরমুখী। ফলে তাদের রাজনীতি ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমি হাতিয়ার হাতে তুলে নিয়েছিলাম আর্মীতে থাকাকালীন। আমিতো চ্যালেঞ্জ দিয়েছি আমার চেয়ে বামপন্থী কেউ না।... রাজনীতির বড় বাহন হল সংগঠন।... আর একটি কথা হল জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যদি দুর্বল হয়, তাহলে আপনারা ধ্বংস হয়ে যাবেন। আপনারা দুর্বল থাকতে পারেন না। যে দেশেই জাতীয়তাবাদী রাজনীতি রয়েছে সেখানেই আক্রমণ হয়েছে। যেমন এখন আমাদের উপর আঘাত আসছে। চাপ খেতে খেতে এক সময় শক্ত হয়ে যাবো। আঘাত খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আরো পেটানোর দরকার আছে।... রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতা উভয়ই আসে জনগণের কাছ থেকে।... পুরো জাতিটাকে সংগঠিত করতে হবে।.... আমরা কখনই জাতীয়তাবাদী চোর অঙ্গদল, বাটপার অঙ্গদল করব না।

ড. চৌধুরীর ভাষায় বলি, "যতদিন বাংলাদেশ নামের এ দেশের আকাশে বাতাসে একটি মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জিয়াউর রহমান, একটি চরিত্রবান জিয়াউর রহমান, একটি কর্মবীর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, একটি আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রণেতা ও দীক্ষাগুরু জিয়াউর রহমানের নাম মাটি থেকে আকাশ, সমুদ্র থেকে পাতাল পর্যন্ত কি অদ্ভুত কম্পন সৃষ্টি করে যাবে। সে কম্পনের শিহরণ কি আমাদের অন্তরে দোলা জাগাবে না।" ঃ

জাতীর শত্রু পরাশক্তির ইঙ্গিতে ১৯৮১ সালের ৩০ মে এত বড় এক দেশপ্রেমিক কর্মবীরকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। অতঃপর বি. এন. পি.-এর ভাইস. চেয়ারম্যান বিচারপতি আবদুস সাত্তার বি. এন. পি.-র চেয়ারপার্সন ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারকে সরিয়ে দিয়ে সামরিক বাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালে রক্তপাত হীন বিদ্রোহের মাধ্যমে আব্দুস সাত্তার সাহেবের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে সামরিক আইন জারী করেন। দেশে কোন অস্থিরতা ছিল না, সন্ত্রাস, হাইজাক, ধর্ষণ, হত্যা সাধারণতঃ যা হয়, তার বাইরে কিছু না হওয়া সত্ত্বেও, সাত্তার সাহেব রাষ্ট্র চালাতে পারছেন না, এই অজুহাতে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে পদত্যাগপত্র লিখে নিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেই এরশাদ মার্শাল ল বা সামরিক আইন জারী করলেন। এ পরিবর্তন জনগণ মেনে না নিলেও সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে জনগণ তার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু করেনি। তবে বি. এন. পি. দল এ পরিবর্তন মেনে নিতে পারেনি বলে, খালেদা জনসংযোগের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে জনসমর্থন লাভে সক্ষম হন। এ সময় বি. এন. পি.-কে সহযোগিতা করতে অন্যদল এগিয়ে এলেও তাঁরা তাঁদের স্বার্থে ছিলেন আপসহীন। সে কারণে খালেদা-হাসিনা যৌথভাবে আন্দোলন করলেও ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে হাসিনা নির্বাচনে যোগ দেন। নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদ গণতন্ত্রী হওয়া ও সামরিক পোশাক পরিত্যাগ করার প্রচেষ্টা করলেও আপসহীন নেত্রী তাকে সমর্থন করতে পারেন নি।

অতঃপর দীর্ঘ ৯ (নয়) বছর ধরে সংগ্রাম করেন বেগম জিয়া। খালেদা জিয়ার সঙ্গে হাসিনা থাকলেও তাঁর আচরণে আপসের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে খালেদার আপসহীন মনোভাবের জন্য জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে আন্দোলনে যুক্ত হল

www.nagorikpathagar.org

তিনি। খালেদা জিয়ার আন্দোলনের তীব্রতায় এরশাদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় গ্রহণ করেন। জনগণ খালেদার এই তেজস্বী নেতৃত্বে সন্তুষ্ট হয়ে ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতায় এসে সরকার গঠন করেন এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পরিবর্তন করে মন্ত্রিশাসিত সরকার বিল সংসদে পাস করিয়ে নেন এবং মন্ত্রিশাসিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন তিনি। ইতঃপূর্বে দলীয় কোন্দলকে কেন্দ্র করে যে জটিলতা সৃষ্টি হয় তা তিনি মিটিয়ে ফেলতেও সক্ষম হন।

ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা তাঁর অভিশপ্ত সার্কিট হাউজ প্রবন্ধে জিয়ার মৃত্যু ঘন বেদনাময় কাহিনী বর্ণনার সমাপ্তি লগ্নে আহত মন নিয়ে বলেছেন, "প্রায় আটটার দিকে অভিশপ্ত সার্কিট হাউজকে পাশ কাটিয়ে পাহাড়তলী দিয়ে ঢাকার পথে রওনা হলাম আমরা ভাবলাম এ পথ যে কোথায় শেষ হবে জানি না। শুধু এটা জানি, যে সন্তানকে বহন করে এ পথ হয়েছে প্রশস্ত, সে সন্তানের বোধ হয় এ পথে আর কোন দিন যাওয়া হবে না।"

এটি ছিল ব্যারিস্টারের আশা ভঙ্গের এক সকরুণ সুর। দিশেহারা মনের এক নিরাসক্ত অভিব্যক্তি। তখনও তিনি জানতে পারেননি দেশের উন্নয়ন ও তাকে রক্ষার সুমহান দায়িত্ব বহনের জন্য তাঁরই ঘরের আর একজন আপন মনে অপেক্ষা করছেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন তিনি। মৃত্যুর বেদনার মাঝেও জিয়া আর একজনের মনে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়ে গেছেন। তিনি আর কেউ নন, জিয়ারই আজীবনের সঙ্গিনী বেগম খালেদা জিয়া। মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এল আর এক অগ্নিকন্যা। আমাদের প্রিয় প্রেসিডেন্ট যে কাজ শুরু করে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান এবং যেসব মূল্যবোধ এদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন— তা পরিপূর্ণ হবার আগেই স্বার্থান্বেষী নরঘাতকের হাতে শহীদ হতে হয়—আর সে পতাকা বহনের জন্য, বি. এন. পি.-কে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য, দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য এগিয়ে আসেন স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। কৃতী সন্তান জিয়ার কৃতিত্বকে ম্লান না করে তাকে আরো উজ্জ্বল, আরো উদ্ভাসিত করার জন্য এগিয়ে আসেন খালেদা। সার্বভৌম রাষ্ট্রের একজন সেবক হিসেবে। জনগণের কল্যাণ কামনায় একজন মহিয়সী নারীরূপে আবির্ভূত হন তিনি। ইসলাম ধর্মের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাস্তবায়ন ও ইসলামী জীবনবোধ এদেশের ৯০% মুসলমানদের জীবনের যে পাথেয় তাকে জীবনধর্মে রূপায়িত করার যে চেষ্টা শুরু করেছিলেন জিয়া—তাকেই আরো পুষ্ট ও সতেজ করে তোলেন বেগম জিয়া। তৎসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে সার্বজনীন রূপদানের জন্য তিনি বর্তমানে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। সে কারণে জিয়ার আদর্শের রূপায়ণে বেগম জিয়ার সকল কর্মকাণ্ডে ব্যাপ্ত ও বিস্তৃতি লাভ করেছে ও জাতির জন্য তা হয়ে উঠেছে এক মহৎ কর্ম।

"খালেদা, জিয়ার কার্যক্রমকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন। তিনি মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে জিয়ার বি. এন. পি.-তে যোগদান করেন। আমরা জানি, "বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বি. এন. পি.) প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দুঃখজনক শাহাদতের পর দেশে নেমে আসে

www.nagorikpathagar.org

এক সংকট। একদিকে শুরু হয় দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে জিয়ার প্রতিষ্ঠিত দল বি. এন. পি.-তে সৃষ্টি হয় ভাঙ্গন। শুরু হয় নানামুখী ষড়যন্ত্র। একদল চাইলেন বি. এন. পি.-কে জিয়ার আদর্শ থেকে সরিয়ে নিতে। অন্য দল এর প্রতিবাদ করলেন।"– নন্দিত নেত্রী– খালেদা জিয়া– সৈয়দ আবদাল আহমদ, প্রথম প্রকাশ– ১৯৯১।

জিয়া অবশ্য নানান মত ও দলের লোক নিয়ে বি. এন. পি. গঠন করেন। এর মূল সুর ছিল মুক্তিযুদ্ধের মৌল প্রেরণাকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগান এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশে সার্বজনীন করে তোলা এবং ১৯ দফার ভিত্তিতে দেশের কল্যাণ সাধন। কিন্তু দলের একাংশ জিয়ার মূল আদর্শ থেকে সরে গিয়ে স্বকীয় স্বার্থ ও তাদের নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে দলকে পুনরায় সংগঠিত করে— জিয়ার আদর্শের অপমৃত্যু ঘটাতে চান। অপর অংশ তা প্রতিহত করে জিয়ার আদর্শ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। এহেন সংকটময় পরিবেশে বেগম জিয়ার বি. এন. পি. দলে প্রবেশ।

খালেদা জিয়া রাজনীতিতে প্রবেশের পূর্বে সকল আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ ও সমর্থন নিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ইসলামী বিধান মতে এভাবে কোনো কাজে প্রবেশ করতে হয়। খালেদা জিয়া তাঁর স্বামী জিয়াকে দেখেছেন একজন স্বাধীনতার ঘোষক রূপে, একজন সফল মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে, একজন সার্থক রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রপতি রূপে। একজন রাজনৈতিক সংগঠক রাষ্ট্রপতি জিয়া দেশের কল্যাণের জন্য জনপ্রিয় দল বি. এন. পি. গঠন করেন। তাই তিনি দলে প্রবেশ করেই জিয়ার আদর্শকে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন। খালেদা জিয়া তাঁর স্বামীর মতই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, স্বাধীনতা লাভের ফলে দেশের কল্যাণ, জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা ও ভারত তথা পরাশক্তির হাত থেকে দেশকে রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েই এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করলেন। রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার বি. এন. পি.-র যখন চেয়ারম্যান তখন তিনি ১৯৮২ সালের ৩-রা জুন প্রাথমিক সদস্যপদ লাভ করেন। এতে দলের অনেক প্রবীণ নেতা নাখোশ হন। তাঁরা যে পথে চলতে চান তাতে বাধার সৃষ্টি হবে জেনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ১৯৮২ সালের ২১ শে জুন বি. এন. পি.-এর চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রবীণ কিছু নেতা-কর্মী আব্দুস সাত্তারকে সমর্থন করেন। প্রবীণ ও তরুণ সমাজ বেগম খালেদা জিয়াকে চেয়ারম্যান পদে প্রতিযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন। দু'জনেরই নমিনেশনপত্র নির্বাচন কমিশনারের নিকট দাখিল করা হয়। পরে দলের বিভক্তি রোধের প্রয়োজনে আব্দুস সাত্তারের অনুরোধে খালেদা জিয়া তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন এবং তাঁকে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে তার মতামতের কথা জানিয়ে দেন।

অতঃপর বি. এন. পি.-র বর্ধিত সভা আহ্বান করেন আ: সাত্তার। তারিখ ১লা এপ্রিল ১৯৮৩ সাল। কাউন্সিল অধিবেশনের আহ্বানকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। অনেকে এ সভাকে মেনে নিতে পারে না, বিশেষ করে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বকে কেউ কেউ অপছন্দ করতে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ নেতা-কর্মী তাকে সমর্থন করেন। 'নন্দিত দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া' প্রবন্ধের লেখক বলেন, "ইতিমধ্যেই বেগম খালেদা জিয়ার সিনিয়র সহ-সভাপতি মনোনয়নের খবরের বিরোধিতা করলেন দলের "হুদা-মতিন" চক্র, যারা

www.nagorikpathagar.org

গোপনে জেনারেল এরশাদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন।" তাঁরা সাত্তার সাহেবের কাউন্সিল অধিবেশনের বিরোধিতা করে, "হুদা-মতিন ২-রা এপ্রিল '৮৩ গাবতলী (ঢাকা) বিউটি সিনেমা হলে দলের কনভেনশন আহ্বান করেন।" মনে হয় তারা পাল্টা কমিটি করার এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ১ লা এপ্রিলের বর্ধিত কাউন্সিল অধিবেশনে (ইউসুফ মার্কেট) প্রাক্তন বিচারপতি আ: সাত্তার বলেন, "আমি তাদের বলেছি কোন অভিযোগ থাকলে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তা সমাধান করতে হবে। কিন্তু তবুও তারা তলবী সভা করছে। ফলে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে দলকে নিয়ে তারা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।" এ বর্ধিত সভায় বেগম খালেদা জিয়া বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর ভাষণে জিয়ার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং এ ব্যাপারে দলের চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তারকে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। তৎসঙ্গে দেশকে বিকিয়ে দেয়ার দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেও সজাগ থাকার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। এরপর এক বছর আ: সাত্তার সাহেব দলের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনের পর অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৯৮৪ সালের ১০ মে বেগম খালেদা জিয়াকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করে তিনি দলের চেয়ারম্যানের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

যে আজিজুর রহমানকে একদিন রাষ্ট্রপতি জিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী করার জন্য তৎকালীন সময়ে বিতর্কিত হয়েছিলেন। অবশ্য শাহ আজিজুর রহমান ১৯৭১ সালের ৯ জানুয়ারীর মওলানা ভাসানীর স্বাধীনতা প্রস্তুতি কমিটির কার্যকরী কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য থাকার কারণে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাঁকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করেন। তিনিও শেষপর্যন্ত এরশাদের ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে গোপন আঁতাতের ভিত্তিতে বি. এন. পি.-তে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা করেন। এর সঙ্গে যুক্ত হন মাঈদুল ইসলামসহ অনেকেই। ইতিমধ্যে খালেদা জিয়া ১লা মার্চ ৮৫ অন্তরীণ হন। এ সময় শাহ আজিজুর রহমানকে চেয়ারম্যান এবং মাঈদুল ইসলামকে সেক্রেটারী জেনারেল করে বি. এন. পি.-র একটি পাল্টা কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর বেগম জিয়া বেরিয়ে এসে সে কমিটি ভেঙ্গে দেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তিনি (বেগম জিয়া) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বি. এন. পি.) চেয়ারম্যান সর্বসম্মতি ক্রমে নির্বাচিত হয়ে অদ্যাবধি তিনি তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত সততা ও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছেন।

এ সময় এরশাদ খেদাও আন্দোলনে বি. এন. পি ও আওয়ামী লীগ যৌথভাবে কাজ করলেও ১৯৮৬ সালের এরশাদের দেয়া সাধারণ নির্বাচনে খালেদার বি. এন. পি যোগ দেন নাই, কিন্তু শেখ হাসিনার বাকশাল গর্ভজাত আওয়ামী লীগ সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। বাকশাল ও সামরিক সরকার এরশাদের মধ্যে চরিত্রগত এমন কোন পার্থক্য ছিল না। জিয়াই গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর আওয়ামী লীগ আ: মালেকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁর স্বভাবে বাকশালী চেতনা রয়ে গেছে বলে মনে করা হয়। বেগম জিয়া জানতেন, এরশাদ একবার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলে তিনি বলবেন যে নির্বাচনের মাধ্যমে সামরিক লেবাস সে পরিত্যাগ করেছে। এরশাদকে সে সুযোগ দিলে বাকশালের মত তার অঙ্গে সামরিক স্বভাব থাকবে— এতে কোন ভুল নেই। ফলে বাকশালের মত এরশাদের দলও জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। খালেদা জিয়া সে কারণে এরশাদের সকল নির্বাচন বর্জন করে রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের কথা ব্যক্ত করে লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক এদেশের স্বাধীনতার জন্য ভাসানীর নেতৃত্বে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তা ১৯৭১ সালের ১০ই জানুয়ারী ('৭১-এর ৯ই মে কমিটি গঠিত হয়) দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই স্বাধীনতা প্রস্তুতি কমিটিতে ছিলেন ন্যাপের সভাপতি, মসিউর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী কাজী জাফর আহমদ এবং অন্যান্য দল অর্থাৎ মুসলিম লীগসহ অন্য দল যাঁরা ভাসানীর সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছেন তাঁদের মধ্য থেকে নিয়েছেন শাহ আজিজুর রহমান, আতাউর রহমান খান (আ: লীগের এককালীন মুখ্যমন্ত্রী) এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী লে: কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনসহ আরও অনেকে। যাঁদের বেশির ভাগই এ চেতনার কারণে স্বাধীনতার ঘোষক মুক্তিবাহিনীর 'জেড' ফোর্স প্রধান এবং সফল মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাঁদের অনেককেই মন্ত্রিপরিষদে স্থান দিয়েছিলেন এবং কেউ কেউ তাঁর মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রীর পদও অলংকৃত করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ জিয়ার শহীদ হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধের রক্তসাগরে স্নাত ও মুক্তিযুদ্ধের আলোকে প্রতিষ্ঠিত দল বি. এন. পি.-র চেয়ারম্যান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন— যা জনগণ কর্তৃক সমর্থন লাভ করেনি এবং দলীয় তরুণ সমাজ ও বর্ষীয়ান অনেক নেতা-কর্মী তা পছন্দ করেননি। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অতি উচ্চাভিলাষী শাহ আজিজুর রহমান। তিনি জিয়ার মূল আদর্শ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা ও বি. এন. পি.-র দেয়া দেশ গড়ার ১৯ দফা কর্মসূচিকে পাশকাটিয়ে এ দলকে তার চিন্তা-চেতনা ও মুসলিম লীগের আদলে গড়তে চান— যা বি. এন. পি.-র মূল আদর্শের পরিপন্থী ছিল। ফলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্ব জিয়ার মূল আদর্শ থেকে তা সরে যেতে থাকে। বেগম জিয়া তাঁর তেজোদীপ্ত কর্ম ও সাংগঠনিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তার গতিরোধ করে তা স্বপথে ফিরিয়ে আনেন ও জিয়ার আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং বি. এন. পি.-র দ্বিধাবিভক্তিকে তিনি রোধ করতে সক্ষম হন। এ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বি. এন. পি. মুক্তিযুদ্ধের চেতনাজাত ও মুক্তিযুদ্ধের আলোকিত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শে একটি জাতীয়তাবাদী দল। যা বিপথগামীদের সরিয়ে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ও আদর্শকে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

অপরদিকে যে আওয়ামী লীগ ১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী সভা গঠনের জন্য এবং নতুন করে সংবিধান রচনার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে যা ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের কারণে ব্যর্থ হয়। ফলে এদেশের নেতা-কর্মী, দল-মত নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ ৬ দফাকে পরিত্যাগ করে ১ দফা অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন শুরু করে এবং এর অনুকূলে পতাকা উত্তোলন, নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন, গণসঙ্গীত, মিটিং, মিছিলসহ যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পরিশেষে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা ও তাজউদ্দীনের প্রবাসী সরকার গঠনের মাধ্যমে তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ থেকে পাক সামরিক বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য জেনারেল ওসমানীর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী অর্থাৎ মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় এবং

www.nagorikpathagar.org

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে শত্রুমুক্ত করার আয়োজন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু শেখ মুজিব এ চেতনার বিপরীতে অবস্থান করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনায় ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যান এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে সুনজরে না দেখে বরং কৌশলে তা এড়িয়ে চলেন ও কখনও বা কৌশলগত বিরোধিতা করেন যা সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রয়োজনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সাংসদ প্রধান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর নাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যদিও ২৫ মার্চ মধ্যরাতে তিনি স্যুটকেস প্রস্তুত করে রেখে বন্দীত্ব বরণ করেন। ফলে আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা বিরোধী ও স্বাধীনতার পক্ষসমূহের মধ্যে নীরবে দ্বিধা বিভক্তির লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা লাভের পর তাজউদ্দীন আওয়ামী লীগের মধ্যে পুনঃ (অন্তঃসলিলা বিভক্তি) ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হন এবং বন্দীফেরত শেখ মুজিবকে এদেশের সরকার প্রধান করেন।

স্বাধীনতার কারণে মুজিব নীরব ঈর্ষায় জ্বলতে থাকেন এবং ১৯৭৪ সালে সে কারণে তাজউদ্দীনকে মন্ত্রিপরিষদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। খন্দকার মোশতাক ও মুজিবের সযত্ন প্রয়াসে এ কাজ করা হয়। অথচ তাজউদ্দীন ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব দেশে ফিরে এলে স্বাধীনতা ও মুক্তির এবং মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত জয়কে মুজিবের গলায় পরিয়ে দেন। যা মুজিবের মোটেও প্রাপ্য ছিল না। ফলে মুজিবের আওয়ামী লীগ হতে বাকশাল সৃষ্ট ও পরবর্তীকালে বাকশাল গর্ভজাত শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি হিসেবে দাবী করে আসছেন (যা ইতিহাসগত সত্য নয়) এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়নের নামে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, একজাতিতত্ত্বের নামে বহুজাতিতত্ত্বভিত্তিক আন্দোলনের ফসল বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং একজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে ভারতভুক্তির ষড়যন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশকে ভারতের একটি প্রদেশ ও ভারতের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার হাস্যোজ্জ্বল আবেগে শিহরিত হচ্ছেন। দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতার অন্যতম স্রষ্টা তাজউদ্দীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের খাতিরে এবং বিরোধ এড়ানোর জন্য ১৯৭৪ সালে মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়িত হয়েও নীরব ভূমিকা পালন করেন এবং '৭৫ সালে চার জাতীয় নেতার শাহাদৎ বরণের কারণে স্বাধীনতার সপক্ষ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অবসান ঘটে এবং পাকপ্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনাসিক্ত আওয়ামী লীগের উত্তরসূরিগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের আসনে (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) অধিষ্ঠিত হয়। ফলে স্বাধীনতা বিরোধী মুজিব সমর্থক আওয়ামী লীগকে দেশ প্রত্যাখ্যান করে এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক জিয়ার বি. এন. পি.-কে দেশের জনগণ গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু সেই আওয়ামী লীগের অপশক্তি বা বাকশাল সৃষ্টিকারী মৃত আত্মা এসে ভর করে হাসিনার উপর।

ইংরেজ শাসনের চল্লিশদশক থেকে আরম্ভ করে পাকিস্তান সৃষ্টি ও স্বাধীনতা যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী শত শত প্রথম সারির (সোহ্‌রাওয়ার্দী, ফজলুল হক, ভাসানী, শামসুল হক, অলি আহাদ, ভাষা মতিন, গাজীউল হক, মীর্জা হাফিজ, আতাউর রহমান খান, এ্যাডভোকেট মনসুর, মুজিব, কাজী জাফর, তাজউদ্দীন, ওসমানী, জিয়াসহ) জাতীয় নেতার কার্যক্রম ও আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে এক ব্যক্তি এক আত্মার উপর চাপিয়ে দিয়ে, স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করে সকল জয়ের মালা সেই ব্যক্তির গলায় পরিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক বেদীমূল এক দেবতাকে অধিষ্ঠিত করে, তাঁকে

www.nagorikpathagar.org

পূজার সকল অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য অর্পণ করতে থাকেন শেখ হাসিনা—যা তাঁর মোটেও প্রাপ্য নয়, কাম্যও নয়। এসময় (১৯৭৫ সাল হতে) স্বাধীনতার পক্ষশক্তি অনেক আওয়ামী লীগ সদস্য স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধজাত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দল বি. এন. পি.-তে এসে যোগ দেন। বি. এন. পি.-তে যে দু-একজন অপশক্তি ছিল তা স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সংগ্রামী কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে বিতাড়িত হয়। শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে বি. এন. পি.— বাহ্যিক দৃষ্টিতে মূল আদর্শ বিরোধী কোন বি. এন. পি নেতা আমাদের আছে বলে আমার জানা নেই। থাকলেও বি. এন. পি.-র আন্দোলনের মুখে সে এমনিতেই বেরিয়ে যাবে ধানের ভিতরের চিটার মত। যেমন হঠাৎ আবির্ভূত অপশক্তি শাহ আজিজুর রহমানকেও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। আবার যদি 'হুদা-মতিন' গ্রুপ বি. এন. পি.-র মূল চেতনাকে বিনষ্ট করতে চান— তাঁরাও বিতাড়িত হবেন একই নিয়মে, একই পদ্ধতিতে তবে বর্তমানে (১৯৯৬-এর জুন) হাসিনার আওয়ামী লীগ নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে ও জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে সরকার গঠন করার পর বাকশালী ও একদলীয় চেতনা নিয়ে আবার পুরানো খেলায় মেতে উঠেছেন এবং সেই আত্মার স্বপ্নকে (যা সত্য নয়) বাস্তবায়নের জন্য নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, হত্যার রাজনীতি শুরু করেছেন ও পরাশক্তির হাতে এ দেশকে তুলে দেয়ার জন্য আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের সে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উৎসাহিত করছেন। বর্তমানে বেগম জিয়া দেশ থেকে এ অপশক্তিকে নির্মূল করে দেশের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে লিপ্ত আছেন এবং দেশের উন্নয়নের জন্য ১৯ দফাভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমেও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে বি. এন. পি.-র নেতা-কর্মী ও জনগণকে নিয়ে।

বি. এন. পি-র রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের হাত থেকে মেজর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করে সামরিক আইন জারী করেন এবং দীর্ঘ ৯ বছর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন।

অতঃপর এরশাদ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা প্রদান করে বিদায় নেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি সাহাবউদ্দীন আহমদ ১৯৯১ নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়ী বি. এন. পি. প্রধান বেগম খালেদা জিয়াকে ক্ষমতা প্রদান করে বিদায় গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের পর জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকার প্রবর্তন ও সংবিধানে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁর এ অবদান জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার প্রবর্তন করে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন এবং এতেও তৃপ্ত না হয়ে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য সব দল-মত নিষিদ্ধ করে একদলীয় সরকার বাকশাল গঠন করে তিনি বাকশাল প্রধান ও রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। খালেদা এতদিন পর তার বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে সরকার গঠনের প্রক্রিয়াকে গণতন্ত্রায়ন করেন। এ একটি কাজের মাধ্যমেও খালেদা জিয়ার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে সরকারপ্রধান হয়ে জিয়ার আদর্শসূচি ১৯ দফার মাধ্যমে দেশের কল্যাণে মনোনিবেশ করতে যাচ্ছেন— কিন্তু তাঁর শাসনের প্রাথমিককাল থেকে হাসিনা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার চক্রান্ত করছিলেন, যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী একটি কার্যক্রম। এ সম্পর্কে রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তির উত্থানের প্রত্যাশা প্রবন্ধে লেখক বলেন, "বেগম জিয়াকে দেশ পরিচালনা করতে দেয়া হবে না। ঝাঁকি আর ধাক্কা মেরে বি. এন. পি.-কে গণতন্ত্র শিক্ষা দেয়া হবে। শেখ হাসিনা তার কথা রেখেছিলেন ১৭৩টি জ্বালাও পোড়াও স্টাইলে হরতাল পালনের মাধ্যমে।" তিনি আরও বলেন, "বর্তমান প্রধানমন্ত্রী (শেখ হাসিনা) যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখন জ্বালাও পোড়াও রাজনীতির এক পর্যায়ে বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, যে জাতি তার পিতার হত্যার বিচার চায় না সেজাতির পরিণতি এরকমই হয়।" এখানে তিনি লজ্জাহীনভাবে জাতিকে আক্রমণ করেছেন, খালেদা সরকারকে আক্রমণ করে কথা বলা চললেও জাতির উপর আক্রোশ বা জাতিকে যে ব্যক্তি শাস্তি দিতে চায়, সে জাতি তাকে ভোট দেয়নি, দিতে পারে না। তিনি কি করে বলতে পারলেন "সে জাতির পরিণতি এমনই হয়।"

পূর্বেই বলেছি বেগম খালেদা জিয়াও স্বাধীনতা ঘোষণাকাল ও তৎপরবর্তী কিছুকাল পর্যন্ত জিয়াউর রহমানের সঙ্গে থেকে জিয়ার এ যুদ্ধকালীন বিরাট দায়িত্বের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েন। তখন স্বামীর সঙ্গে থেকে বিরাট দায়িত্ব পালন করেছিলেন বলেই তাঁর অবর্তমানে জিয়ারই প্রতিষ্ঠিত দল বি. এন. পি. যে দল ও দলের নেতা-কর্মী মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ও স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী ও মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্নাত দল হিসেবে খ্যাত, এর চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব গ্রহণ করে সে দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতা ও সততার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছেন খালেদা এবং এ দলের প্রধান হিসেবে ১৯৯১–১৯৯৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে দেশকে উন্নয়নের ধারায় নিয়ে যান, যে ধারা অব্যাহত থাকলে আজ বাংলাদেশ সোনার দেশ হয়ে যেত। এখানে ('৭১-এ) বেগম জিয়ার নিরাপত্তার অভাব থাকা সত্ত্বেও জিয়া দেশের জন্য ও জাতির জন্য যে সকলকে ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন তার একটি চিত্র এখানে তুলে ধরা হল।

জিয়া– শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব– অধ্যাপক কে. এ. এম. শাহাদত হোসেন মণ্ডল।

ঃ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। স্বাধীনতার সপক্ষের বিদ্রোহী সৈনিকদের সংঘবদ্ধ করে শত্রু সেনাদের প্রতিরোধ করে নিজ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি সীমিত পর্যায়ে রেখে অস্ত্রশস্ত্রসহ তাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার দুরূহ কাজটিও তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেন— যা মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি পরবর্তীতে 'জেড'-ফোর্সের অধিনায়ক হিসেবে রণাঙ্গনে সবসময় সাধারণ সৈনিকদের সাথে থেকে বিজয়ের দিন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। .... স্ত্রী ও দুই শিশুপুত্রকে দেশের ভিতরে মৃত্যুর মুখে রেখেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে চলে যান। নিজের জীবন কিংবা পরিবারের নিরাপত্তা নয়, দেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধই তাঁর কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ঃ

www.nagorikpathagar.org

জিয়ার মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী তাঁর স্ত্রী যুদ্ধের আরম্ভের প্রাক্কালে যেমন বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, দিয়েছেন প্রেরণা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের কাল থেকে জিয়ার স্বাধীনতার প্রেরণার সঙ্গী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন—তা গবেষণাধর্মী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। তিনি একারণে জিয়াকে হত্যা করার পর জনগণ ও দলীয় নেতা-কর্মীর দাবীর মুখে বি. এন. পি.-তে যোগদান করেন এবং বি. এন. পি.-র মূল আদর্শকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হন। একদিকে শহীদ জিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র, অপরদিকে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি নামধারী রাজনৈতিক দল পাকিস্তান সমর্থনকারীদের সঙ্গে আঁতাত করেছে এবং অপরদিকে তাদের আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একজাতিতত্ত্বের (মৃত) উপর নির্ভর করে বহু জাতিতত্ত্বের অবসান ঘটিয়ে বৃহৎ ভারতের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য হাসিমুখে অপেক্ষা করছে, অপরদিকে জিয়ার মূল আদর্শ স্বাধীনতা ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ থেকে সরিয়ে এনে শাহ আজিজের মত কতিপয় লোক বি. এন. পি.-র আদর্শকে দূরে সরিয়ে আনতে চাচ্ছেন এসবের সঙ্গেই মোকাবিলা করে চলেছেন দেশনেত্রী খালেদা জিয়া। "আন্দোলনের বন্ধুর পথই তাঁর জন্যে রচনা করেছে নেতৃত্বের দ্যুতি। ড. এমাজউদ্দীন।" সেজন্য প্রফেসর এমাজউদ্দীন খালেদা সম্পর্কে আরো বলেন, "বাংলাদেশের রাজনীতির অন্দর-বাহির তাঁর রচনা। মি: বেকন বলেন, "শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের তিনটি ক্ষেত্রে সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। (১) সার্বভৌম বা রাষ্ট্রের সেবক, (২) খ্যাতির সেবক, (৩) কর্মসূচির সেবক। এ গুণ খালেদা জিয়ার আছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্মের প্রতি আনুগত্যশীলতা ও অন্যান্য গুণাবলী। ড. এমাজউদ্দীন আরো বলেন, "বেগম জিয়া শুরু করেছেন, যেখানে জিয়া শেষ করেন। ... জিয়া যা শেষ করতে পারেননি, তারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ, তাঁরই আপনজনকে তা শেষ করতে হলো।" আর এসব সম্ভব হয়েছে, খালেদার রাজনৈতিক কৌশল, সাংগঠনিক ক্ষমতা, নেতৃত্বের দৃঢ়তা, মানসিক শক্তি, কর্মে নিষ্ঠা, নির্ভেজাল দেশপ্রেম ও দেশের উন্নয়নের জন্য সতত চিন্তা-চেতনাই স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে অনন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

খালেদা জিলার বাল্যকাল কেটেছে জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরে। খালেদা জলপাই— গুড়ির নয়াবস্তি নামক ছোট একটি শহরে জন্মলাভ করেন। পিতা ইস্কান্দর মজুমদার ও মাতা বেগম তৈয়বা মজুমদার। ১৯৪৫ সালের ১৫-ই আগস্ট তিনি সেখানে জন্মগ্রহণ করেন। সুন্দর ফুটফুটে শিশুকে দেখেই তার বড় বোন তাকে পুতুল নামে ডাকতে শুরু করেন। পরিবারের সকলেই খালেদাকে অত্যন্ত বেশি ভালবাসতেন। লাজুক প্রকৃতির এ মেয়ে। সাদামাটা ছিমছাম বাড়ি ছবির মত মনে হতো। পাহাড়ী পরিবেশে মনকে বিরাট ও প্রসার করার সুযোগে তাঁর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হতে থাকে প্রাকৃতিক নিয়মে। তাঁর জন্মলগ্নেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো এ ভয়ঙ্কর যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচার জন্য United Nations Organisations (UNO) গঠন করেন। ফলে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত দেশ সাম্প্রদায়িক ভারতের কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলায় এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁরা থাকতেন দিনাজপুরের ঈদাগাহ বস্তী

www.nagorikpathagar.org

এলাকায় ভাড়াটে বাসায়। এখান থেকেই পুতুল তখন লেখাপড়া করতে থাকেন। ধীর স্থির মেয়ে লেখাপড়া ও খেলাধুলা নিয়ে থাকতেন। পুতুল খেলাও পছন্দ করতেন তিনি। তাঁর বয়স যখন ১৫ বছর, সবে ম্যাট্রিক পাস করে বেরিয়েছে। তাঁকে দেখে মুগ্ধ হন জিয়া। কিন্তু তার মুগ্ধতার কথা ঘুণাক্ষরেও জানান না পুতুলকে। জিয়া খালেদার দূর সম্পর্কের আত্মীয়, সেই কারণে তিনি মাঝে মাঝে যেতেন পুতুলের বাড়িতে। চা খেতেন, গল্প করতেন। "জিয়া ছিল সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন। পোস্টিং দিনাজপুর।"— খুরশীদ জাহান। মন দেয়া নেয়া হয়েছে কিনা তা জানা না গেলেও জিয়া যে তাঁর মন দিয়ে ফেলেছেন সুন্দরী খালেদাকে তা আমরা জেনেছি। সম্মানজনক ও সামাজিকভাবে বিয়ের মাধ্যমে খালেদাকে পেতে চান তিনি। খালেদাকে দেখে জিয়া যে মুগ্ধ হয়েছেন, তা কাউকে বুঝতে দেননি তিনি এমনকি খালেদাকেও নয়। তার উপর মকবুল নানা জিয়াকে এ বিয়ে করার প্রস্তাব দেন, বলেন যদি সে বলে তাহলে তিনি পুতুলের বাবাকে বলতে পারেন। তখন তাকে পুতুলের রূপ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেয় তা অনেকটা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের রাজকন্যার মত, "আন্ধাইর ঘরে রাইখলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা, হাইট্টা নামাইতে কন্যার পায়ে পড়ে চুল।" পুতুলের বিয়ে সম্পর্কে খুরশীদ জাহান বলেন, "দিনাজপুরে চাকুরির সময় জিয়া মাঝে মধ্যে আমাদের বাসায় আসত। জিয়ার একটা অসম্ভব গুণ ছিল, সে সহজেই মানুষকে আপন করে নিতে পারত। পুতুল ম্যাট্রিক পাস করার পর জিয়া একদিন আমাদের বাসায় এল। আম্মার কাছে গিয়ে বলল, খালা আমি আপনার জামাই হতে চাই। আম্মা হেসে ফেললেন। তখন কিছু বললেন না। আব্বা বাসায় এলে তাকে বলা হল জিয়ার কথা। আব্বা বললেন মন্দকি।" (নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া– সৈয়দ আবদাল আহমদ, ১ম প্রকাশ – ১৯৯১)

অতঃপর মকবুল নানার প্রস্তাবে ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে মুদিপাড়ার বাসায় তাঁদের বিয়ে হয়। এক বছর পর শাহবাগ হোস্টেলে (বর্তমানে পি. জি. হাসপাতাল) বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান সাধিত হয়। তারপর গণঅভ্যুত্থানকালে চাকুরীর কারণে চট্টগ্রামের ষোলশহরে একটি বাসায় তাঁরা বসবাস করতে থাকেন। তখন তাদের দুই পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেছে। (১) তারেক রহমান (পিনো), (২) আরাফাত রহমান। '৭০-এর নির্বাচনের পরই দেশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পাকচক্রান্ত জালে আটকা পড়ে এদেশের মুক্তিকামী জনসমাজ। ক্ষমতা মুজিবকে না দেয়ার প্রেক্ষাপটে দেশ স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যায় মুজিবকে ফেলে। পাকিস্তানের নিগড়ে থাকতে চায় না এদেশ। জিয়া নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন, আসেন তাঁর সহধর্মিনী বেগম খালেদা জিয়া। গণঅভ্যুত্থানকাল থেকে জিয়া চিন্তিত, তাহলে কি স্বাধীনতার দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এ তাঁর ভাবনা। বাল্যকালের সেই ভাবনা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে জিয়ার মানস-চেতনায়। '৭০-এর নির্বাচনের পরই বাংলাদেশে অবস্থানরত পাক-আর্মীদের মধ্যে শলাপরামর্শ শুরু হয়। কি করে বাংলাদেশকে দাস করে রাখবে, তারই পরামর্শ চলে রাতদিন। মেজর জিয়াও তাদের আর্মী অফিসারদের নিয়ে তা প্রতিরোধের শলা-পরামর্শ করতে থাকেন। চিন্তিত জিয়া, চিন্তিত তাঁর অফিসারবৃন্দ, চিন্তিত সকলেই। তাই একদিন বেগম খালেদা জিয়াকে জিজ্ঞেস করেন, অবশ্য খালেদা আগে থেকেই এ ব্যাপারটা আঁচ করতে পারেন। তবু বলেন, তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে?

www.nagorikpathagar.org

জিয়া একটু চুপ করে থেকে উত্তরে বলেন যে তাঁর (খালেদার) সঙ্গে জরুরী বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করতে এবং সহযোগিতা পেতে চান। খালেদা জিয়ার সম্মতিক্রমে জিয়া বিবরণ দেন, "পাকিস্তানীদের গতিবিধি সুবিধের নয়। ওরা হামলা চালাতে পারে। তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের পাকিস্তানী সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে জেনেছি ওরা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে বিহারীদের বাড়িতে জমা করছে। রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যক বিহারীদের ট্রেনিং দিচ্ছে।"

"খালেদা আঁতকে উঠলেন। তাঁর মনে যেন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল।"

খালেদা জিয়ার উক্তি, "কি করবে এখন?"

জিয়ার জবাব, "একটা কিছু করতে হবে।"

(নন্দিত নেত্রী—খালেদা জিয়া)

খালেদার তেজোদীপ্ত অভিব্যক্তি, "অবশ্যই।"

জেনারেল হামিদ যখন লে: কর্ণেল ফাতমীকে দ্রুত ও কম সময়ে বাঙালিদের দমন করতে বললেন এবং নির্দেশ দিলেন, নিজেদের মধ্যে যেন হতাহত কম হয়।

অতঃপর এসব ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য, "২১-শে মার্চ রাতেই মেজর জিয়া বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাতে গেলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের বাসায়।" মজুমদার এসব ব্যাপারে কিছুই জানে না বলে জিয়াকে জানিয়ে দিলেন— গোপন কথা প্রকাশ না পাওয়ায়, চা খেয়ে বিদায় নিলেন তাঁরা।

২৭-শে মার্চের পর সঙ্গত কারণে সব ফেলে জিয়াকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার ফলে এ মুহূর্তে নেতৃত্ব তাঁর হাতে ন্যস্ত হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। কাজেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে মেয়েদের ও বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে যাওয়ার সময়ও তাঁর হাতে নেই, সময় নিয়ে ওদের নিয়ে যেতে চাইলে ধরা পড়তে হবে তাঁকে। তখন ঘোষক হিসেবে তাঁর মৃত্যু অবধারিত। এছাড়া বিলম্বের কারণে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি দেরি হয়ে যাবে। অনেকে এটাকে যে কোনভাবেই ব্যাখ্যা করুকনা কেন এছাড়া কোন উপায় ছিল না তাঁর। আমিও একই পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হই। রক্ত শপথ রচনা, প্রকাশ ও '৭১-এর ও ২৩-শে মার্চ নওগাঁ বি. এম. সি. কলেজ মাঠে মঞ্চায়ন ও বিতরণের কারণে গ্রামেগঞ্জে রক্তশপথ মঞ্চায়ন ও মুক্তিযোদ্ধা সৃষ্টি হতে থাকে। এদিকে রাজশাহী থেকে পাকবাহিনী নওগাঁর দিকে আসার কারণে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আমি প্রবাসে গিয়ে বঙ্গবাণী পত্রিকা, বেতার ভাষণ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছি, কাজেই লেখক হিসেবে এ কাজটি আমার জন্য সহজ ছিল। কিন্তু রক্তশপথের লেখক ও আ: লীগের নেতৃত্বে থাকার কারণে তবে এটি প্রধান নয়, প্রধান রক্তশপথ রচনা, প্রকাশ ও মঞ্চায়ন) সব ছেড়ে আমাকে যেতে হয়েছিল। জিয়ার কর্মকাণ্ড ছিল আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। সে কারণে তাঁর পক্ষে সব ফেলে যাওয়াই স্বাভাবিক। সে কারণে তিনি বেগম জিয়াকে নিয়ে যেতে পারেননি— বরং দেশমাতৃকার মুক্তির আয়োজনের একজন অগ্রপথিক হিসেবে

www.nagorikpathagar.org

তিনি হাসিমুখে তাঁকে বিদায় দিয়ে সঠিক দায়িত্ব পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব পালনের জন্যই, "খালেদা জিয়া ও দুই শিশুপুত্রকে চট্টগ্রামে রেখেই মেজর জিয়া ঝাঁপিয়ে পড়েন মুক্তিসংগ্রামে। চট্টগ্রামে খালেদা জিয়ার চাচা দেলোয়ার হোসেনের বাসা ছিল। খালেদা জিয়া দুই ছেলেকে নিয়ে চাচার বাসায় আত্মগোপন করেন।"

জিয়াকে এ সংবাদ দেয়া হয়। জিয়াউর রহমান প্রথমের দিকে খালেদার চাচার বাসার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেও মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা ও জেড ফোর্সের অধিনায়ক হিসেবে উত্তর ও পূর্ব বাংলার সার্বিক দায়িত্বে থাকার কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাছাড়া খালেদা জিয়া চট্টগ্রামে থাকা নিরাপদ নয় বলে ঢাকায় চলে আসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দেশের জন্য তাঁর স্বামীকে বিদায় দিলেও দুই সন্তানকে রক্ষার জন্য খালেদা মানসিক অস্থিরতায় ভুগতে থাকেন। কি করে চট্টগ্রাম থেকে পালাবেন সে পথ খুঁজতে থাকেন তিনি। খালেদা জিয়া আগে থেকেই নামাজ-রোজা করতেন, এখন থেকে তিনি সবসময় নামাজ পড়তেন ও আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। অবশেষে এখান থেকে ঢাকায় যাওয়ার জন্য, "খালেদা জিয়া ছোট চাচাকে পাঠালেন ঢাকায় বড় বোনের (খুরশীদ জাহান) বাসায়।" তার চাচা খুরশীদ জাহানকে বলেন যে তিনি খালেদাকে হাতিয়ায় তার মেজ চাচার ওখানে পাঠাতে চান। খুরশীদ জাহান তার উত্তরে বলেন, "(খালেদাকে) ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। এখানে ওকে আমরা নিরাপদে রাখব।"

কিভাবে পাঠানো হবে তা আলোচনা করে স্থির হয় যে চট্টগ্রাম থেকে খালেদাকে নৌকা যোগে নারায়নগঞ্জ পাঠানো হবে এবং সেখান থেকে খুরশীদ জাহান তাঁকে নিয়ে যাবেন। তাঁর চাচার বাসা থেকে, "একাত্তরের ১৬-মে খালেদা জিয়া বোরকা পরে চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে এলেন নারায়ণগঞ্জ। সেখান থেকে বোনের বাসায়।" নারায়ণগঞ্জ থেকে তাঁকে কৌশলে নিয়ে আসতে হয়েছে খুরশীদ জাহানের বাসায়। এ সম্পর্কে খুরশীদ জাহান বলেন, "রাত দশটা থেকে ঢাকায় কারফিউ। তাই আগেই পৌঁছতে হবে। পথে যেতে বিপদ না হয় এবং খান সেনাদের শ্যেন দৃষ্টি এড়াতে পারি সে জন্য গাড়িতে আমরা রেড ক্রসের ছাপ লাগিয়ে নিলাম।"

এখন আমরা একটু অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে শেখ মুজিবের বন্দীত্ব গ্রহণের পর পাকসেনারা বেগম মুজিব ও তাঁর সন্তানদের মুজিবের বাসায় নিরাপদে থাকতে দেন এবং তাদের জন্য ১৫০০/ টাকা (পনের শত) মাসোহারা বন্দোবস্ত করেন। তখনকার বাজারে সে টাকায় তাঁদের ভালমত চলে যেত। আপনারা মুক্তিযুদ্ধের এ দ্বিমুখীচিত্র দেখতে পাচ্ছেন। পাক পাহারায় ও তাদের সঙ্গে গল্পগুজবে কাটিয়ে দেন মুজিব-পরিবারের সদস্যগণ। আর আমরা ও আমাদের স্ত্রী-পুত্র নির্মম বাস্তবতার শিকার হয়ে মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

ইতোমধ্যে পাকসেনাদের কানে যায় বেগম জিয়া তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে মোজাম্মেল সাহেবের বাসায় আত্মগোপন করে আছেন, তাঁকে সরিয়ে না ফেললে ধরা পড়ার ভয়। সে কারণে খুরশীদ জাহান তাঁর স্বামীকে নিয়ে তাদের শংকরে টুনটুন মামার বাসায় পাঠিয়ে দেন ২৮ মে। সেখানে নিরাপদ নয় জেনে তাদের আবার পাঠানো হয় সম্পর্কিত আত্মীয় মজিবুর সাহেবের বাসায়। কিন্তু তাঁর বড় ভাই তাঁদের বাড়িতে থাকতে দিতে রাজী হন না। অগত্যা মজিবুর সাহেবের সহকর্মী ভূতত্ত্ব ও জরিপ বিভাগের ডেপুটি

www.nagorikpathagar.org

ডাইরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহ সাহেবের বাসায় ৩-রা জুন তারিখে পাঠিয়ে দেন। পাক সেনাগণ আবার মোজাম্মেল সাহেবের বাসায় যেয়ে জিয়া পত্নী কোথায় আছে তা জানানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করে। তাঁদের উপর অত্যাচার (মারপিট) ও বাড়ি তল্লাসি করা হয়। ছেলেদেরও জিজ্ঞাসা করা হয়। তাঁরাও জবাব দেন তারা কোথায় তা তাঁরা জানে না। তবুও তাঁরা পালিয়ে সূত্রাপুর বাসায় গিয়েও নিস্তার পান না। খুরশীদ জাহানের উক্তি, "ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ ও ক্যাপ্টেন আরিফের নেতৃত্বে বাড়িটি ঘিরে ফেলে।.... আমাদের সঙ্গে পুতুল ও জিয়ার গ্রুপ ছবি বের করে দেখায়। আমরা স্বীকার করলাম। এরপর বিকাল পাঁচটায় আমাদেরকে সামরিক বাহিনীর একটি গাড়িতে করে মালীবাগ মোড়ে আনা হয় এবং মৌচাক মার্কেটের সামনে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হয়। এরপর তারা জানায় পুতুলকে তারা গ্রেফতার করেছে।"

খালেদাকে তারা গ্রেপ্তার করে ২-রা জুলাই '৭১ সালে। এস. কে. আবদুল্লাহর সিদ্ধেশ্বরী বাসা থেকে। বড় ছেলে পিনোর বিবরণ, "গ্রেফতারের দিন আম্মু আবদুল্লাহ চাচার বাগানটিতে (খালেদা সবসময় আত্মগোপন করে থাকতেন এবং নামাজ কালাম নিয়ে দিন অতিবাহিত করতেন, হঠাৎ সেদিন) হাঁটছিলেন, এমন সময় পাক আর্মীর জীপ এসে বাড়ি ঘেরাও করল। এরপর আম্মু, আমরা দুভাই, আবদুল্লাহ সাহেব ও মজিবুর রহমানের চোখ বাঁধল।...... চোখ বাঁধা অবস্থায় জীপে করে প্রথমে পুরানা সংসদ ভবন ও পরে ক্যান্টনমেন্ট আর্মী অফিসার্স মেসে নিয়ে যায়। এল প্যাটার্ণ একটি ঘরে দুভাই ও আম্মুকে রাখা হয়। আম্মুকে একেবারে বেরুতে দেয়নি। .... বন্দী অবস্থায় ঘরে আম্মু সবসময় নামাজ পড়তেন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন।" পরে খুব বেশি যুদ্ধ শুরু হলে খালেদাকে রাখার ঘরের এক অংশ বোমার আঘাতে ভেঙ্গে যায়। বেগম খালেদা এ সময় দুই সন্তানকে বুকে ধরে কাঁদেন আর আল্লাহর নিকট থেকে সাহায্যের জন্য দোয়া করতে থাকেন। "পুতুলের দায়িত্বে ছিলেন মেজর কিয়ানী। তিনি হাজ্ব করে এসেছিলেন। পুতুলকে একটি নামাজের বিছানা দিয়ে বলেছিলেন, "নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে।" খালেদা সাড়ে পাঁচ মাস ক্যান্টনমেন্টে বন্দী থাকার পর ১৬-ই ডিসেম্বর সকালে মুক্তি পান। খুরশীদ জাহানের বাড়িতে তাঁরা এসে ওঠেন। খালেদার মনে উৎকণ্ঠা, জিয়ার কি হল, এখনও সে ফিরছে না কেন? কিছু হয়নিতো তাঁর। খারাপ চিন্তা মনে আসতেই খালেদার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। যে স্বাধীনতার জন্য এত আয়োজন এত সংগ্রাম আর যে ব্যক্তিটি স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে আরম্ভ করে নয় মাস জীবন পণ লড়াই করেছে সে কি স্বাধীনতা দেখে যেতে পারল না— না অন্য কিছু, অন্য কোন ষড়যন্ত্র শুরু হল। কোন কিছু হলে অবশ্যই তাঁর কানে আসত সে কথা। পথ চেয়ে থাকেন খালেদা জিয়া।

একদিন দুই বোনে বাইরে গেছেন মার্কেট করতে। মার্কেট সেরে বাড়িতে ঢুকতেই দু'তলার বারান্দা থেকে ছেলেরা চীৎকার করে উঠে আব্বু এসেছে, খালু এসেছে, আব্বু এসেছে, খালু এসেছে বলে। উপরে তাকিয়ে দেখল তাঁরা জিয়া হাসিমুখে দু'তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে চোখ পড়তে সজল হয়ে ওঠে দু'জনের চোখ। তারপর জিয়া নিচে নেমে জড়িয়ে ধরেন খালেদাকে।

খালেদা জিয়ার শাসনামলে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যমুনা সেতু বাস্তবায়ন। বাংলাদেশে আধুনিক প্রযুক্তিজাত প্রকল্প যখন থেকে কার্যকর হয়েছে, তখন থেকেই

www.nagorikpathagar.org

যমুনা সেতু প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য এ দেশের জনসাধারণ দাবী জানিয়ে আসছে। জনতার মুখপাত্র হিসেবে মওলানা ভাসানী সিরাজগঞ্জ টাঙ্গাইলের জনসভায় দাবী জানানো ব্যতীত ইংরেজ আমল থেকে যমুনার উপর দিয়ে সেতু নির্মাণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে আসছেন তিনি। তাঁর এ দাবী কখনওবা সরকারের নথিভুক্ত হয়ে সরকারের মাঝে আলোচনা হয়েছে, কখনও কোন সরকার একে আমলের মধ্যেই আনেনি। তবে যমুনা সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাকে কেউ সরাসরি অস্বীকার করেননি। স্বাধীনতা উত্তরকালে মুজিব বা অন্যান্য মন্ত্রীর মুখ দিয়ে যমুনা সেতু নির্মাণের কথা উঠলেও তা যোগাযোগ মন্ত্রণালয় একে গুরুত্বের সঙ্গে আমলে আনেনি। ফলে যমুনা সেতু নির্মাণ অনিশ্চয়তার মাঝে হারিয়ে যায়।

অতঃপর আসে জিয়াউর রহমানের শাসনকাল। তাঁর আমলে গণতন্ত্রপুনঃপ্রবর্তন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারাকে সাংবিধানিকভাবে গ্রহণ ও বাঙালি জাতীয়তা প্রত্যাহার এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে যমুনা সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। তখন জিয়াই প্রথম সরকারীভাবে যমুনা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে তা তালিকাভুক্ত করেন। অতঃপর তাঁর শাহাদৎ বরণের পর জিয়ার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহনের পদক্ষেপ হিসেবে এরশাদ অর্থযোগানোর ব্যাপারে দেশ-বিদেশে এ ব্যাপারে চেষ্টা করতে থাকেন এবং যমুনা সেতু টোল আদায়ের ব্যবস্থা নেন। অতঃপর এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। খালেদা জিয়া যমুনা সেতু নির্মাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই যমুনা সেতু নির্মাণের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যমুনা সেতু নির্মাণের সমাপ্তি লগ্নে আওয়ামী লীগের হাসিনা সরকার প্রধান ইতঃপূর্বের সব জয় ছিনিয়ে নেয়ার পথ ধরেই যমুনা সেতু নির্মাণের সফলতা নিজের বলে চালিয়ে দিয়ে যমুনা সেতু নির্মাণের জয়কে ন্যাক্কার জনকভাবে ছিনিয়ে নিয়ে ইতিহাসকে পূর্বের মতই বিকৃত করেছেন— যা কোন দিনই ধোপে টিকবে না। শুধু তাই নয়, খালেদার যমুনা সেতু উদ্বোধনের দিনে হরতাল আহ্বান করে যমুনা সেতু নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করেন তিনি। পরবর্তীকালে খালেদার উদ্বোধনকে মুছে ফেলে দিয়ে নিজে যমুনা সেতু উদ্বোধন করেন ও তার পিতার স্বপ্নের সেতুকে তার পিতার নামে নামকরণ করেন। পূর্বের ঘটনাবলীর মত খালেদা জিয়ার সপক্ষে ইতিহাসজাত এত বেশি ঘটনা ও তথ্য আছে যে তা থেকেই ইতিহাসের সত্য বেরিয়ে আসবে। অতীত-বর্তমান সব ইতিহাসকেই বিকৃত করে চলেছেন হাসিনা। এ সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক কিছু কথা বলা দরকার।

দৈনিক জনকণ্ঠ— ১১ এপ্রিল ১৯৯৪।

ঃ যমুনা সেতুর ভিত্তি স্থাপনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া : জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মহামিলন সেতু।

ঃ ১১ এপ্রিল ১৯৯৪ সারাদেশে হরতাল পালিত (জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মহামিলন সেতুকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য আওয়ামী লীগের হরতাল আহ্বান।

ঃ স্টাফ রিপোর্টার। দেশের মানুষের দীর্ঘলালিত স্বপ্ন যমুনা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর গতকাল (রবিবার) আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া

www.nagorikpathagar.org

যমুনার দুই তীরে হাজারো মানুষের উল্লাসধ্বনি ও করতালির মধ্যে সায়দাবাদে এবং দুর্গাপুরে দু'টি ভিত্তিপ্রস্তরের নামফলক উন্মোচন করেন। যমুনার দুই তীরে এ উপলক্ষে আয়োজিত দু'টি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী (খালেদা) বলেন, যমুনা সেতু হবে দেশের সামগ্রিক ও সুষম উন্নয়ন এবং জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মহামিলন সেতু। দেশের অর্থনীতিতে এ সেতু উন্নয়ন অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রবিবার যমুনার দুই তীরে বয়ে যায় প্রাণের বন্যা। হাজার হাজার মানুষ দেশী-বিদেশী অতিথি, মন্ত্রিবর্গ, সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং উচ্চপদস্থ সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানস্থল হয়ে ওঠে বর্ণাঢ্য ও উৎসবমুখর। জনতার তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ১৯৯৮ সালের প্রথম দিকেই যমুনা সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ্। তিনি বলেন, এ সেতু জাতীয় ঐক্য ও সার্বভৌমত্বকে আরও জোরদার করবে। ঃ

ইংরেজ আমল থেকে যমুনা সেতু নির্মাণকে নিয়ে (সম্ভবতঃ পাকশীর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ নির্মাণকালে) যে চিন্তাভাবনা শুরু হয় এবং এ ব্রীজ নির্মাণের ফলে রেল যোগাযোগও সহজ হয়। সেটা চিন্তার মধ্যে থাকলেও কলকাতা বাংলাদেশের প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ার কারণে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বেশি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকা রাজধানী হওয়ার কারণে এ সেতু নির্মাণের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং ভাসানী পাকিস্তান-পরবর্তী সময়ে তিনি এ ব্রীজ নির্মাণের পক্ষে গণজাগরণ সৃষ্টিতে সক্ষম হন এবং পাক সরকার যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে যমুনা সেতু নির্মাণের জন্য তালিকাভুক্তি এবং এর উপর মন্তব্য প্রদান অব্যাহত থাকে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর এবং '৭৫ সালের পটপরিবর্তনের আগ পর্যন্ত দু-একবার তা আলোচনায় আসলেও নথি-পত্র স্থির থাকে, এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর জিয়া সরকারের আমলে আলোচনা পরিকল্পনা ও নথি-পত্র চলাচল শুরু করে—এটি স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার প্রয়োজনেই করতে হয়। অতঃপর জিয়ার সময়ে তার গতি কিছু বৃদ্ধি পায় এবং অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। তারপর ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, দেশ- বিদেশ থেকে টাকা সংগ্রহ করেন যা প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা, "এ সেতু যমুনার বিস্তীর্ণ স্রোত ধারায় বিভক্ত দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের সংযোগকারী যমুনা সেতু এশিয়ার দ্বিতীয় দীর্ঘতম সেতু। বাংলাদেশের এ যাবৎকালের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী, বৃহৎ ও ব্যয়বহুল প্রকল্প। বি. এন. পি.-র নির্বাচনী ওয়াদা পূরণের জন্য বেগম খালেদা জিয়া এত বড় সেতু নির্মাণে হাত দেন এবং সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করেন, জমি অধিগ্রহণ, ঠিকাদারের তালিকা তৈরি, টেণ্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে মাটি কাটা, মাটি ভরাট, বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ও পত্র আদান-প্রদান, দেশী-বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ, দেশ-বিদেশ হতে প্রয়োজনীয় মাল-মসলা সংগ্রহ এবং নির্দিষ্ট সময় হতে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হয়। অতঃপর বি. এন. পি. সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা ১৯৯৪ সালের ১০ এপ্রিল রোববার যমুনা সেতু নির্মাণ স্থানের দু'পারে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জনসভা করেন। এ দিন হাসিনার আওয়ামী লীগ সেতু নির্মাণের বিরোধিতা করে হরতাল আহ্বান করেন। তবু খালেদার আমলে যমুনা সেতুর ৮০% কাজ দ্রুত গতিতে সমাপ্ত হয় এবং বাকী কাজের জন্য টাকা-

www.nagorikpathagar.org

পয়সা, জনশক্তি ও মাল-মসলা মজুত থাকে। অতঃপর ১৯৯৬-এর জুন মাসে ভোট কারচুপির মাধ্যমে মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসেন। অতঃপর হাসিনা যমুনা সেতুর সমস্ত জয় ছিনিয়ে নিতে চান। নির্লজ্জ ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে সুচ রাজার চোখের সুচ তুলেই রাজরানী হয়ে যান তিনি। তাঁর ভাষায়, এটি মুজিবের স্বপ্নের সেতু এবং হাসিনা যমুনা সেতু নির্মাণ করেছেন বলে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থানকারী শেখ মুজিবের মত যমুনা সেতুর বিপক্ষে অবস্থানকারী এবং সেতু উদ্বোধনের বিরোধিতা করে ১০ এপ্রিল হরতাল আহ্বানকারী হাসিনা ব্রীজ নির্মাণের জয় ও পিতার স্বপ্নের সেতুর পুনঃ উদ্বোধন ও যমুনা সেতুকে 'বঙ্গবন্ধু' সেতু নাম দিয়ে এবং খালেদার সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে গলার জোরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। কিন্তু ইতিহাসে বেগম খালেদাই উজ্জ্বল হয়ে আছেন এবং ভাসানীর আন্দোলনও ইতিহাস স্বীকৃত আন্দোলন হয়ে আছেন। তিনিই (হাসিনা) ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে হারিয়ে যাবেন। যমুনা সেতুটি স্বাভাবিক নিয়মেই শেষ হল।

এ সম্পর্কে এক কৃষকের বলা গল্প মনে পড়ে গেল। প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী এক কৃষক দুইশত বিঘা জমি নিজের হাতে চাষ করার পরিকল্পনা করেন, সে কারণে তিনি একজন কৃষি-অভিজ্ঞ লোক ঠিক করে বাড়িতে আনলেন। তার কথা মত কয়েক জোড়া বলদ কেনা হল, বীজ কেনা হল, লাঙ্গল, মই বাঁধান হল। উর্বর ২০০ বিঘা জমি যা চাষতে হবে ও বীজ বপন করতে হবে তা ঠিক করা হল। কামলা রাখা হল। তাদের রান্না করে খাওয়ানোর জন্য কৃষাণী রাখা হল।

তারপর যথারীতি কাজ শুরু হল — ডালি, দড়ি, ভার, সার সবই ব্যবস্থা করলেন সেই কৃষক। জমিও চাষ হল ১৮০ বিঘারও বেশি। দু'চার দশ গাঁয়ের লোক জানল তিনি বৃহৎ আকারে কৃষি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। হঠাৎ তার অকর্মণ্য ছোট ভাই শহর থেকে এসে হাজির। তার বড় ভাই তাকে বললেন এ ১৯/২০ বিঘা জমির চাষ দেখাশোনা করতে। তিনি দু'দিনের জন্য বাইরে যাবেন। ছোট ভাই বললেন আচ্ছা যান। কৃষক বাইরে গেলেই ছোট ভাই প্রচার করতে লাগল বড় ভাই সব জমি বর্গা দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে খেতেন। আমিই এ দুশো বিঘা জমি চাষ করলাম ও বীজ বোনার ব্যবস্থা করলাম। যারা তার পান তামাক খায় তারা আড়ালে মুখ টিপে হাসলেও প্রকাশ্যে ছোট ভাইয়ের গুণগান গাইতে লাগল। সকল গাঁয়ের লোক তো অবাক—বলে কি। এতবড় মিথ্যাবাদীও কি পৃথিবীতে কেউ থাকতে পারে তা তাদের জানা ছিল না। সমস্ত জয়কে ছোট ভাই ছিনিয়ে নিতে কি পেরেছে। হাজার হাজার লোক যে জানে এ ইতিহাস। তাই বলি লক্ষ লক্ষ লোককে হতবাক করে মিথ্যা কথা বলা যায় কিন্তু মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না, ইতিহাসকেও বিকৃত করা যায় না। মিথ্যা ইতিহাসের আঁস্তাকুড়েই শুধু নিক্ষিপ্ত হয় না, মানুষের ঘৃণারও পাত্র হয়।

বেগম খালেদা জিয়া ১০-ই এপ্রিল '৯৪ প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সিরাজগঞ্জ সদর থানার শিমুলতলা। অতঃপর দুর্গাপুরের শ্যামশৈল মৌজায় দ্বিতীয় প্রস্তর স্থাপন করেন এবং তা প্রতিহত করার জন্য হাসিনা হরতাল আহ্বান করেন, তবুও লাখ জনতার মাঝে তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

এ অনুষ্ঠানে, "নদীর দুই তীরে প্রধানমন্ত্রী দুটি অনুষ্ঠানের একটি জনসভায় ভাষণ দেন। যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদ, অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, বিশ্বব্যাংকের ঢাকাস্থ

www.nagorikpathagar.org

আবাসিক প্রতিনিধি ক্রিস্টোফার আর উইলবি, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ আর থম্পসন, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানী রাষ্ট্রদূত শিগেও তাকে নাকা এবং যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আলী দুই তীরের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। এছাড়া সায়দাবাদের অনুষ্ঠানে সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক ও স্থানীয় সংসদ সদস্য দুর্গাপুরের অনুষ্ঠানে শাজাহান সিরাজ ও আব্দুস সালাম পিন্টু বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ, উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।" "দৈনিক জনকণ্ঠ ঃ হেডলাইন— যমুনা সেতু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ঃ কিছু ঘটনা কিছু স্মৃতি ঃ যমুনা সেতু ঃ বি. এন. পি.-র সাফল্যের স্বাক্ষর ঃ সংবাদ শিরোনামের অভ্যন্তরের কিছু অংশ এখানে উল্লেখিত হল। "১৯৫৭ সালে ফুলছড়ি ঘাটে মওলানা ভাসানী যে বিশাল কৃষক সম্মেলন করেন সেখানেও তিনি যমুনার সেতু নির্মাণের দাবী করেন।"

.... বেগম খালেদা জিয়ার সরকার প্রাকৃতিকভাবে বিভক্ত দেশের এ দুটি অঞ্চলকে একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একীভূত করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নত করে তোলার জন্য যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের সর্বাত্মক ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ ছিল '৯১ সালের বি. এন. পি.-র নির্বাচনী ওয়াদা। নির্বাচনের পর ক্ষমতায় এসে বেগম খালেদা জিয়া '৯১ সালের মে মাসে যমুনা সেতু প্রকল্পের ছক (পিপি) জাতীয় অর্থনৈতিক নির্বাহী পরিষদ (একনেক)-এর অনুমোদন নেন। অতঃপর সরকারের অনুরোধে বিশ্বব্যাংকের একটি তথ্য অনুসন্ধান দল যমুনা সেতু প্রকল্পের কারিগরি ও অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা পুনরায় যাচাই করেন। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের নির্ণীত সেতু প্রকল্পে ই আর আর ১২%-এর কম হওয়ায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সরকার দেশের প্রখ্যাত ৪ জন অর্থনীতিবিদকে দিয়ে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা পুনরায় পরীক্ষা করান। তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে সেতুটি লাভজনক ও সম্ভব বলে মত প্রকাশ করে ই আর আর ২২% নির্ণয় করেন।

এ পর্যায়ে যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল অলি আহমদ বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থাকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যমুনা সেতু প্রকল্পের যৌক্তিকতা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কৃষিপণ্যের বাজার এবং ধর্মঘট বা প্রাকৃতিক কারণে ফেরি চলাচল বন্ধ হলে কৃষিপণ্য নষ্ট হওয়ার বিষয়টি তাঁদের অবহিত করেন। অতঃপর সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য '৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ওইসিএফ (জাপান)-এর সমন্বয়ে প্রকল্পের যৌথ সমীক্ষা করা হয়। বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদ প্রকল্পের ই আর আর পুনরায় নির্ণয় করার পর বর্তমানের ফেরির তুলনায় প্রকল্পের ই আর আর ১৪.৮৫ শতাংশে দাঁড়ায়। এতে যমুনা সেতু প্রকল্পের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে সেতু প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ত্রিবার্ষিক আবর্তক বিনিয়োগ কর্মসূচিতে কোর প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ প্রকল্পের জন্য ২২৫০

www.nagorikpathagar.org

কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়। এছাড়া প্রকল্পের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে ৪৩০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। সেতুর পূর্ব তীরে বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণের কাজ '৯৩ সালের আগস্ট মাসে শেষ হয়। একটি দেশীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বি. এন. পি. আমলেই '৯১-কাজটি শুরু করে।

১৯৯২ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রাক্ যোগ্যতা নির্বাচন সম্পন্ন করে সেপ্টেম্বর মাসে দরপত্র আহ্বান করা হয়। '৯৩ সালের জুন মাসে ৪টি কন্ট্রাক্টের দরপত্র গ্রহণ করা হয়। সেতু প্রকল্পের মূল অংশের জন্য প্রাপ্ত এ ৪টি কন্ট্রাক্টের দরপত্র প্রকল্পের পরামর্শক ও সেতু কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ন কমিটি মূল্যায়ন করেন। সরকারী ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রী পরিষদ কমিটি '৯৩-এর ডিসেম্বর মাসে সেতু কর্তৃপক্ষের সুপারিশসমূহ অনুমোদন করেন। ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন এবং পরিবেশ সংক্রান্ত এ্যাকশন প্লান তৈরির কাজ শেষ করা হয়। অতঃপর যমুনা সেতু প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য বি. এন. পি. সরকারের যোগাযোগ ও অর্থমন্ত্রী এবং সেতু প্রকল্প কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণ ওয়াশিংটন ও জার্মান সফর করেন। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ওইসিএফ কর্মকর্তাদের স্বার্থে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রকল্পটির অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে তারা সক্ষম হন।

বি. এন. পি. সরকার যখন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট যমুনা সেতু প্রকল্পের অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান, ঠিক সেই সময়ে এ আওয়ামী লীগ এ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ চিহ্নিত রাজনৈতিক মহলটি যমুনা সেতু চায়নি। তাই যমুনা বহুমুখী সেতু বাস্তবায়নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও এঁরা সেতু প্রকল্পের পরিবর্তে ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ নির্মাণের ধুয়া তোলেন।

প্রকল্পের অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর— বেগম খালেদা জিয়া সরকারের দীর্ঘ তিন বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অবশেষে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য বিশ্বব্যাংক, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক ও জাপান সরকারের ঋণদান সংস্থা ওইসিএফ-এর সাথে পৃথক পৃথক তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় '৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ২০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করে এ বছরের মার্চ মাসে। সর্বশেষে ওইসিএফ-এর সাথে '৯৪ সালের জুন মাসে ২০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এসব চুক্তি স্বাক্ষরের আগে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৪টি কন্ট্রাক্টের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং যথারীতি কাজ শুরু হয়ে যায়।

যমুনা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন— উন্নয়নের যাত্রা শুরু ঃ সেদিন আওয়ামী লীগ হরতাল ডেকেছিল।

প্রকল্প বাস্তবায়নের গুরুত্বপুর্ণ সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর (বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও বাস্তব জ্ঞানের অধিকারীগণ বলে থাকেন কোন বৃহৎ কাজের সব আয়োজন সম্পন্ন করার পর সে কাজের অর্ধেক হয় এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আরো চার আনা কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলা যায়। তারপর অবশিষ্ট কাজ আর করতে সময় লাগে না, সেক্ষেত্রে খালেদার আমলে ৮০% শেষ হয়েছে বলা যায়। কাজের হিসেবে ৬০% এবং প্রস্তুতি দৌড়াদৌড়ি, অনুমোদন ইত্যাদি ধরে, ৮০%) '৯৪-এর ১০

www.nagorikpathagar.org

এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেতুর ...... ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ দিন আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতালের (সেতুর প্রকল্পের বিরুদ্ধে) ডাক দেয়।... যমুনার পূর্বপারে একটি জেটি নির্মাণ করা হয়। এখানেই মাটি ভরাট করে ১৫/২০ ফুট উঁচু জায়গা তৈরি করে ঠিকাদারদের নির্মাণ সামগ্রী রাখার ও কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। নদীর উভয় পারে সেতুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ গাইড বাঁধ নির্মাণ কাজের শতকরা ৭০ ভাগ (প্রকৃত তথ্য মতে আরো বেশি) বেগম খালেদা জিয়া সরকারের আমলে শেষ হয়। এ ছাড়া মূল সেতুর শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ কাজ (এটি সম্পন্ন কাজ আর সমস্ত কাজ সেতু জুড়েই সেতুর নানাবিধ কাজ চলছিল— যা সংযুক্ত করলে ৪৫% ভাগ থেকে ৫০% হবে) বি. এন. পি-র আমলেই শেষ হয়। যমুনা সেতুর সাথে রেললাইন, গ্যাসলান বসানোর সিদ্ধান্তটিও বি. এন. পি. সরকারই গ্রহণ করে। মোটকথা বি. এন. পি. সরকারের দুই বছরের বেশি সময়ের মধ্যে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ৬০% ভাগ (ব্রাকেটের তথ্য ও তত্ত্ব মতে ৭৫% কাজ) কাজ সুচারু রূপে শেষ হয়। (আওয়ামী লীগের হরতাল ও অসহযোগিতার ফলে ৩ মাস সেতুর কাজ বন্ধ থাকে এবং এটি শেষ হতে আরো ১০০ কোটি টাকা বেশি লাগে।) (আহমদ নজীর)

তাঁরা ক্ষমতায় বসেই যমুনা বহুমুখী সেতুর নাম পরিবর্তন করে এর নতুন নামকরণ করেন। যমুনা সেতুর নামকরণের ব্যাপারে দাতা সংস্থা ও বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু শাসক আওয়ামী লীগ তাতে কর্ণপাত করেন নাই।" পিতার স্বপ্ন (অলীক) ও হাসিনা সেতু নির্মাণের গৌরব (ইতিহাস বিকৃত যা আজকের লোক জানে) জনগণের মনে হাসির উদ্রেক করলেও তারা একাত্তরের মার্চের মত (স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থানকারী) এ লজ্জাজনক কাজ করে চলেছেন। ১৯৯৮ সালের প্রধানমন্ত্রী হাসিনা যে ভাবে মিথ্যা ও ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে যমুনা নির্মাণের জয়কে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছেন (জনতা সজাগ বলে তা পারেননি, কারণ শতকরা ১০০% লোক একে যমুনা সেতু বলেই ডাকে ও জানে) তেমনি করে নিজেকে তিনি স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি বা তাঁর পিতা স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি বলে উচ্চ কণ্ঠ যা যমুনা সেতুর মতই জয়কে ছিনিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা। যে জয় জিয়ার, বেগম জিয়ার ও বি. এন. পি.-র (মুক্তিযুদ্ধের রক্তসাগরে স্নাত দল হিসেবে)— তা কেউ ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এখানে পূর্বের প্রবন্ধের কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে যমুনা প্রকল্পের ঐতিহাসিক অধ্যায় শেষ করব।

যমুনা সেতুর ভিত্তি স্থাপন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া— জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মহামিলন সেতু।

"প্রধানমন্ত্রী (খালেদা) তাঁর বক্তৃতায় যমুনা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকে দেশের ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় (বি. এন. পি-র) এটি একটি মাইল ফলক। তিনি বলেন, দেশের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়নের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে আমি আনন্দিত।

খালেদা জিয়া বলেন, বিশাল যমুনা দেশের দুই অঞ্চলকে বিভক্ত করে রেখেছে। দেশের সমন্বিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে যমুনা একটি বড় বাধা। পূর্বাঞ্চল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এটি অসম আর্থ-সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তিনি

www.nagorikpathagar.org

বলেন, যমুনা সেতু দেশের যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। উত্তরাঞ্চলে কৃষির উন্নয়নে ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশ ঘটবে। গ্যাস সরবরাহের ফলে গাছ কাটা বন্ধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা সহজ হবে। সেতু বাস্তবায়নে সাহায্যকারী বন্ধু দেশ ও দাতা সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী (খালেদা) বলেন, জনগণের ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সেতুর জন্য জমি অধিগ্রহণ করায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দী আমাদের দ্বারপ্রান্তে এবং এ শতাব্দী হবে যোগ্যতরদের বেঁচে থাকার শতাব্দী। এ বাস্তবতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে জোরদার করতে যমুনা সেতু অবদান রাখবে বলে তিনি আশা করেন। .... যমুনা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিনে একটি দল স্বৈরাচারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হরতাল ডেকেছে। এরা দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে চায়।

অলি আহমদের ভাষণ—অনুষ্ঠানে যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদ বলেন, যমুনা সেতু জাতীয় অর্থনীতিকে গড়ে তোলার পাশাপাশি সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তিনি বলেন, সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার, সর্বাত্মক উদ্যোগ এবং আন্তরিক প্রয়াসের ফলেই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা— অর্থমন্ত্রী বলেন, যমুনা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানের দিনে একটি দল হরতাল ডেকেছে। আগামী নির্বাচনের সময় তিনি একথা স্মরণে রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। জাপানী রাষ্ট্রদূত শিগেও তাকানাকা বলেন, বাংলাদেশে এটি জাপানের বৃহত্তম প্রকল্প। সারাবিশ্ব এ বৃহৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবে। মি. উইলবি আশা প্রকাশ করেন যে, নির্দিষ্ট সময়ে যমুনা সেতুর কাজ শেষ করা সম্ভব হবে।...... থম্পসন বলেন, যমুনা সেতু প্রকল্প এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের একক বৃহত্তম প্রকল্প।....... শাজাহান সিরাজ যমুনা নদীর নামেই যমুনা সেতুর নাম রাখার দাবী জানান। প্রস্তাবিত ৪ দশমিক ৮ কি. মি. দীর্ঘ যমুনা সেতু।"

যমুনা সেতু বেগম জিয়ার অমর অবদান। তিনিও যমুনার ঐতিহ্যকে মূল্যায়ন করে ভাসানী সেতু, জিয়া সেতু বা খালেদা সেতু রাখেননি। কারণ যমুনা নদী বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র রূপে চিহ্নিত। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম সঙ্গীতের সঙ্গে যমুনা নদী জড়িয়ে আছে। জড়িয়ে আছে রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস হয়ে; বৌদ্ধ, সেন, পাঠান, মোগলদের শাসন, যুদ্ধ পরিচালনা, লোক সাহিত্য-সংস্কৃতি, সঙ্গীত সব কিছুরই প্রাণকেন্দ্র যমুনা-নদী। সেজন্য জনগণের অতীত কাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত তাদের প্রাণের নাম যমুনা। "যমুনার জল দেখতে কাল স্নান করিতে লাগে ভাল"— এ ভাল লাগার আঁর এক নাম যমুনা। সেই নাম যখন খালেদা জিয়া রেখেছেন— তাকে বদলানোর অধিকার আর কারো নেই। হয়ত সে কারণে ৯$\frac{১}{২}$% লোক একে যমুনা সেতু বলে থাকে অন্য নামে কেউ ডাকে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেখানকার চাকমা ও বাঙালি সহ সকলেই বহিরাগত এবং ক্রমান্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকরা বাঙালি ৪১% এবং উপজাতি (বিভিন্ন উপজাতি) ৫৯% এসে বসবাস শুরু করে। ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে প্রথমে ভারতের একটি প্রদেশ (এদেশের একদশমাংস) হিসেবে গণ্য

www.nagorikpathagar.org

করতে চায়। অতঃপর পরবর্তীকালে এদেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করে ভারতের আর একটি প্রদেশ বানানোর চেষ্টার কৌশল করেন। সেজন্য ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি সৃষ্টি করেছে এবং চাকমাদের ভারতের মাটিতে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে এবং তারা ভারতে এসে অশান্তি সৃষ্টি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম দখলের চেষ্টা করছে। এর প্রমাণ হায়দ্রাবাদ ও সিকিম। ভারত তার কৌশলগত পথে প্রথমে সিকিমে অশান্তি সৃষ্টি করে। অশান্তির জ্বালা ও সিকিমে অবস্থিত ভারতের চর এ সুযোগ কাজে লাগায়। তারা এ যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য সিকিমে ভারতীয় দেওয়ানের মাধ্যমে শাসন চালানো সিকিমের সরকারি সিদ্ধান্ত। অবশ্য বাধ্য হয়ে তা আইনে পাস হয় এবং ভারতের নিযুক্ত দেওয়ানই সিকিম পরিচালনা করতে থাকেন। অতঃপর নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে ভারতের শাসন স্থায়ী হয় এবং ভারত সমর্থনপুষ্ট লেন্দুপ দর্জীর দল বিজয়ী হয়ে সিকিমের রাজার পদ বিলুপ্ত হয়। ১৯৭৫ সালে ১০-ই এপ্রিল এবং "সিকিম ভারতীয় সাংবিধানিক অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়" এবং অতঃপর "১৯৭৫ সালের ২৬-শে এপ্রিল ভারতীয় পার্লামেন্টে ভারতীয় সংবিধানের ৩৮ তম সংশোধনীর মাধ্যমে সিকিমকে ভারতের ২২ তম প্রদেশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এভাবেই সিকিমের স্বাধীনতা হারিয়ে যায়।" ঠিক একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা এদেশকে অস্থির করে তুলল ভারতে ট্রেনিং দিয়ে এসে। তাদের সঙ্গে ১৯৯৭ সালের ২-রা ডিসেম্বরে বাংলাদেশের সঙ্গে যে শান্তি চুক্তি হল– তা যে সিকিমের পথ ধরে ভারতের অঙ্গরাজ্য প্রদেশ হওয়ার ধীর পদক্ষেপ। লেন্দুপ দর্জীর মাধ্যমে (সিকিমের বিশ্বাস ঘাতক) ভারত অবশেষে ২২ তম প্রদেশ করে সিকিমকে। মনে হয় শেখ হাসিনা লেন্দুপ দর্জীর মতই সে পথে যাচ্ছেন। ভারতে ট্রেনিং প্রাপ্ত চাকমাদের সঙ্গে কেন শান্তি চুক্তি করলেন— তা দেশবাসী এই ভেবে নিয়েছে, আমরা হয়ত সিকিমের মত ভারতের প্রদেশ হতে যাচ্ছি। কিন্তু তা হতে দেয়া যায় না। চাকমাদের অত্যাচার অশান্তির একটি চিত্র এখানে তুলে ধরতে চাই। "চুক্তি অনুযায়ী বিগত ২২ বছরে শান্তিবাহিনীর যেসব বিচ্ছিন্নতাবাদী ভারতের আশ্রয়ে গিয়ে, ভারতীয় অস্ত্রের দ্বারা ট্রেনিং নিয়েছে, ভারতীয় মদদ পুষ্ট হয়ে ১০ হাজার বাঙালি মুসলমানকে হত্যা করেছে, ৬০০-এর বেশি বাঙালিকে পঙ্গু করেছে, ২ হাজারের উর্ধ্বে বাঙালি এখনও নিখোঁজ রয়েছে। যে শান্তিবাহিনীর হাতে কত সেনা সদস্য যে মারা গেছে, পঙ্গু হয়েছে, সে হিসেব দেশবাসীর জানা নেই।" অথচ তাদের জমি, চাকরী, টাকা দিয়ে সমস্ত বাঙালিদের অধিকার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে তুলে নিয়ে তাদের প্রায় স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

হাসিনা সরকার শান্তিচুক্তির যেসব ধারা আরোপ করেন তার মধ্যে বাঙালি বা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের নাগরিকদের সেখানে কোন অধিকার নেই, অথচ তারা পূর্ণ অধিকার ভোগ করবে এদেশের সকল অঞ্চলে। "সন্তু লারমার শান্তিবাহিনীর দল প্রয়োজন হলে ঢাকায় এসে বঙ্গভবন, গণভবনসহ যে কোন জায়গায় সম্পত্তি কেনার অধিকার রাখে। কিন্তু বাংলাদেশের ১২ কোটি স্বাধীন নাগরিক পার্বত্য চট্টগ্রামের এক ইঞ্চি জমিও কিনতে পারবে না। চুক্তি অনুযায়ী সন্তু লারমার দল দেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী কিংবা এম পি হতে পারবেন। কিন্তু বাংলাদেশের অন্য কোন নাগরিক পার্বত্য চট্টগ্রামে থানার দারোগাও হতে পারবে না। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বাঙালিরা সেখানে পরিষদ চেয়ারম্যানের পদেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।"

www.nagorikpathagar.org

চাকমাদের ইতিহাস রচয়িতা সতীষ ঘোষের মতে, "চাকমাদের আদি নিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, তারা বাইরে থেকে এসেছে।" তিনি চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত (রাঙামাটি ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯৬৯) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "চাকমাদের পূর্ব পুরুষেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিজ সন্তান নহে— তাহা স্পষ্ট।" পৃ. ১৪। এমনিভাবে বহু প্রমাণ আছে যে তারা সেখানকার অধিবাসী নয় বহিরাগত। বাঙালিও বহিরাগত। চাকমাদের মতই তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত বসতি স্থাপন করে আসছে। অথচ চাকমা নিজেদের আদিবাসী বলে দাবী করে শান্তিচুক্তি, অতঃপর স্বাধীন জুমল্যাণ্ড— বা! চুক্তির কি মাজেজা। কিন্তু আমাদের তা যে কোন মূল্যেই রুখতে হবে। স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এদের রুখব।

"কিন্তু বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষের করণীয় কি? আমরাও কি সিকিমের মত ভারতীয় দাসত্ব মেনে নেব, নাকি জেহাদী জোশ নিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে বলব, "We are a Nation, we do not want to be ruled by you."

সন্ত্রাসী চাকমাদের সঙ্গে সরকারের শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত হওয়ার প্রাক্কালে তাদের বাঙালি খেদাও কার্যক্রম তীব্রতর হয়। ১৯৯৭ সালের ৯-ই নভেম্বরের দৈনিক ইনকিলাব থেকে সে সন্ত্রাসীর একটি লেখচিত্র তুলে ধরা হল। "হেডিং-পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালি উচ্ছেদ শুরু ঃ জমি ও ভিটেমাটি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।"

"পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে পাহাড়ে গুমরে মরছে চাপা হাহাকার। এ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটিয়েছে তথাকথিত শান্তিবাহিনী। .... অপহরণ, রাহাজানি, চাঁদাবাজির যন্ত্রণায় আবারও অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে পাহাড়ী জনগণ। পাশাপাশি ভারত থেকে আগত চাকমা শরণার্থী পুনর্বাসনের নামে শুরু হয়েছে বাঙালি পরিবারগুলোকে তাদের বসত বাটি থেকে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া। ইতোমধ্যেই সাত শতাধিক পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।"

"চাকমা শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ভারত থেকে বেশ কিছু শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছে। এ সব শরণার্থীর প্রত্যাবাসনের নামে শুরু হয়েছে ব্যাপক বাঙালি উচ্ছেদ।"

এখানে একটা কথা বলা দরকার, শান্তিবাহিনীর লোকেরা সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করার সুযোগ পায় মুজিবের বক্তব্যের সময় থেকে। আমরা বাঙালি বলার মধ্য দিয়ে। চাকমা সাংসদ ১৯৭২ সালের সংসদে তার প্রতিবাদ করেন। ভারতও তার কৌশলে তাদের দেশে চাকমাদের ট্রেনিং দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় এবং অশান্তি সৃষ্টি করে সিকিমের মত পৃথক হওয়ার জন্য। আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পেরেছি চাকমা বা উপজাতি চট্টগ্রামের আদিবাসী নয়। তারা বাঙালিদের মতো বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার আইনত হকদার, যেমন উপজাতি বা চাকমারাও এদেশের যে কোন স্থানে বসতি স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে চিরদিন বাস করতে পারে। এটি এ দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার ও সংবিধান সম্মত বিধান। আর সে কারণেই গরীব ও পরিশ্রমী লোকজন মুজিব, জিয়া, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার সময়ে সেখানে গিয়ে উক্ত অধিকার বলেই বসবাস করতে থাকে বাঙালি। হাসিনার আমলে ভারতের ইঙ্গিতে ও চাকমাদের আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা তা বন্ধ

www.nagorikpathagar.org

করে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেন। এটি সমস্ত বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার হরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। জনগণ ও বাংলাদেশের মানুষ এটা মেনে নিতে পারে না। মুজিব আমরা বাঙালি বলে যে সমস্যার সৃষ্টি করলেন, তা হাসিনা সরকার নতজানু চুক্তির মাধ্যমে তা শেষ করলেন এবং ওই অঞ্চলকে হাতছাড়া করার সমস্ত আয়োজন করলেন। এখন সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে। সিকিমের এ পরাজয়ও আমাদের শিক্ষা দিতে পারল না। আবার এ চুক্তিও হয়েছে হাসিনার ফারাক্কা চুক্তির মত সংসদে আলোচনা না করেই– এটি স্বৈরশাসনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। স্ব-ইচ্ছায় নিজের অধিকার অদূর ভবিষ্যতে পরদেশকে দেয়ার এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক কৌশল ভিন্ন অন্য নামে একে আখ্যায়িত করা যাবে না। এখানে ইতিহাস থেকে হাসিনা ও তাঁর সরকার শিক্ষা নিতে চান না কেন তাও আমরা জানি। তবুও হাসিনা ভারতের ইচ্ছার পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তার সমর্থক আ: লীগ তাকে সমর্থন করছে এবং বুদ্ধিজীবী হাসিনাকে সমর্থন করে আরও একধাপ এগিয়ে গেছেন। একজাতিতত্ত্বের পথে তারা এগিয়ে গিয়ে অঙ্গরাজ্য হিসেবে এ দেশকে তারা সিকিমের মত প্রদেশ করতে চাইছে, তাদের কার্যক্রমে সেটাই প্রমাণিত হয়।

"যুগের ধর্ম এই—পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।" প্রবন্ধে আবদুল হাই শিকদার বলেন, "আওয়ামী লীগের তো অজানা থাকার কথা নয়, এভাবে কারো চাপিয়ে দেয়া নীলনকশা বাংলাদেশে কোন দিন কোনকালে বাস্তবায়িত হয়নি। বাস্তবায়ন যে হয়নি, তার বড় প্রমাণ স্বয়ং মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান। ২৫ বছরের চুক্তির নামে অধীনতামূলক মিত্রতা করেও তিনি ভারতের ভালবাসা পুরোপুরি অর্জন করতে পারেননি। পারেননি বলেই তাঁর বিপদের দিনে ভারত এগিয়ে আসেনি। লেন্দুপ দর্জীকে ব্যবহার করে ভারত সিকিম গ্রাস করেছে। কিন্তু কাজ হাসিলের পর লেন্দুপ দর্জীকে তারা একটা মরা ইঁদুরের মত ফেলে দিয়েছে ডাস্টবিনে। হায়দ্রাবাদ গ্রাসের ষড়যন্ত্রে ভারতের প্রধান সহায়ক ছিলেন হায়দ্রাবাদের প্রধান সেনাপতি এলড্রুজ এবং কে এম মুনসী। কিন্তু কাজ হয়ে যাওয়ার পর এদের ভাগ্যে ভারতের তরফ থেকে জুটেছে কেবল লাঞ্ছনা আর উপেক্ষা। কাশ্মীর দখলে ভারতকে সহায়তা করেছিলেন নেহেরুর জানি দোস্ত শেখ আবদুল্লাহ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দখলকর্ম শেষ হয়ে যাওয়ার পর নেহেরুর কারাগারে শেখ আবদুল্লাহকে তার কৃত পাপের খেসারত দিতে হয়েছে একটানা ১৩ বছর জেল খেটে। এরকম হাজার হাজার উদাহরণ দেয়া যায়।"

পত্রপত্রিকায় যতই শান্তিচুক্তি, শান্তিচুক্তি করে চীৎকার করুক না কেন, চুক্তির নাম–ভূমিকায় শান্তি বা সমঝোতা শব্দটি না থাকায় এটি হয়েছে দুপক্ষের চুক্তি। একপক্ষ বাংলাদেশ সরকার। অপরপক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। কেউ যদি বলে এটি দুই সমশক্তির মধ্যে কতকগুলো বিষয় নিয়ে চুক্তি করা হচ্ছে, তাহলে তাকে কি খুব দোষ দেয়া যাবে? তাছাড়া এদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চলের কিছু লোক বা উপজাতি ভারতে ট্রেনিং নিয়ে আমাদের হত্যা করবে, সন্ত্রাস করবে, লোকদের উচ্ছেদ করবে— তার জন্য কি ভারতের কাছে সেখানে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে কেন বলে কিছু বলার মত আমাদের নৈতিক সাহস থাকবে না? এসব উপজাতিকে কি শায়েস্তা করার অধিকার আমাদের নেই? এসব যদি না-ই থাকে তাহলে কি চুক্তি করে তাদের নিজ অধিকারে

www.nagorikpathagar.org

রাখা যাবে? এসব প্রশ্নের জবাব দেবে কে? যেখানে এ দেশের জনগণ বসবাস করার অধিকার পাবে না, সে অঞ্চলের চুক্তির অপরপক্ষ যদি বলে এ চুক্তির বিষয় অনুসারে আমরা ভিন্ন হয়ে থাকতে চাই, কি বলা যাবে তাদের। সরকারপক্ষ যতই বলুক এটি শান্তি ও সমৃদ্ধির আইন— আসলে খালেদা জিয়ার বক্তব্যই সঠিক, "এটি গণবিরোধী ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী আইন।"

১৯৯৭ সালের ২-রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামোর যে চুক্তি হল তা গঠন প্রকৃতির দিক থেকে স্বাধীনতা মুখী। তাই পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ প্রকৃত অর্থে সংবিধান সম্মত নয়। এ সম্পর্কে ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী বলেন, এ চুক্তি বলে "পার্বত্য তিন জেলা ক্রমে ক্রমে আরো ক্ষমতাধর হয়ে আসলেই বিশেষ, স্বতন্ত্র অবস্থানে যাচ্ছে, যাচ্ছে বিচ্ছিন্নতার দিকে। আর বিচ্ছিন্ন ঐ তিন জেলায় স্বাধীন কেন্দ্রীয় কাঠামো হতে যাচ্ছে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ। শান্তিবাহিনী যা চেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে।"

অতঃপর সাদেক খান রচিত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়ার কবর নামক প্রবন্ধের কিছু বিশেষ অংশ এখানে তুলে দিয়ে ভারত ও হাসিনার স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন— "বস্তুত জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর প্রভাব পার্বত্য উপজাতিগুলোর শতকরা দুই ভাগকেও বিদ্রোহে প্ররোচিত করতে পারেনি। সামরিক ও রাজনৈতিক উভয়দিক থেকে (খালেদা সরকার আমল ও তৎপূর্বের সরকার আমলে) শান্তিবাহিনীর অভ্যুত্থান প্রতিহত হয়েছিল।.... রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান ঐ তথাকথিত শান্তিচুক্তিকে রাষ্ট্রবিরোধী কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রতিটি ধারায় ঐ চুক্তি সংবিধান লংঘন করেছে, ফলতঃ শেখ হাসিনা সরকার যে, সংবিধান রক্ষার শপথ ভঙ্গের দায়ে ক্ষমতায় থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন, একথা বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ (খালেদার নেতৃত্বে) আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছেন। পঞ্চাশ জন সংসদ সদস্য সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েও সে কথা বলেছেন।"

অপরদিকে সরকার ২-রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের অখণ্ডতা বিরোধী ও উক্ত অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে স্বাধীনতার পথে অগ্রসরকামী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত সাংসদদের সঙ্গে সংসদে আলোচনা ব্যতীত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ভূমিকায় আছে, "বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খণ্ডে (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন।

উক্ত ভূমিকার আলোকে চুক্তিটি বিশ্লেষণ করলেও বহু অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

১। এ চুক্তি সংবিধানসম্মত হয়নি, এ চুক্তিতে সংবিধান বিরোধী অনেক বিষয়ও কথা আছে।

www.nagorikpathagar.org

২। আমাদের দেশের কোন অঞ্চলকে নিয়ে এ ধরনের চুক্তি হওয়ার কোন ঘটনা ঘটেনি, ফলে বাংলদেশের ট্রাডিশনকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে।

৩। দেশের সকল লোকের সকল স্থানে গমন, বসতি স্থাপন, জমি ক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার ক্ষুণ্নই শুধু নয় প্রতিহত করা হয়েছে।

৪। জনগণের মতামত বা ম্যান্ডেট ছাড়াই এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় জনতার মৌলিক অধিকার ৩ নং ধারাসহ ক্ষুণ্ন করা হয়েছে।

৫। সংসদে আলোচনা ব্যতীত দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ এরূপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সংসদে আলোচনা করা হলে অনেক গোপন ও নতজানু রহস্য বেরিয়ে আসত।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের দ্বিবিধ অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

(ক) পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্য অঞ্চল থেকে বাঙালি অনুপ্রবেশের অধিকারকে রুদ্ধ করা।

(খ) নিজেদের সকল স্থানে জমি ক্রয়সহ সকল অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দান।

৭। খালেদা জিয়ার সরকারের সময় সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে ওদের সঙ্গে সমঝোতায় আসার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্ত ছিল। তবু হাসিনা সরকার কোন্ অজ্ঞাত কারণে এ শান্ত অধিবাসীদের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে জনমনকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

৮। শান্তি চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে আবার অশান্ত হয়ে ওঠায় এ শান্তি চুক্তি যে অসার— তা প্রমাণিত হয়েছে।

৯। ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মীদের সঙ্গে এ চুক্তি ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ব্যতীত সম্পন্ন করায় ভারতের প্রতি নতজানুনীতি উলঙ্গভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

১০। শান্তিচুক্তি নাম দেয়া হলেও ভূমিকায় কোথাও 'শান্তি' কথাটি কেন নেই, শব্দটি নিয়ে জনমনে ও বুদ্ধিজীবী মহলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

১১। চুক্তির অবয়বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংহতি পরিষদকে একটি সমশক্তি সম্পন্ন বা বাংলাদেশ সরকারের সমশক্তি সম্পন্ন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরা হয়েছে— যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

১২। আসাম-অঞ্চলের স্বাধীনতাকে ভারত প্রতিহত করতে চায়— তা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও মুক্তিযুদ্ধপিয়াসী উলফাদের বাংলাদেশে প্রবেশ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে— ইতোমধ্যে তা প্রমাণিত হয়েছে।

১৩। কলকাতা টু পার্বত্য চট্টগ্রামে ট্রানজিট প্রদানের পরোক্ষ পরিকল্পনাকে (ভারতের) সমর্থন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ভারতের সেনাবাহিনী এদেশের মাঝ দিয়ে উলফা দমনে যেতে পারে।

১৪। জেলা পরিষদ, থানা পরিষদ, পৌরসভা বা সিটি পরিষদের স্বায়ত্তশাসিত আইনের সঙ্গে এ চুক্তি সঙ্গতিপূর্ণ নয় ও এদের অতিরিক্ত স্বাধিকার প্রদান করায় তারা স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে।

১৫। এ চুক্তির ফলে বাংলাদেশের সমউন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা থাকায় অন্য সকল অঞ্চলের জনসাধারণ প্রতিযোগিতায় পিছে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

১৬। সর্বোপরি এ চুক্তির ফলে সে অংশে একটি স্বাধীন চেতনা বা জাতিসত্তার বিকাশ ঘটতে আরম্ভ করেছে— যার আলামত নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কাজেই সংবিধান বিরোধী ও দেশীয় স্বার্থবিরোধী এ চুক্তি কোন অবস্থাতেই স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন করা উচিত নয়। ভারত কূটনীতিতে অত্যন্ত দক্ষ, শোনা যায় তারাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা হতে বাংলাদেশের মানচিত্র তুলে দেয়ার নির্দেশ দান করেন। ত্রিশ বছর পূর্বের সেই কূটনৈতিক পরিকল্পনা আজ বাস্তবের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পতাকায় যে বাংলাদেশের ম্যাপ ছিল তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামও ছিল; ফলে কখনও যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারত কুক্ষিগত করে, তাহলে পতাকার ম্যাপের জটিলতা তাদের পোহাতে হবে না।

যে চাকমা ও উপজাতি, "মুঘল শাসনের দেড় শতাব্দীকাল পরে আসে আজকের চট্টগ্রামে এবং তৎকালের চট্টগ্রামে। এবং চাকমা রাজারা মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, ইসলামী পরিভাষা, আরবী, ফারসী ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং অনেকের মতে, মুসলমান হয়ে যান।" অবশ্য তারা এখন অন্য চেতনার অধিকারী ও তারা পররাষ্ট্র নির্দেশিত পথে চলছে।

সেজন্য স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন— যা ১২-ই মে ১৯৯৮ সালে জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে। এ দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সে কারণে আমি সে আলোচনায় না গিয়ে তার ভূমিকা-লিপি এখানে উদ্ধৃত করলাম। এ প্রবন্ধের নাম : আমাদের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্ব আজ বিপন্ন ঃ বাংলাদেশ রুখে দাঁড়াও।

ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। প্রিয় দেশবাসী। আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনারা জানেন যে, গত বছর ২-রা ডিসেম্বর বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা উপজাতির একাংশের বিদ্রোহী নেতা সন্তু লারমার সাথে একান্ত গোপনীয়তার সাথে একটি চুক্তি সই করে। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি সব চাইতে বিতর্কিত চুক্তি। এ চুক্তির বাস্তবায়ন এবং বৈধতা দানের জন্য বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে সম্প্রতি জাতীয় সংসদে চারটি আইন পাস করা হয়েছে। এ চুক্তি এবং এ আইনগুলো বাংলাদেশের সংবিধান এবং বাংলাদেশী জনগণের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। এ চুক্তি এবং এ আইনগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্ব এবং স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলেছে। এ চুক্তি এবং এ আইনগুলো আমাদের জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করেছে। এ চুক্তি ও আইনের ফলে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাও বিপন্ন হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেখানে বসবাসকারী ১৩টি উপজাতির সবাই বহিরাগত। ১২০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এ অঞ্চল জনসংখ্যার শতকরা প্রায় একভাগ। এ জনসংখ্যার শতকরা ৫২ ভাগ উপজাতীয় এবং ৪৮ ভাগ বাংলাভাষী। এ এলাকার জনসংখ্যা দশ লাখ। চাকমাদের সংখ্যা তার মাত্র ২০ ভাগের মত। ঃ

এখন হাসিনার ভূমিকার বিশ্লেষণ আগেই যা করা হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শুধু জনসংখ্যার ব্যাপারটি নিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাই। তার কথা ও পরিসংখ্যান

www.nagorikpathagar.org

অনুযায়ী দেখা যায় যার সঙ্গে শেখ হাসিনা চুক্তি করেছেন, তারা জনসংখ্যার দিক থেকে অর্থাৎ চাকমা ১০৪০০ জন। সমগ্র দেশের জনসংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য। এ নগণ্য অংশেরই আবার এক অংশ, যাকে কয়েক হাজার বলা যায়, কারণ এখানে বলা হয়েছে, "পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা উপজাতির একাংশের বিদ্রোহী নেতা সন্তু লারমার সাথে একান্ত গোপনীয়তার সাথে একটি চুক্তি সই করে। নগণ্য এ কয়জনের বিদ্রোহ দমন কি এতই কঠিন ছিল? মোটেও নয়। বিদ্রোহ দমন করাও হয়েছিল। তবু এ চুক্তি কেন এর শানেনজুল জানলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেভেন সিস্টারের কোটি কোটি জনতাকে যদি ভারত দাবিয়ে রাখতে পারে। তাহলে আমরা পারি না কেন, তা আগেই বলেছি। ভারতের সহযোগিতায় এ বিদ্রোহ (চাকমা) ও চুক্তি (হাসিনার) বাংলাদেশের ম্যাপ থেকে $\frac{১}{১০}$ অংশ ছিনিয়ে নেয়ার এক পরাকৌশল। দ্বিতীয় $\frac{১}{১০}$ অংশে মাত্র ১০ লাখ বাস করে। কেন বাংলাদেশের অন্য অঞ্চল থেকে জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে না। এ কেমন ধারা এক কোটি লোক যেখানে আয়তন অনুপাতে বাস করতে পারে, সেখানে আর সব বাঙালি ঢুকতে দেয়া হবে না কেন? হাসিনার নিকট এসব প্রশ্নের জবাব চাইতে হবে।

পার্বত্য চুক্তির প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে বেগম খালেদা জিয়ার প্রবন্ধের শেষ অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করতে চাই। "প্রিয় দেশবাসী, অস্তিত্ব রক্ষার চূড়ান্ত সংগ্রামে আমাদের আজ ঠেলে দেয়া হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। আমাদের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার উপর পররাজ্য লিপ্সু হায়েনার থাবা পড়ছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। অস্ত্র নিয়ে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। তারই হাতে গড়া দল বি. এন. পি.। বাংলাদেশের মানুষ আর মৃত্তিকা থেকে উঠে আসা দল বি. এন. পি. (কারণ মুক্তিযুদ্ধের এক সাগর রক্তে স্নাত)। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দৃপ্ত প্রত্যয় বুকে ধারণ করে আমাদের দলের জন্ম।

দেশ, জাতি এবং জনগণের এ বিপন্ন দিনে আমরা তাই নীরব থাকতে পারি না। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীন রাষ্ট্রকে আমরা কিছুতেই সিকিম হতে দিতে পারি না। আমরা কিছুতেই আরেকবার গোলামের জাতিতে পরিণত হতে পারি না। আসুন, আমরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করি, অস্তিত্ব রক্ষা করি, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে রক্ষা করি। আজ আমার আহ্বান বাংলাদেশ রুখে দাড়াও।"

ইতঃপূর্বে বেগম খালেদা জিয়া এ চুক্তি প্রতিহত করার জন্য যে ঐতিহাসিক লং মার্চ করেন এবং এ লং মার্চে রাস্তার দু'ধারে লাখ লাখ জনসমাগম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আমাদের লেবু পানি খাইয়ে যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং খাগড়াছড়ির জনসভাই প্রমাণ করে এ দেশের জনগণ পার্বত্য চুক্তি মানে না। মানবে না কোন দিন। তবু এত প্রতিরোধের মুখে কেন চুক্তি হয় এটিও ভেবে দেখতে হবে।

বেগম খালেদা জিয়া তাঁর শাসনামলে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসকে দমন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন করেন। শুধু চাকমা নয়, সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলের জনগণকে এ আলোচনায় (তাঁর রাজত্বকালে) প্রধান্য দেয়া হয়। অথচ শান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম শেখ হাসিনার সরকারের আমলে কেন তা অশান্ত হল। কেন হাসিনা পূর্ববর্তী সরকারের ধারাবাহিক পথে না গিয়ে হঠাৎ চুক্তির মধ্যে সে অঞ্চলের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করেন, কেন চাকমারা ভারতে ট্রেনিং নেয় এবং ভারত ট্রেনিং দেয়, সবই আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে।

১৯৯৩ সালে ট্রানজিট আদায়ের জন্য ভারতের যেমন চাপ ছিল, তেমনি কৌশলগত কারণে ভারত পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিদের উস্কে দিয়ে তাদের স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখিয়েছে, কিন্তু খালেদার আমলে তারা একধাপ এগুতে না পারলেও হাসিনার দ্বারা পথ তৈরি করে নিয়েছে।

হাসিনা যখন অসম চুক্তি বা নতজানু চুক্তি করতে যাচ্ছেন, সিকিমের মি: দর্জীর মত, তখন বেগম খালেদা তা প্রতিহত করার প্রয়োজনে লং মার্চের মত ঝুঁকিপূর্ণ পথ বেছে নেন। দেশের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে লং মার্চের মত বিপ্লবাত্মক পথে তিনি অগ্রসর হন। তাঁর দৃঢ় মনোবল ও দেশপ্রেমের জন্য এ লং মার্চ সফল হয় এবং জনগণ সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেন। আমি নিজে এ লং মার্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। একজন এমপিসহ কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে যাত্রা শুরু করি। এ লং মার্চ সম্পর্কে ভাষাসৈনিক অধ্যাপক আব্দুল গফুর বলেন (পরে তিনি সাংবাদিকতার পেশা বেছে নেন), "শুধু একদিনের দুদিনের লং মার্চ নয়, সেখানে নিজ অধিকার বলে স্থায়ী বসতি গড়ার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ লং মার্চ হতে হবে প্রধানত অর্থনৈতিক লং মার্চ— খেটে খাওয়া গরীব দুঃখী মানুষদের অস্তিত্ব রক্ষার লং মার্চ, সেই অনাগত লং মার্চের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই এবারকার লং মার্চের উদ্যোক্তা ও অংশগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ মানুষদের প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক সালাম।" বেগম জিয়াই ছিলেন এর উদ্যোক্তা, তা তিনি জেনেও তাঁর নাম কেন উল্লেখ করলেন না তা আমি বুঝতে পারলাম না।

১৯৯৮ সালের ১০-ই জুন ঢাকা থেকে আমরা যাত্রা করলাম বেগম জিয়ার নেতৃত্বে। হাজার হাজার গাড়ির বহর নিয়ে বীরের মত এগিয়ে চললেন খাগড়াছড়ির পথে। কাচপুরে এসে বাধা পেলাম। শত শত ট্রাক, বাস দাঁড় করিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তেজস্বিনী মহিলা যাঁবেন, এ পথ ছেড়ে দেয়ার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। খালেদা নামাজের সময় নামাজ পড়ছেন গাড়িতেই। খাচ্ছেন গাড়িতেই। দু'পাশের গ্রামগুলো থেকে লাখো জনতার ঢল নেমেছে। ম্যাডামকে এক নজর দেখার জন্য। দুপুর গড়িয়ে গেল, গাড়ির বহর ঠায় দাঁড়িয়ে। আমাদের রুটি, কলা ফুরিয়ে গেল। চিড়া চিবোতে লাগলাম। বিকেল গড়িয়ে সূর্য অস্ত যেতে বসেছে, আমরা নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় কে যেন বললেন, আমাদের এখন ঢাকার পথে ফিরে যেতে হবে। দু'একটি গাড়ি যে ফিরে যায় নি একথা বলা যাবে না। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য অনেকে গাড়িতে উঠলেন। এমন সময় ঘোষণা করা হল বেগম খালেদা জিয়া উদয়ের পথে বেরিয়েছেন, ফেরার জন্য নয়। অতএব সকলে যারা আমাদের আদর্শে বিশ্বাসী তারা যাবার জন্য প্রস্তুত থাক। সকলের গাড়ি আবার চট্টগ্রামের দিকে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আমার একটি কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল। "উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।" আমার সঙ্গে ছাত্র সঙ্গী ও এমপি সাহেব আবৃত্তিতে সুর মেলালেন। লাখো জনতার শ্লোগান ভেসে এলো "খালেদা তুমি এগিয়ে চল, আমরা আছি তোমার সাথে।" ১২ কোটি মানুষের অকৃত্রিম ভালবাসা ও দোয়া নিয়ে আমরা

www.nagorikpathagar.org

এগিয়ে চললাম স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে। রাত ৮টায় জনতার ভয়ে ভীত হয়ে পথ থেকে তারা সরে দাঁড়ায় গাড়িগুলোকে সরিয়ে ফেলে। সারারাত ধরে চলে আমাদের পথযাত্রা। দু'পাশের লাখ জনতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলি। যেন পথ বেধে দিল "বন্ধনহীন গ্রন্থি" আমরা সবাই চলতি হাওয়ার পন্থী। এ সম্পর্কে ১১ জুন '৯৮ সালে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় বলা হয় "শাসক দলের দুর্ভেদ্য অবরোধ ভেঙ্গে তছনছ করে ঢাকা-চট্টগ্রাম পথের ৩৫০ কিলোমিটার সড়কে ৩০টি পথসভায় বক্তৃতা করে (আসলে আরো বেশি জনসভায় বক্তৃতা করেন খালেদা) লাখ মানুষের কাফেলা নিয়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল সকাল ৫টা ৫৫ মিনিটে বিজয়ের হীরার মুকুট পরে বীরের বেশে চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছান। এখানে ঐতিহাসিক সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে পৌঁছলে আগে থেকে অপেক্ষমান ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, আলহাজ্জ মঞ্জুর মোর্শেদ খান, কর্ণেল (অব) অলি আহমদ বীর বিক্রম, আবদুল্লাহ আল নোমান, শামসুল ইসলাম, মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, গোলাম আকবর খোন্দকার, গিয়াস উদ্দীন কাদের চৌধুরী প্রমুখ সাদর অভ্যর্থনা জানান দেশনেত্রীকে। এসময় এখানে সারারাত অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান লাখো লাখো মানুষ খালেদা জিয়াকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। দেশনেত্রীর সংযম, ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং একটানা, লং মার্চে ক্লান্তিহীন পরিশ্রম দেখে অনেকের চোখে পানি জমে যায়। অনেক কর্মীকে অঝোরে কাঁদতে দেখা যায় বলে কোন কোন প্রত্যক্ষদর্শী জানান।"

শুধু তাই নয়, রাত ৮টায় কাচপুরে ব্যারিকেড ভাঙ্গার খবর আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর বাসভবন থেকে শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার লাখো লাখো জনতা উত্তাল আনন্দে ফেটে পড়ে। শ্লোগানের ধ্বনিতে মুখরিত হয় ঢাকা শহর। খালেদা তুমি এগিয়ে চল আমরা আছি তোমার সাথে ইত্যাদি। অবশেষে পরেরদিন বিকাল ৩টায় খাগড়াছড়িতে লাখ লাখ জনতার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ অন্তে জনগণের দৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সুর মিলিয়ে খালেদার সঙ্গে তারাও বলেন, এ চুক্তি মানি না মানব না। কালোচুক্তির বিরুদ্ধে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের জন্য তিনি প্রস্তুত। অতঃপর ঐতিহাসিক লং মার্চ ও ভাষণের সমাপ্তি টানেন বেগম জিয়া।

বেগম জিয়ার ৫ বছর—পরিকল্পনা ঃ ইসরাফিল আলম,

সম্পাদনা— দীনেশ দাস। উত্তরা প্রকাশনী– প্রকাশক– আজিজুর রহমান।

"বেগম জিয়ার ৫ বছর"-গ্রন্থের একজন পরিকল্পনাকারী 'ইসরাফিল আলম' তাঁর পূর্বকথা নামক ভূমিকার প্রারম্ভে বলেন "বেগম খালেদা জিয়ার ৫ বছরের শাসনামলে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলার আসামী হয়ে ৩ দফায় প্রায় ১৮ মাস ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতর শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক নিউ ২০ সেলের সেই দুঃসহ বন্দীজীবন যাপনের সময়ই সর্বপ্রথম এ ধরনের একটি বই লেখার ধারণা আমার মধ্যে জন্ম নেয়।" মনে হয়, এ চেতনা থেকেই তিনি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনায় হাত দেন। অবশ্য তিনি ও তাঁর সম্পাদক দীনেশ দাস বেগম জিয়ার শাসনামলকে কুৎসিতভাবে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেছেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা হতে তা সম্পাদনা করে বেগম জিয়ার শাসনামলকে কলংকিত করার চেষ্টা করেছেন— যা সত্য নয়। প্রত্যেক পত্র-পত্রিকাকে খালেদা পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন

www.nagorikpathagar.org

বলে অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী দলীয় পত্র-পত্রিকা তাঁর বিরুদ্ধে অনর্থক যা তা লিখে থাকতে পারেন। এছাড়া বেগম জিয়ার শাসনামলে যে একেবারে দোষত্রুটি ছিল না, তা নয়। কিন্তু এসব পত্র-পত্রিকা তিলকে তাল করেছে, তালকে কিন্তু তিল করেন নি। দলীয় লেখকের উচিত হবে নিজেদের নেতা-কর্মীকে আলেকিত করার চেষ্টা করা এবং বিরোধীদের সমালোচনা করা এবং তা সত্যভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বিরোধী পত্র-পত্রিকাও খালেদার বিরুদ্ধে তেমন কিছু খুঁজে পাননি—সে কথা এ গ্রন্থেই বলা হয়েছে। আমার মনে হয়, ইসরাফিল সাহেব পূর্বকথার প্রারম্ভের দিকে নিজের জেল খাটার ব্যাপারটা যেভাবে উপস্থাপন করেছেন। তা 'ঘোলা জলে' পূর্ণ। কারণ তিনি বলেছেন খালেদার শাসনামলে "একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলার আসামী হয়ে ১৮ মাস বন্দীজীবন যাপন করেছেন। একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও ষড়যন্ত্রমুলক" কথাটি স্পষ্ট নয়। তা স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিল তাঁকে এ কারণে অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়েছে। স্পষ্ট করে না বলাতে লোকে অবশ্যই ভাববেন তিনি এমন কোন অপরাধ করেছিলেন বা অপরাধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন— যার ফলে তাকে সরকার বাধ্য হয়ে বন্দী করেছেন এবং পরে রাজনৈতিক ছায়ায় মুক্ত হয়েছেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করব তিনি যেন স্পষ্ট করে বলেন— তাঁকে একারণে বন্দী করা হয়েছে, যা অন্যায়, তা অবশ্যই তাঁকে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

অতঃপর বলতে হয়, প্রারম্ভে এ ধরনের বক্তব্যের কারণে গ্রন্থের গোটা ঘটনাকেই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে উপস্থাপন করা এবং এর অনেক অংশই সত্য নয়। যাক সেকথা— খালেদা জিয়ার সরকার রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বিল সংসদে এনে তা সংশোধন করে দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। একথা কি তিনি কোন স্থানে বলেছেন— বলেন নি। তবু গ্রন্থ রচনার অধিকার আপনাদের আছে—খালেদা সে স্বাধীনতাই আপনাদের দিয়েছেন। বাকশালী আমলের মত স্বাধীনতাকে হরণ করেননি তিনি, তিনি কোন পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করেননি। মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করেন নি।

বি. এন. পি.-এর বিরুদ্ধে বিশেষ করে স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যেসব কথা বলেছেন, তা সত্যের বরখেলাপ— তা তাদের লেখা একটি উদাহরণ থেকে প্রমাণ করব।

তাঁদের নেতা-নেত্রীর সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনা করলে বোঝা যেত এর মধ্যে ইতিহাসের সত্যতা কিছু আছে। এঁদের দোষ দিয়ে কি হবে। স্বয়ং শেখ হাসিনা ইতিহাস বিকৃতির পথ বেছে নিয়ে এসব ছেলেদের বিপথে চালিত করছেন যা জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না। সে যাক বেগম জিয়ার ৫ বছর গ্রন্থের সূত্র ঃ সাপ্তাহিক মাত্রচিত্র ১২ এপ্রিল '৯৬ (যার নাম আমি প্রথম শুনলাম এবং তার উদ্ধৃতি নয় সূত্র এখানেও মিথ্যার ঘোলা পানিতে তাঁরা মাছ শিকার করতে চাইছেন) থেকে তাঁদের স্বকল্পিত বক্তব্য তুলে ধরে এর পরবর্তীতে জাতীয় পত্রিকা হতে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে প্রমাণ করব শেখ হাসিনার দুর্নীতি, দলীয়করণ কত ব্যাপক ও বিস্তৃতি। এঁরা লিখেছে, "বি. এন. পি-র বিগত ৫ বছরের শাসনামলে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে।" তাদের মতে, "বিদায়ী বি. এন. পি. সরকার দুর্নীতির ক্ষেত্রে এরশাদ সরকারকেও ছাড়িয়ে গেছে।" অবশ্য

www.nagorikpathagar.org

এখানে উপযুক্ত তথ্য দিতে না পারায় তাঁরা আর একটি চরম মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। আমরা জানি এবং সমগ্রদেশ জানে খালেদা জিয়ার শ্রেষ্ঠ অবদান রাষ্ট্রপতি শাসনের পরিবর্তন করে তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র ও মন্ত্রিশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা এবং বাকশালজাত এবং দলীয় শাসন থেকে মুক্তির পথ, ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সংবাদ-পত্রগুলোকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান এমনকি সরকারি কর্মচারী যারা আইনতঃ সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে পারেন না (তাদের দাবী দাওয়া ছাড়া) তাঁদের স্বার্থ প্রণোদিত বক্তব্যকেও সহ্য করেছেন, মহিউদ্দীন খান আলমগীর (সরকারি কর্মকর্তা) তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তারপরেও যখন এঁরা বলেন, "সরকারি নিয়ন্ত্রণের কারণে সংবাদ-পত্রগুলো এসব তথ্য প্রকাশে যথেষ্ট আগ্রহ দেখায় নি।"

কথাটি কয়েকটি কারণে নির্লজ্জ মিথ্যা ঃ

১। স্বাধীনতা-উত্তরকালে দীর্ঘ ২৫ বছরের (১৯৯১–'৯৬) মধ্যে খালেদা সরকারই সর্বপ্রথম পূর্ণ গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২। স্বাধীনতা-উত্তরকালে খালেদা ও তাঁর সরকারই প্রথম সংসদীয় গণতন্ত্র ও মন্ত্রিশাসিত সরকার প্রবর্তন করেন।

৩। তাঁর সময়ই সংবাদ-পত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজ করে ও সংবাদে যে কোন মতামত প্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪। স্বাধীন মত প্রকাশের যে জটিলতা সংবাদ-পত্রের উপর ছিল মন্ত্রিশাসিত সরকারের কারণে এবং খালেদার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তা তিরোহিত হয়।

৫। প্রকৃতপক্ষে খালেদার সময়েই সংবাদ-পত্র ৪র্থ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

৬। একথাগুলো খালেদা জিয়ার সরকারি আমলে এবং হাসিনার রাজত্বকালেও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে হাজারো বার বলা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

বরং বাকশাল-গর্ভজাত আ: লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ-পত্রকে নানাভাবে নাজেহাল করেছেন, কড়া ও বিরূপ মন্তব্য করেছেন সংবাদ-পত্র সম্পর্কে, অনেক কিছুই সেন্সর করছেন তিনি, সংবাদ-পত্রের জবাবদিহিতার কথা তুলছেন বিজ্ঞাপন বন্টন ও নিউজ প্রিন্ট সরবরাহেও দলীয়করণ নীতি অনুসরণ করেছেন এবং সর্বোপরি বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে নিয়েও মন্তব্য করেছেন। কাজেই বুঝতে কারো কষ্ট হয় না, যে হাসিনাই সংবাদ-পত্রের কণ্ঠ রোধে এগিয়ে এসেছেন। সকল প্রশাসনকে দলীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু ও ঐক্যমতের সরকার গঠনের মাধ্যমে একদলীয় বাকশাল গঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন হাসিনা। এ গ্রন্থ যে নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, তা আমার বক্তব্যে অবশ্যই সকলে বুঝতে পেরেছেন। সাপ্তাহিক মাত্রচিত্র পত্রিকা মিথ্যাকে আশ্রয় করেও সত্য গোপন করতে পারে না এজন্য বলতে বাধ্য হয়েছেন, "সরকারি নিয়ন্ত্রণের কারণে সংবাদ-পত্রগুলো এসব দুর্নীতির তথ্য প্রকাশের যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়নি।" আলোচনায় বোঝা গেল সরকারি নিয়ন্ত্রণ সংবাদ-পত্রের উপর ছিল না, গত ৩০ বছরে খালেদা জিয়ার শাসনামলে পত্রিকা সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ মিথ্যে বলে প্রমাণিত হওয়ায় "এসব দুর্নীতির তথ্য প্রকাশে যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়নি" তথ্যটিও ভুল বলে প্রমাণিত হল এবং গ্রন্থটি যে আক্রোশ ও আক্রমণাত্মক মনোভাব

www.nagorikpathagar.org

নিয়ে লিখিত, তা প্রমাণিত হল। পত্র-পত্রিকায় দুর্নীতির এমন কোন সংবাদ না পেয়ে তাঁরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেছেন তথ্য প্রকাশে যথেষ্ট আগ্রহ দেখায় নি।"

আমি এ গ্রন্থ নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না। এজন্য যে যার একটি বা দু'টি তথ্য মিথ্যার দ্বারা পরিবেষ্টিত তাতে যে কি পরিবেশন করা হবে তা সকলেই বুঝতে পারছেন। কথায় আছে না? যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। এ প্রসঙ্গে আমার এক বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে এ বিষয়টির এখানেই পরিসমাপ্তি করব। এক নিমন্ত্রণে আমরা কয়েকজন অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, উকিল ও কিছু সাংবাদিক উপস্থিত ছিলাম। খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাইরের চত্বরে বসে পান খাচ্ছি। এমন সময় রান্নার সুনাম করে একজন বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। আমরা সকলেই সমর্থন করলাম। সত্যিই রান্না ভাল ও তৃপ্তিকর হয়েছিল। একজন চুপ করে আছেন। মুখ গোমড়া আমাদের মধ্যকার একজন বললেন, ভাই আপনি চুপ করে আছেন যে, উনি গোমড়া মুখে বললেন, আপনারা এসব কি বলছেন? লবণ বেশি দিলে কেমন হতো বলুন, রান্না কি ভাল হতো? ধরুন বাবুর্চি যদি আরো ঝাল বেশি দিতেন তাহলে খেতে পারতেন? এসব ভাবছেন না কেন? "দুর্নীতির তথ্য প্রকাশে যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়নি।" তথ্যটি কি সে পর্যায়ে পড়ে না? তাহলেই ভাবুন ব্যাপারটি। আসল ব্যাপার হল খালেদার শাসনামলে দুর্নীতি ছিল না বললেই চলে। সেটাও তাদের সহ্য হয় না। নিন্দুকের মত বলেন— দুর্নীতির তথ্য প্রকাশে (পত্রিকা) আগ্রহ দেখায়নি— দুর্নীতি থাকলে তো আগ্রহ দেখাবে—না এমনি। গোটা গ্রন্থেই এরকম কমবেশি মিথ্যাচার। তাঁদের সকল লেখায় মিথ্যাচার আর ইতিহাস বিকৃতিতে পূর্ণ, কাজেই সেসব বিকৃত বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকাই ভাল।

আমরা জানি, ১৯৭৫ সালে বাকশাল সৃষ্টির মাধ্যমে সব দলকে নিষিদ্ধ করে যে একদলীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন এককালের সোহ্‌রাওয়ার্দীর শিষ্য গণতন্ত্রের ও জাতীয়তাবাদের সমর্থক শেখ মুজিব, তিনি তাঁর ক্ষমতা লোভ, স্বার্থ ও মোসাহেব পরিবেষ্টিত ব্যক্তিদের অতিউৎসাহে সেসব আদর্শকে পদদলিত করে ক্ষমতাকে চিরদিনের জন্য আঁকড়ে ধরতে চান। অতঃপর ক্যু, পাল্টা ক্যু, সিপাহী জনতার বিপ্লবের পথ ধরে ৭-ই নভেম্বর জিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন এবং গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশের হাজার বছরের চলমান ঐতিহ্য বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে আমাদের সংবিধানে সন্নিবেশিত করেন। তা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। মূল্যায়িত করেন বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের আবহমানকালের রীতিকে বাঙালি জাতীয় চেতনার মাঝে ভারতের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়ার সুর তার সমাপ্তি ঘটান। শুরু হয় আবার ষড়যন্ত্র 'র'-এর মাধ্যমে। প্ররোচিত হয়ে এদেশের সিপাহী অতর্কিতভাবে তাকে হত্যা করে ব্যর্থ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষক জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধের রক্তসাগরে স্নাত ব্যক্তি, (দলীয় কর্মী বিভিন্ন দলের) দেশের লেখক, বুদ্ধিজীবী, কর্মজীবী ও কৃষক, শ্রমিক, জনতাকে নিয়ে যে বি. এন. পি. গঠন করেন, তা গণতন্ত্রের পথে ক্রমশঃ বিকশিত হতে থাকে। রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েও এরশাদ এ দলকে পরাভূত করতে পারেন নি। পারেন নি নিশ্চিহ্ন করতে। জিয়ার উত্তরসূরি তাঁরই সহধর্মিণী বেগম জিয়া বি. এন. পি.-র হাল

www.nagorikpathagar.org

ধরে ঝড়-সংঘাত পেরিয়ে আরো সামনের দিকে, গণতন্ত্রের পথে, বাংলাদেশী জাতীয়তার পথে এগিয়ে নিয়ে যান দলকে, দেশকে এবং জনসমর্থনের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী হোন। "১৯৯১ সালে গণতন্ত্রের চারাটি আবারো রোপন করা হল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভূমিতে।" ড. এমাজউদ্দীন আহমদ— বাংলাদেশ ঃ সাম্প্রতিক কালের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, পৃঃ ৬৪।

আমরা জানি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে ১৯৯১ সালের ২৭-শে ফেব্রুয়ারিতে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অবাধ ও সার্বজনীন ছিল। "সেই নির্বাচনকেও এ দেশের কিছু নেতৃবৃন্দ সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'সূক্ষ্ম কারচুপির' অভিযোগ আনেন। ড. কামাল হোসেন ও জোহরা তাজউদ্দীন প্রমুখ নেতা সেই নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ রূপে চিহ্নিত করায় তারা আক্রমণের শিকার হন। ড. কামাল হোসেনের দল ত্যাগের অন্যতম কারণও তাই।" প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বিদুষী স্ত্রী অধ্যাপিকা জোহরা তাজউদ্দীনকে মন্ত্রীত্বের পদ প্রদান ও দলের নেতৃত্ব প্রদান না করার পিছনে— এ হীনন্মন্যতা হাসিনার মনে কাজ করছে বলে অনেকে ধরে নিয়েছেন। যে বি. এন. পি. এবং আ: লীগ (অবশ্য আ: লীগ এরশাদ সরকারের আমলে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে) এরশাদের স্বৈরশাসন অবসানের জন্য যৌথ ও মিলেমিশে আন্দোলন করে এরশাদের পতন ঘটায় এবং গণতন্ত্রের পথ ধরে বেগম খালেদা জিয়া ও তার দল বি. এন. পি. ১৯৯১ সালে সরকার গঠন করে। ক্ষমতার লোভে আক্রান্ত বাকশাল গর্ভজাত আ: লীগ প্রধান শেখ হাসিনা যৌথ আন্দোলনকারী হয়েও শুধু মাত্র ঈর্ষার কারণে, "বেগম খালেদা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলে অভিষেক অনুষ্ঠানে কোনো বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হননি, তাঁকে এবং তাঁর দলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন দূরে থাক।" যদিও একত্র হয়ে এরশাদ হঠাও আন্দোলন করেছিলেন তাঁরা, তবু খালেদার প্রধানমন্ত্রিত্বকে সহ্য করতে পারেন নি হাসিনা। গণতন্ত্রের পথে এভাবে কোনকালেই তারা আসতে চাননি। যা পৃথিবীর সব দেশেই বিরোধী দল হয়ে করে থাকে। উদগ্র প্রতিহিংসাপরায়ণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ক্ষমতা হারানোর বেদনা। তা গণতন্ত্রের পথে হলেও সহ্য করতে পারেন নি শেখ হাসিনা ও তাঁর দল। হাসিনার সঙ্গে একসাথে কাজ করার কারণে আনন্দের সঙ্গে যা করা উচিত ছিল, তা হাসিনা না করার কারণে ১৯৯৬ সালে হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হলে (তখন দু'পক্ষ চরম বিরোধিতার সম্মুখীন)— বেগম খালেদা জিয়াও তাঁর দলীয় ভাবাদর্শকে নত না করার জন্য যাননি। পূর্বের ঘটনায় ছিল অপরাধ প্রবণতা এবং পরের ঘটনা ছিল ধারাবাহিকতার নিদর্শন। শুধু তাই নয়, বিদ্রোহী নেত্রী হাসিনা বলেছিলেন সে দিনকালে, "ক্ষমতাসীন বি. এন. পি.-কে একদিনের জন্যেও শান্তিতে থাকতে দেয়া হবে না। আসলে হয়েছিলও তাই। জাতীয় সংসদ থেকে বারে বারে ওয়াক আউট করে শেষ পর্যায়ে ১৯৯৪ সালে ২৮-শে ডিসেম্বর সকল বিরোধী দলের সদস্যগণ (জামাতই ইসলাম তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে) জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করে সংসদকে অকার্যকর করে তোলেন। ক্ষমতাসীন দলের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে এবং নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে ১৭৩ দিন ধর্মঘট পালন করে দেশব্যাপী এক নৈরাজ্য সৃষ্টি করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি।" (ইত্তেফাক ১২-ই এপ্রিল ২০০০ সাল) যদিও তাঁরা জানতেন এ বিল পাস করতে হলে ২/৩ অংশ সাংসদ প্রয়োজন—

www.nagorikpathagar.org

তা জেনেও তাঁরা পদত্যাগ করেন। ক্ষমতাসীন বি. এন. পি.-কে একদিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে তাঁরা দেয়নি। তবে বেগম জিয়া নিজের শান্তি ও ঘুমকে হারাম করে জাতিকে ও জনগণকে শান্তি দেয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি ও তাঁর সরকার। কিন্তু হাসিনা ক্ষমতায় এসে জনগণের শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে, তাঁদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। ১৯৭৩ – '৭৫-এর দুঃশাসন এবং বাকশাল ভর করেছে যেন হাসিনার চেতনায়।

বি. এন. পি.-ই শুধু জামাতই ইসলামকে নিয়ে জোট বাঁধেনি, ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগও বেধেছে সেকথা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। তবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের জোট বাঁধা ও বি. এন. পি.-র সঙ্গে তাদের জোট বাঁধার মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। তাহলো আওয়ামী লীগ জামাতকে যে রাজাকার হিসেবে গাল দেয়— তা সত্য নয়। রাজনীতির চেতনায় তারা সমগোত্রীয়। আওয়ামী লীগের ইতিহাস বিকৃতির সঙ্গে জামাতও একাত্ম হয়ে কাজ করতে চায়; জামাতই ইসলাম নিজেদের রাজাকার বলতে নারাজ—আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট বেঁধে প্রমাণ করে তারা রাজাকার নয়। তাছাড়া ঘাদানির বিরূপ সমালোচনা বন্ধ করা। বি. এন. পি.-র সঙ্গে জোট বাঁধার প্রধান কারণ সময়ের ব্যবধানে তারা পাক বা ভারত চেতনা হতে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে বিশ্বাস করে কাজ করছে। ভারত মুসলমানদের চিরশত্রু তা বাবরী মসজিদ উচ্ছেদই প্রমাণ করে। সেজন্য ভারতের লেজুড় দল থেকে সরে এসে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা। পাকপ্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষার জন্য অতীতকে ভুলে মুক্তিযুদ্ধের রক্তসাগরে স্নাত বি. এন. পি.-র সঙ্গে থেকে জাতীয় রাজনীতিকে উৎসাহিত করা। আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামাতের জোট এবং বি. এন. পি.-র সঙ্গে জামাতের জোটের মধ্যে এসব মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। যেন আওয়ামী লীগ বোঝাতে চায় জামাত তাদের সঙ্গে থাকলে রাজাকার বলে গাল খাবে না। বি. এন. পি.-র সঙ্গে থাকলে রাজাকার, স্বৈরাচার (এরশাদ) বলে গাল দেয়া হবে। এখন গাল খাবে না আমার সঙ্গে যাবে বল। ক্ষমতালিপ্সু আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী ও ক্ষমতালোভী নীতি দেখেছি ১৯৭১-এর মার্চে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনার ফলে। তাজউদ্দিন স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ না করলে একাত্তরের জটিলতা আরো বৃদ্ধি পেত। মিথ্যাচার তাদের চরিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, যাকে আর কোন দিনই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। বাধ্য হয়ে সমমনা ও পরিবর্তিত মানসিকতার দল ও লোকদের নিয়ে জাতির বুক থেকে এ জগদ্দল পাথর সরিয়ে ফেলার আন্দোলনে নেমেছেন বেগম খালেদা জিয়া। জনগণকে এ যন্ত্রণাকাতর অবস্থা থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে এসেছেন তিনি ও তাঁর মুক্তিযুদ্ধের আলোকে আলোকপ্রাপ্ত দল বি. এন. পি.।

স্বাধীনতা-পরবর্তী আওয়ামী লীগ প্রধান ও তৎকালীন সরকারপ্রধান শেখ মুজিব বিশেষ ক্ষমতা আইন (Special Power Act) নামক নির্যাতনমূলক আইন প্রণয়ন করে বিশেষ ক্ষমতার দাপটে প্রতিপক্ষকে দমন, নির্যাতন, জেল, জুলুম চালিয়ে গেছেন। রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি করে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের আদর্শবান নেতা-কর্মীও তাদের অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পায়নি।

দীর্ঘ ২১ বছর ধরে এ আইন বলবৎ থাকলেও এসময়কালের সরকার ও সরকার প্রধান বিশেষ করে জিয়াউর রহমান এবং তাঁরই উত্তরসূরি বেগম খালেদা জিয়ার আমলে

www.nagorikpathagar.org

এর অপপ্রয়োগ হয়নি। "১৯৭৪ সালে কুখ্যাত এ ... আইনটি প্রণীত হবার পর পরই যেমন ব্যাপকভাবে তার প্রয়োগ হয়েছিল, ১৯৯৬—'৯৮ সময়কালে তেমনি এর প্রয়োগ ঘটে।" মুক্তকণ্ঠ, ১৩-ই জানুয়ারি –১৯৯৯।

বেগম জিয়ার শাসনামলে এর উন্নতি ও উন্নয়নের রাজনীতি দেখে পৃথিবীর দাতাদেশ ও বন্ধু দেশগুলো এদেশের প্রশংসায় মুখর ছিলেন। সকল বস্তু তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ছিল। নির্যাতন, হত্যা, লুট, সন্ত্রাস, ধর্ষণ ছিল না। সেকথা শত্রুও স্বীকার করেছেন। দেশের আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছিল। শেয়ার মার্কেটে প্রাণসঞ্চার হয়েছিল, সাধারণ মানুষ খেয়ে পরে বেঁচে থাকত। হাইজ্যাক, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যার শিকার হতে হয়নি কাউকে। সেজন্য বেগম খালেদা জিয়ার আমলের শাসন ব্যবস্থাকে এবং দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে একে বলত "উঠতি ব্যাঘ্র" অর্থাৎ An Emerging Tiger-রূপে বাংলাদেশকে আখ্যায়িত করা হতো। বর্তমানে অর্থাৎ শেখ হাসিনার শাসনামলে সব কিছু নেতিয়ে পড়েছে, শুধু আছে তাদের বিধি-বিধান নির্যাতন। ফলে একে অবোধ মেষশাবক-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন অনেক গুণীজন। ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নির্যাতনের পথে এগিয়ে চলেছেন শেখ হাসিনা ও তাঁর দল। স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া একদিকে নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাচ্ছেন। অপরদিকে প্রতিবেশী আগ্রাসী শক্তির থাবা থেকে দেশকে রক্ষার জন্য নিজ দলসহ সকল দলমতনির্বিশেষে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। তার বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। শেখ মুজিবের শাসনামলের এক নতুন চিত্র শেখ হাসিনার রাজত্বকালেও পরিলক্ষিত হয়।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, খালেদা জিয়ার রাজনীতি এক গতিশীল প্রবাহের মত, নির্ঝরের মত ছন্দময়, তটিনীর মত প্রবাহমান, প্রকৃতির মত জীবন্ত, মানুষের আনন্দময় চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অথচ তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ী, আকাশের মত উদার এবং পর্বতের মত উন্নত ও দৃঢ় সংকল্পে কঠোর। কথায় ও কাজের মিল এ এক বলিষ্ঠ মানসিকতার স্বরূপ। এ কারণে অতিসম্প্রতিকালে স্বীয় অবস্থানে অচল থেকে ছাত্রদলের জটিল ও দ্বান্দ্বিক (২০০০ সালের ডিসেম্বর ও জানুয়ারি ০১) সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হন। পার্বত্য চট্টগ্রামের যাত্রাপথে বাধার সম্মুখীন হয়েও ঢাকায় ফিরে আসেননি তিনি। সেজন্য জেডিবি মিলারের ভাষায় বলতে হয়, "Politics is a means of getting things done often with a strong sense of moral urgency" অর্থাৎ রাজনীতি কিছু প্রয়োজনীয় ও অর্থপূর্ণ কাজ সম্পাদন করার মাধ্যমে এবং দৃঢ় নৈতিকতার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়ে থাকে— তাহলে বেগম খালেদার রাজনীতি অনুরূপ কার্যক্রমের এক বলিষ্ঠ ও দীপ্ত ফসল। তাঁর সম্পর্কে দৈনিক দিনকালে বলা হয়েছে, "বেগম খালেদা জিয়া হলেন বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান চরিত্র, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপকার এবং নিরলস কর্মী। জীবন একটা ঢেউ-এর মতো। সংখ্যাহীন ঢেউ-এর নৃত্যছন্দে যেমন সমুদ্র জীবন্ত থাকে, জীবনের অসংখ্য দাবি এবং চাহিদাও তেমনি সমাজকে প্রাণবন্ত রাখে। লাখ লাখ ঢেউ-এর মধ্যে কোন একটি বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ে তার চারপাশ যেমন সরস ও সতেজ করে তোলে, কোনো কোনো জীবনও তার চারপাশে প্রাণের স্পন্দনকে দ্রুততর করে এবং ক্ষেত্রকে উর্বর করে সকলের দৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

আকর্ষণ করে। বলতে দ্বিধা নেই, সমাজ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে, সবার মধ্যে সম্মানজনক জীবনের স্বপ্ন ছড়িয়ে বেগম খালেদা জিয়া এ রাজনৈতিক সমাজে মাথা উঁচু করেছেন এক বিরাট বটবৃক্ষের মতো। দেশের জন্য, দেশের মাটি ও মানুষের জন্য যেমন তাঁর অকৃত্রিম দরদ, দেশের জনগণের মনেও তেমনি তাঁর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা। আজকের বাংলাদেশের জনগণ ও খালেদা জিয়া ভালবাসা ও শ্রদ্ধার অচ্ছেদ্য স্বর্ণসূত্রে আবদ্ধ। কার সাধ্য দুই-এর মধ্যে সৃষ্টি করে ব্যবধান।"

আমরা যাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তার পূর্বের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম ও পরবর্তীতে নানাকর্ম ও অপকর্মময় ঘটনার সাক্ষী—বলতে পারি, "এক নদী রক্তের উজানে শত যোজন সাঁতরে এদেশের সন্তানরা তুলে এনেছেন স্বাধীনতার লাল গোলাপ। স্বাধীনতা যুদ্ধে এমন ত্যাগ স্বীকার করে কোনো জাতি এমনভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। তাই বাংলাদেশের জনগণ হয়েছে 'উগ্রভাবে' স্বাধীনতাপ্রিয়। বাংলাদেশ হয়েছে স্বাতন্ত্র্যের তীর্থক্ষেত্র।"—দিনকাল। এজন্য এদেশকে তাঁরা কিছুতেই সিকিম বা নেপাল-ভুটান হতে দিতে চান না। আর সে কারণে স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী বেগম খালেদার নেতৃত্বে দলমত নির্বিশেষে সকল জনগণ একত্র হয়েছে। আওয়ামী লীগের ও তার দলনেত্রী শেখ হাসিনার পররাষ্ট্রতোষণ নীতিকে সহ্য করতে পারে না এদেশের জনগণ, ছাত্র-শিক্ষক, যুবক-বৃদ্ধ, নর-নারীসহ সকল স্তরের মানুষ। সেজন্য খালেদা ভারতের সঙ্গে State to State বা রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখতে চান। ভারত তা চায় না এবং এ দেশের কোন কোন দলও তা চায় না। তারা চায় State to Government বা State to Party সম্পর্ক রাখতে। যার কারণে তীব্র সংগ্রাম ও আন্দোলনে রত থাকতে হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়াকে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে জিয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করেছেন চট্টগ্রামে একাত্তরের মার্চে, উৎসাহ জুগিয়েছেন জিয়াকে স্বাধীনতা ঘোষণা দানে, নিজের জীবনের সংকটকালেও খালেদা মহিয়ষী নারীর মত স্বাধীনতা যুদ্ধে পাঠিয়েছেন স্বামীকে। সন্তানদের নিয়ে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধকালে নিজেকে বাঁচানোর জন্য পাড়ি জমিয়েছেন সাধারণভাবে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায়। ঢাকায় এ বাড়ি থেকে সে বাড়ি। আমাদের মত আর দশজন স্বামী যখন যুদ্ধের কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত তাদের স্ত্রীর মত আত্মগোপন করতে হয়েছে এখানে সেখানে। বন্দীত্ববরণ করে শেখ মুজিব যখন নিশ্চিন্তে পাকিস্তানে অবস্থান করছেন, তখনও জাতীয় নেতার মর্যাদা দিয়ে তাঁর যেন কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য আন্দোলন ও পত্র-পত্রিকায় তোলপাড় করেছি আমরা। হাসিনাদের নিশ্চিন্তে ও আরামে নিজ গৃহে অবস্থানকে মেনে নিয়েছি; বন্দীদশা থেকে ফিরলে তাঁকে আবারো জাতীয় নেতার মর্যাদা দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে। কিন্তু তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে তাজউদ্দীনকে ক্ষমতাচ্যুত করেন, জিয়াকে সামরিক বাহিনীর প্রধান না করে অন্যকে সে পদ দান করেন। প্রবাসী সরকারের প্রথম শপথ অনুষ্ঠানের পবিত্র স্থান কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে তিনি আমৃত্যু যাননি। অথচ বড় আশা করে তাঁরই নামে সে স্থানের নাম রাখা হয়েছিল 'মুজিবনগর'। 'সেটা'ও সহ্য করতে পারেনি তিনি। স্বাধীনতার সকল জয় জিয়া, তাজউদ্দীন, ওসমানী গং তথা জনগণ ছিনিয়ে নিয়েছে বলে। তাই হাসিনাকে বেগম খালেদা জিয়ার মত অগ্নিপরীক্ষায় পড়তে হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

তাই দিনকাল যথার্থই লিখেছেন, "যারা নিজের জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে তাদের স্বাতন্ত্র্য-প্রীতির অহংকার কেউ কেড়ে নিক তা অসহ্য অগ্রহণযোগ্য। এটিই হল এ জাতির অধ্যাত্মসত্তা। চারিত্রিক অলংকার। বেগম খালেদা জিয়া তা সঠিকভাবে অনুধাবন করেছেন। অনুধাবন করেছেন তার স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, যিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সম্বিৎহীন জাতিকে স্বাধীনতার অগ্নিপথে আহ্বান জানান। নতুনভাবে মহান আত্মত্যাগের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সকলকে সমবেত করেন, উজ্জীবিত করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে নিজেও নির্যাতনের শিকার হয়ে খালেদা জিয়া অনুভব করেছেন কোন্ অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সমগ্র জাতিকে অগ্রসর হতে হয়েছে যুদ্ধের সময়ে। তাই স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের অনির্বাণ শিখা যেমন জাতীয় মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, খালেদারও তেমনি শ্রেষ্ঠতম অলংকার। রাজপথের আন্দোলনে জনতার কাতারে একাত্ম হয়েও তিনি তা অনুভব করেছেন বার বার। স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলোর স্মৃতি, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে একাকার হয়ে গিয়ে তা হয় পদ্মা-যমুনার সম্মিলিত স্রোতের মতই অজেয়, বাঁধন ছাড়া। কার সাধ্য এ ধারার গতিরোধ করে? তাই জাতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে খালেদা জিয়া হয়েছেন জনতার এবং জনতা হয়েছে খালেদা জিয়ার। এ অপ্রতিরোধ্য মিলিত স্রোতই বাংলাদেশ রাজনীতির প্রধান স্রোত। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে চাননি নিজেকে স্বতন্ত্র রাখতে। যারা যুদ্ধের ময়দানে আত্মদান করে জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন তাদের সাথে মিশে যান তাদেরই একান্ত আপনজন হিসেবে। যখন আর এক জাতীয় সংকটকালে জাতীয় স্বাধীনতা ছিনতাই হতে চলেছিল তখনও রাষ্ট্রীয় জাহাজের হাল ধরে নতুন রাজনীতির সূচনা করেন দেশে। জনকল্যাণমূলক রাজনীতি, নৈতিকতা সমর্থিত সেই রাজনীতিতে মূখ্য হয়ে ওঠে জনগণের জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পদ। মুখ্য হয়ে ওঠে জনগণের নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণতার লক্ষ্য। খালেদা জিয়ার রাজনীতি সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। এ রাজনীতিতে নেতা-নেত্রী যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ জনগণ, জনগণের মঙ্গলামঙ্গল, জনগণের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, জনগণের নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণতা। এক্ষেত্রে নেতা বা নেত্রীর স্বপ্ন যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তেমনি সার্থক এবং মর্যাদাপূর্ণ জনগণের স্বপ্ন।"

খালেদা তাই জনগণের কল্যাণমুখী ক্রিয়া-কর্মকেই বি. এন. পি.-র দলীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের চেষ্টায় রত। অপরদিকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ এবং আবহমানকালের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে দেশে ও জনগণের মাঝে সম্পৃক্ত করে দেশের স্বকীয় মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংগ্রাম ও সমমর্যাদা নিয়ে পররাষ্ট্রের সঙ্গে সহাবস্থানে বিশ্বাসী খালেদা তাই জনগণের এবং জনগণও খালেদা জিয়ার। আমাদের এ উপলব্ধি থাকলেই তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস অটুট থাকবে এবং তাঁর নেতৃত্বকে বরণ করে নিয়ে দল, দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারব।

খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশের হাল শক্ত করে ধরেন। জামাত ও আওয়ামী লীগ বি. এন. পি. প্রধানকে সহযোগিতামূলক পরামর্শ দিয়ে দেশের মানুষের কল্যাণ করা তো দূরে থাক, একদিনের জন্যও শান্তিতে দেশ পরিচালনা করতে দেবেন না বলে প্রথম থেকে খালেদার বিরুদ্ধে সবরকম ষড়যন্ত্র শুরু করেন। জনগণের

www.nagorikpathagar.org

কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করেন। তাদের এসব অবৈধ কার্যকলাপ বিদেশকেও মর্মাহত করেছে। সেজন্য বি. এন. পি.-র শাসনামলে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও জামাতের সমালোচনা করে মি. লর্ড ওয়েভারলি বলেন, "বিরোধী মহল তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে এ বার্তা প্রেরণ করছে যে, বাংলাদেশ এখনও তার গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করেনি, যে দায়িত্ব পালনের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল।" অবশ্য বৃটিশ রক্ষণশীল দলের এমপি মাইকেল কলভিন ও বিরোধী দলের কার্যকলাপের সমালোচনা করে তাদেরকে গণতান্ত্রিক হওয়ার উপদেশ দেন।

বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে জনজরিপে দেখা যায় : বিরোধী দল প্রধান শেখ হাসিনা ও তাঁর দল গণতন্ত্র, দেশ ও খালেদা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার মানসে বেগম জিয়াকে জটিল অবস্থায় ফেলে দেয়ার চক্রান্ত শুরু করে। তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপ পানিকে ঘোলা করে সেই ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায় হাসিনা, তাঁর দল ও তাদের ভারতঘেঁষা বুদ্ধিজীবী সমাজ। অবশ্য ১৯৯৬ সালের জুনে গণভোটে সেই ঘোলা জলে মাছও শিকার করেছেন হাসিনা ও তাঁর দল। ভোট চুরি ও অবৈধভাবে ক্ষমতা গ্রহণ তার প্রমাণ। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার রক্ত-সাগরে স্নাত বি. এন. পি.-কে পরাজিত করে তাঁদের পরদেশী বন্ধুদের সন্তুষ্ট করার জন্য জোট বেঁধেছিল স্বাধীনতা বিরোধী ও গণতন্ত্র বিরোধীদের নিয়ে। এর ফলে সামরিক শাসন জারির পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। দেশপ্রেমিক ও গণতন্ত্রের পূজারী খালেদা জিয়া শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ১৯৯৬ সালের প্রথমে গণভোটের মাধ্যমে সংসদ প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের দ্বারাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করেই খালেদা সংসদ ভেঙ্গে দেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের জন্য এ সরকার ও এ সংসদের প্রয়োজন ছিল। তখন তাঁরা এর সমালোচনা করলেও এখন তাঁরা এ বিষয়ে মুখ খোলেন না। ১৫ দিনের এ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অতঃপর সংসদ ভেঙ্গে দিলেন খালেদা। নির্লোভ খালেদা জিয়া জনগণের জন্যই শুধু রাজনীতি করেন তা আবারো প্রমাণিত হয়।

বেগম জিয়ার আমলে পত্র-পত্রিকার স্বাধীনতা সর্বাধিক ছিল এবং নিরপেক্ষভাবে যে কোন তথ্য প্রকাশ করতে পারতো। সেজন্য আওয়ামী বুদ্ধিজীবীও কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, "সরকারি নিয়ন্ত্রণের কারণে সংবাদপত্রগুলো এসব তথ্য প্রকাশে যথেষ্ট আগ্রহ দেখায় নি।" আসলে সর্বাধিক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পত্রিকাগুলো খালেদা ও বি. এন. পি.-র কোন দোষ খুঁজে পায় নি। কিন্তু আ: লীগ সরকারপ্রধান পত্র-পত্রিকা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। নানাভাবে পত্র-পত্রিকার কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে, দলীয় লোকেরা পত্র-পত্রিকার উপর নানাভাবে আঘাত হানছে—পত্রিকা বন্ধেরও হুমকি দেয়া হচ্ছে, দলীয় পত্রিকাকে তার বিরুদ্ধের বিষয়গুলো ছাপানোর ব্যাপারে নিষেধ করা হচ্ছে। তবু পত্র-পত্রিকায় যেসব তথ্য ভেসে আসছে তা বর্ণনাতীত। বাধা না দিলে আরো কত ঘটনাই যে পত্রিকায় আসত তা খোদাই বলতে পারেন। এসব আসছে বলে পত্রিকাগুলোর উপর তিনি (হাসিনা) আরো রেগে যাচ্ছেন। এখানে আমরা খালেদা জিয়া ও হাসিনা সরকারের তুলনামূলক অপরাধজগতের চিত্র তুলে ধরতে চাই। বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে ১৯৯৪ সালে (বি. এন.

www.nagorikpathagar.org

পি. সরকারের শেষের দিকে) অপরাধসমূহের গড় হার ছিল শতকরা ৪½% থেকে ৫% পর্যন্ত। তার তিন বছর পর ১৯৯৭ সালে (আ: লীগ শাসনের প্রথম দিকের যে অপরাধ এখন তাকেও ছাড়িয়ে গেছে।) আওয়ামী লীগ সরকার শেখ হাসিনার আমলে তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে অপরাধসমূহের গড় হার হয়েছে শতকরা ৪১%। অর্থাৎ তিন বছরে অপরাধের হার ৩৬% বা ৩৬½% বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৩ সালে বি. এন. পি. সরকার ও সরকার প্রধান দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আমলে সরকারি ও বেসরকারি হিসেব মতে শিশু ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল ১২৩৮টি। ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ শাসনামলে ও মুজিবকন্যা শেখ হাসিনার সরকার আমলে তা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে শুধু মাত্র সরকারি হিসেবে ও সরকারি রেকর্ড মতে ৪৯৬০টি। এর সঙ্গে বেসরকারি ঘটনা যোগ করলে কত হবে তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারবেন। চিরস্থায়ীভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য হাসিনা বাকশালী স্টাইলে সব কিছু দলীয়করণ করে চলেছেন। ফলে তিনি তাঁর নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর ব্যর্থ প্রশাসনের কারণে এসব অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে এবং প্রশাসন এসব কারণে শিথিল হয়ে পড়েছে। এবং পুলিশ প্রশাসনসহ সকল প্রশাসনের সুযোগ সন্ধানীরা নিজেদের স্বার্থে সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং পররাষ্ট্রের আগ্রাসী থাবা থেকে দেশকে রক্ষার জন্য নতজানু পররাষ্ট্রনীতি নয়, সমঅধিকার সমন্বিত পররাষ্ট্রনীতি, ক্ষমতার লোভে অন্যায়কে প্রশ্রয়দান নয়, গণতন্ত্র বিকাশের রাজনীতির প্রতি আমাদের আস্থা স্থাপন আজ একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আর এসব দায়িত্ব পালনে নেতৃত্বদান করতে পারেন একমাত্র বেগম খালেদা জিয়া—যেহেতু জিয়ার বহুদলীয় গণতন্ত্রকে সার্বজনীন রূপ দান করেছেন খালেদা, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন ও Cabinet form of government system বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তন করে। সেজন্য আমি দ্বিধাহীন চিত্তে খালেদাকে গণতন্ত্রের মানসকন্যা ও গণতন্ত্র রক্ষাকারী বলতে পারি। এখন আমাদের একমাত্র কাজ হবে তাঁর হাতকে শক্তিশালী করা। সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে বি. এন. পি.-র আদর্শে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই বেগম জিয়ার হাত শক্তিশালী হবে। দেশের জনগণকে সত্যের আলোকরশ্মিতে রঞ্জিত করে যুক্তির মাধ্যমে বোঝাতে হবে মুজিব সমর্থিত আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি নয়, স্বাধীনতা যুদ্ধের রক্ত সাগর থেকে উঠে আসা এবং স্বাধীনতার ঘোষক ও শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত বি. এন. পি.-ই মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতা যুদ্ধের আলোকে উদ্ভাসিত বাংলাদেশের জাতীয় রাজনৈতিক দল। এর সঙ্গে যুক্ত আছেন সকল মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালক ও মুক্তিযুদ্ধের শব্দ সৈনিকগণ। একাত্তরের পাক সমর্থিত বুদ্ধিজীবিগণের স্বরূপ বদল করা চরিত্র এঁদের মধ্যে নেই। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে দু'টি কবিতা লিখে দু'পকেটে রেখে এঁরা মুক্তিযুদ্ধ করেননি, কলমও ধরেননি। এঁরা মুক্তিযুদ্ধের আলোকপুষ্ট নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের লেখক, শিল্পী-নাট্যকার, সাংবাদিক ও শব্দসৈনিক। সে কারণে বি. এন. পি.-কে মুক্তিযুদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। ধানমণ্ডীতে নিজ বাড়িতে থেকে পাক সরকারের ভাতা খেয়ে ও প্রবাসে বন্দীজীবন যাপন শেষে উড়ে আসা নেতা নয় এঁরা। একাত্তরে এদেশে থেকে পাকিস্তানের আনুগত্য করে ঝোপ বুঝে স্বাধীনতার পক্ষ

www.nagorikpathagar.org

নামধারী শক্তির সঙ্গে হাত মিলান ব্যক্তি নয় এঁরা। মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠে আসা মুক্তিযোদ্ধা ও শব্দসৈনিকগণ বি. এন. পি.-র মাঝি-মাল্লা, খালেদা মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলোর একজন সংগ্রামী নেত্রী— তিনি আমাদের দলের কাণ্ডারী। বি. এন. পি.-র জাহাজ মুক্তিযোদ্ধা ও এদেশের মুক্তিযুদ্ধের আলোকে উদ্ভাসিত জনগণের দ্বারা পূর্ণ। এ জাহাজের মাস্তুলে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" শোভা পাচ্ছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের শাশ্বত বাণী 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' এর অঙ্গে শোভিত। তাই সকল জনগণ ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই বি. এন. পি-র পতাকাতলে সমবেত হয়ে দেশকে আগ্রাসী শক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে এবং এর উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা কর্তব্য। আর এর জন্য স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার পতাকাতলে আমাদের সকলের সমবেত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সরকার পরিচালনায় বি. এন. পি. এবং এর চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া। (১৯৯১– ১৯৯৫)।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বেগম খালেদা জিয়া। আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য দল তৎকালীন সময়ে বেগম খালেদাকে সহযোগিতা দান করলেও এ আন্দোলনকে দুর্বল করে তোলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যোগদানের মাধ্যমে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের মহৎ সংকল্প নিয়ে তিনি (খালেদা) দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। নির্বাচনের ফাঁদে ধরা দেননি তিনি। হাসিনা ও তাঁর দলের এসময়কার সুবিধাবাদীরা রাজনীতিকের মত কোনো প্রলোভনেও নতিস্বীকার করেননি তিনি। গণতন্ত্রের বিজয় অর্জন এবং দেশের কল্যাণ সাধনই ছিল বেগম জিয়া ও তাঁর দল বি. এন. পি-র একমাত্র লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে খালেদা দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন সামনের দিকে। আপোসহীন নেত্রী হিসেবে এজন্য তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্বৈরশাসন আমলে শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আপোসকামী ও সুবিধাবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন— সেখানে বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর দল বি. এন. পি. আপোসহীনভাবে আন্দোলন চালিয়ে যান। তাঁর এ আপোসহীন আন্দোলনের কারণেই খালেদার বিজয় অর্জিত হয়। কিন্তু এর ফল ভোগ করে দেশের আর সব দলও। গণতন্ত্রের মানসকন্যা তাঁর নিজস্ব এ বিষয়কে উন্মুক্ত করে দেন সকলের জন্য। সে কারণে, "স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে বিজয়ী এদেশের সংগ্রামী জনগণ ১৯৯১ সালের ২৭-শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জিত গণতন্ত্রকে সুসংহত করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে তাঁদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাথী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি. এন. পি.-কে (Bangladesh Nationalist Party-BNP)"। প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ।

এরশাদ সরকারের দীর্ঘ ৯ বছরের শাসনামলে গণতন্ত্র ছিল না বললেই চলে। গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা স্তব্ধ করে দিয়ে তিনি ক্ষমতায় আসেন এবং নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য এদেশের বাকশালী স্টাইলের আমেজে এরশাদ তাঁর নিজস্ব পথ অবলম্বন করেন। এসময় জাতীয় অর্থনীতি শুধু ধ্বংস নয় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। জাতীয় অর্থনীতিতে সীমাহীন অনাচার ও দুর্নীতি শুরু হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল এবং অর্থের সুব্যবস্থার অভাবে রাষ্ট্রীয় তহবিল ছিল শূন্য।

www.nagorikpathagar.org

এদেশের জীবনধারণ ও উন্নয়ন সবই ছিল বিদেশী ঋণ বা সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। জিয়া মুজিব আমলের তলাবিহীন ঝুড়ি বাংলাদেশকে রিপিয়ার করে উন্নয়নের পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই উন্নয়ন শুধু থেমে থাকে নি, তা এরশাদের আমলে নামতে নামতে আবার মুজিবের তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়। ফলে জাতীয় উন্নয়ন বাজেট ছিল শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ বিদেশী ঋণ ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। চরম দুর্নীতি ও অব্যবস্থার মধ্যে এরশাদ সরকার দেশ শাসন করতেন। রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত ও স্থায়ী করার মানসে গণতন্ত্রকে কৌশলগতভাবে ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। একারণে বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোকে ধ্বংস অথবা নির্জীব করে দেয়া হয়। জনগণকে ধোঁকা দিয়ে গণতন্ত্র বিরোধী কার্যক্রম শুরু ও জনগণকে গণতন্ত্রবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালান। ১৯৯১ সালে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে বি. এন. পি. ক্ষমতায় আসেন এবং বি. এন. পি.-র চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে সরকার প্রধান করে বি. এন. পি. সরকার এদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। স্বৈরাচারী আমলের অর্থনৈতিক এ সংকটসহ সকল অব্যবস্থার মোকাবিলা করতে হয়েছে বি. এন. পি. সরকার ও সরকার প্রধান স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে।

বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর বি. এন. পি. সরকার অর্থনীতিকে চাঙ্গা ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তাঁর প্রচেষ্টায় শেয়ার বাজার উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয় এবং শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়ে উঠে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে চাঙ্গা করার ব্যবস্থা করেন এবং সেসব স্থানে পুনঃগণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া চালু করা হয়। বহুদলীয় গণতন্ত্রের আলোকে রাজনীতিকে গণমুখী ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন খালেদা ও তাঁর বি. এন. পি. সরকার। স্বৈরাচার শাসনামলের সমস্ত অব্যবস্থাকে পুনঃশৃঙ্খলা ও গণমুখী করার প্রয়োজনে বিভিন্ন দলকে নিয়ে বি. এন. পি. আন্দোলন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের ব্যবস্থা করে। এর ফলে বি. এন. পি. সরকার ক্ষমতায় এলে আন্দোলনকারী দলসমূহের সহযোগিতা করা উচিত ছিল। আন্দোলনকালে এ নিয়ে আলাপ আলোচনাও হয়েছে অনেক। তবু আওয়ামী লীগ ও তার প্রধান শেখ হাসিনা আন্দোলনকালীন চেতনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং সহযোগিতার হাত পা বাড়িয়ে তা গুটিয়ে নেন। দেশের বিরোধী দলের নিকট থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায় নি। বরং তারা বিরোধিতা করেছে সর্বক্ষেত্রে। "রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেকেই নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের নামে ক্রমাগত অন্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার অগ্রাহ্য ও ক্ষুণ্ন করেছে।"

তবুও শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়ে খালেদা তাঁর বি. এন. পি. দল ও দলীয় সরকারকে নিয়ে বহু উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কাজে হাত নেন। হাসিনা একদিনের জন্যও খালেদাকে শান্তিতে দেশ শাসন করতে দেবেন না, বললেও দেশের উন্নয়ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকে। বৈদেশিক সাহায্য এবং নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। ফলে উন্নয়ন কর্মসূচিতে আভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠে। বেগম খালেদার অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলা

www.nagorikpathagar.org

হয়। স্বৈরশাসনের আমলে বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে আসে জোয়ারের সুরভিত সুষমা। তলাবিহীন ঝুড়ি বিনির্মিত হয়ে তা কানায় কানায় পূর্ণ হতে থাকে। মানুষের জীবনে সুখ ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। দেশের প্রতি ভালবাসা বাড়তে থাকে। জীবনের প্রতি আস্থা ফিরে আসতে থাকে। বি. এন. পি. সরকারের আমলে অর্থনীতির একটি আংশিক চিত্র এখানে তুলে ধরতে চাই।

ঃ ১৯৯০ — '৯১ সালে আভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৮ শত ২২ কোটি টাকা। ১৯৯৫—'৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ হাজার ৪ শ ৫০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৯৯০ — '৯১ সালে আভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭ শ ৯১ কোটি টাকা। ১৯৯৫—'৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪ হাজার ৮ শ ৭৭ কোটি টাকা। কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন ও মহিলা উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ, স্বাস্থ্য এবং শ্রম ও জনশক্তি খাতে দ্রুত আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ১৯৯৫ — '৯৬ সালে ২ হাজার ২শ ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচি, ভিজিডি, জি আর টি আর কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য এ বছর (১৯৯৬) ১ হাজার ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নগর ও গ্রামাঞ্চলে সড়ক ও সেতু নির্মাণে এক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, এখানে বছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরে বরাদ্দ ছিল ৬ হাজার ১শ ২৬ কোটি টাকা। ১৯৯৪–'৯৫ বার্ষিক কর্মসূচিতে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১ হাজার ১শ ৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ এ বরাদ্দ ৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

১৯৯৪–'৯৫ সালে রপ্তানি খাতে আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৪৭. ৩ কোটি মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় তা শতকরা ৩৭.১ ভাগ বেশি। ঃ

এছাড়া নারী শিক্ষা প্রচারকল্পে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য ও বৃত্তি প্রদান। অবৈতনিক বিদ্যাদান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন এবং তাঁর সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর হতে উচ্চ শিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও নির্মাণের জন্য বহু কোটি টাকা প্রদান করেন তিনি। এতদ্ভিন্ন নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়। বেগম জিয়ার আমলে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস ছিল না, থাকলেও তা অতি নগণ্য পর্যায়ের— সে কথা বিরোধী দলসহ সকলেই স্বীকার করেছেন। এ উন্নয়নের পথে দলীয়ভাবেও অপ্রত্যাশিতভাবে নানা বাধা-বিপত্তি এসেছে। একদিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেয়া হয়নি। এছাড়া কয়েক বছরে প্রবল বন্যা সাইক্লোন, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে আমাদের কর্মকাণ্ডকে বারংবার বাধাগ্রস্ত করে তুলেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাদেও দলীয় বাধা নিরলসভাবে আবর্তিত হয়ে বি. এন. পি. সরকারের কর্মতৎপরতাকে ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত করে তুলেছে। বাধা-বিপত্তি ও নাশকতামূলক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাঝেও খালেদা ও তাঁর সরকার এদেশের উন্নয়ন সাধন ও উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। সে কারণে বি. এন. পি. সরকারের ৫ বছরের সাফল্য (১৯৯১—১৯৯৫) এ দেশবাসী ও বিদেশের নিকট প্রশংসিত হয়েছে। খালেদা সরকারের আমলে সাফল্যের কিছু কিছু নজির নিম্নে তুলে ধরা হল।

www.nagorikpathagar.org

বি. এন. পি.-সরকারের রাজনৈতিক সাফল্য।

বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের আমলের রাজনৈতিক সাফল্যের মাত্র কয়েকটি বিবরণ এখানে দেয়া হল।

১। দেশে সার্বজনীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র বা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তন বেগম খালেদা ও বি. এন. পি. সরকারের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। তারা জাতীয় সংসদে দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু করেন। এর ফলে গণতন্ত্র সর্বাধিক বিকশিত হয়ে ওঠে।

২। বি. এন. পি. সরকার ও সরকারপ্রধান খালেদা জিয়া সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ হিসেবে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে গণতন্ত্রকে প্রসারিত ও উন্মুক্ত করে দেন। ফলে এদেশের গণতন্ত্রের সংকীর্ণতা দূর হয়ে তা পল্লবিত হয়ে উঠে। এর আগে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে মেয়র নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। এটি এবং আগেরটি গণতন্ত্রের পথে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

৩। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আর একটি গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থাকরণ। এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের আইন পাসে চরম জটিলতার সৃষ্টি হয় যখন আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদ হতে পদত্যাগ করে। তখন বাধ্য হয়ে এ তত্ত্বাবধায়ক বিল সংসদে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে $\frac{২}{৩}$ অংশ ভোটে পাস করার প্রয়োজনে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখে তিনি নির্বাচন দিতে বাধ্য হন এবং নির্বাচনের পর তা $\frac{২}{৩}$ অংশ ভোটে পাস করাতে হয়। এত বিরোধিতার পথেও এটি তাঁর একটি আপোসহীন পদক্ষেপ। অতঃপর ১৫ দিনের মাথায় এ সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। খালেদা ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। খালেদা ও বি. এন. পি.।

৪। বি. এন. পি. সরকারের আর একটি গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ দেশের সকল ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা। সাধারণ নির্বাচনে কেউ যেন ভোট চুরি করতে না পারে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ ও অন্যান্য নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। সেজন্য খালেদা সংসদে এ বিল পাস করেন ও পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

৫। খালেদা জিয়ার সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন। এ সরকার আদালতের মাধ্যমে জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করে এবং তাঁর আমলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৬। খালেদা জিয়াই সংবাদ-পত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং তাঁর আমলেই সংবাদ-পত্রকে ৪র্থ রাষ্ট্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে গণতন্ত্রকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে আর কোন সরকার বা সরকাপ্রধানকে দেখা যায়নি এবং পরবর্তী সরকার আবার গণতন্ত্রকে ক্রমান্বয়ে টুঁটি টিপে নির্জীব করার চেষ্টা করেছে। বিচার বিভাগের প্রতি কটাক্ষ ও সমালোচনা, সংবাদ-পত্রের প্রতি হাসিনার আচরণ ও পত্রিকা বন্ধের হুমকি ইত্যাদিই তার বড় প্রমাণ।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা ও জ্ঞান সাধনার পথে বি. এন. পি. সরকারের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ।

৭। আমরা জানি, যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি ধনে, মনে ও মানে বড় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারাই সেরা। আর এ শিক্ষা সার্বজনীন করার জন্য এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। সেজন্য খালেদা জিয়ার আমলে আইন করে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় এবং দেশের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আওয়ামী লীগের হাসিনা সরকারের ব্যর্থতার কারণে সকল শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। খালেদা সরকারের এ বাস্তবমুখী ও গণমুখী প্রকল্পের অপমৃত্যু ঘটছে। খালেদার এ গণমুখী শিক্ষা নীতিকে এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে হাসিনা সরকার।

৮। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। একজন মা শিশু শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি ও জাতির উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত করতে পারেন। এটি খালেদার বি. এন. পি. সরকারই প্রথম উপলব্ধি করে। সেজন্য বি. এন. পি. সরকার মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন।

৯। শুধু তাই নয়, মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করার প্রয়োজনে খালেদার সরকার সেই লক্ষ্যে উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করেন। এতে দরিদ্র মেয়েদের লেখাপড়া ও উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হয়ে উঠে। ৬ কোটি টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে এতে ৬ বছরে ৩৩ লক্ষ মেয়ের শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। এটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে এক আকর্ষণীয় পদক্ষেপ।

১০। আমাদের দেশের গরীব শিশুগণ খাদ্য ও বস্ত্রের সংকটের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয় না। সেটা খালেদা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। এ কারণে তিনি দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়োজনে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি' চালু করেন।

১১। শুধু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও গণশিক্ষার বিস্তার লাভই নয় উচ্চ শিক্ষাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং সাধারণ মানুষও মেধা থাকলে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারেন এমন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন বেগম জিয়া ও তার বি. এন. পি. সরকার। সেজন্য তিনি হাজার হাজার প্রাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় যথা— উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় চালু এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দান করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার পর পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাবর্তন অনুষ্ঠান চালু করা হয়।

১২। বি. এন. পি. সরকারের আমলেই খালেদার নেতৃত্বে প্রতিবছর বাজেটে শিক্ষা খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়। এ ছাড়া জিয়ার পরিকল্পনা প্রসূত গণশিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটিয়ে একে সার্বজনীন রূপদান করা হয় এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষাকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশ থেকে মূর্খতা দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তিনিই প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস করে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করেন। খালেদা জিয়ার সরকার আমলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

১৩। বি. এন. পি. সরকারের আমলে কৃষকদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ করে দরিদ্র কৃষকদের দুর্দশা লাঘব ও কৃষি কাজে মনোনিবেশে উৎসাহিত করা হয়।

১৪। কুটির শিল্পকে উৎসাহিত ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসাকে উৎসাহিত করার মানসে বি. এন. পি. সরকার তাঁতী ও সমবায়ীদের ঋণের সুদ ও দণ্ডসুদ বা সুদের সুদ মওকুফ করে দেয়।

১৫। কৃষককুলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার মানসে বাংলাদেশের সকল কৃষকদের মাঝে সহজ শর্তে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয় এবং কৃষি ও সেচ কাজের সুবিধার্থে ও ফসল বৃদ্ধির প্রয়োজনে সার, বীজ, ডিজেল, পাম্প, কীটনাশক ঔষধসহ যাবতীয় কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যহ্রাস এবং কৃষকদের তা ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৬। গরীব কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়।

১৭। সকলের সুবিধা ও মৎস্য চাষের সুবিধার জন্য উন্মুক্ত জলমহাল ইজারা প্রথা বাতিল করা হয় ও মৎস্য চাষে উৎসাহিত করা হয়।

১৮। ক্রেতা-বিক্রেতার সুবিধা ও ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে এবং ভোক্তাদের সুবিধার জন্য মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করেন খালেদা জিয়া।

১৯। ঋণ নির্ভর বাজেটের পরিবর্তন ঘটিয়ে তার একাংশ নিজস্ব সম্পদ থেকে যোগান দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এ সরকারের আমলে। ১৯৮৯— '৯০ সালের ৫ হাজার ১শ কোটি টাকার বাজেট ১০০ ভাগ ঋণ নির্ভর ছিল। ১৯৯৫— '৯৬ সালে ১২ হাজার ১শ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট— যার ৪৩ ভাগ অর্থ দেশীয় সম্পদ থেকে যোগান দেয়া হয়েছে। এটি একটি উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত।

২০। যমুনা সেতু নির্মাণের দাবী দীর্ঘদিনের। ভাসানী ছিলেন সবচেয়ে সোচ্চার কিন্তু সকল সরকার এ বৃহৎ সংযোগ সেতু নির্মাণের কথা বললেও তা বাস্তবায়নের জন্য অন্য কোন সরকার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। খালেদা জিয়া ও তাঁর সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী ওলি আহমদ এ সম্পর্কে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং দেশ-বিদেশ হতে অর্থ সংগ্রহ, ভূমি অধিগ্রহণ, বাজেট, টেণ্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে কাজ শুরু করেন এবং খালেদা জিয়া এ সেতুর যথারীতি উদ্বোধনও করেন। সমস্ত সামগ্রী জোগান ও গোছানোর পর এ সরকার একাজ শুরু করেন। খালেদা জিয়ার উদ্বোধনকালে আওয়ামী লীগ প্রধান হাসিনা হরতাল ডেকে সেতু নির্মাণ পরিকল্পনাকে বানচাল করার চেষ্টা করেন। তবু এ সেতু সমাপ্তির লগ্নে নির্বাচনের মাধ্যমে হাসিনা ক্ষমতায় এসে ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে তাঁর পিতার নামে সেতুর নামকরণ করেন। যা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। এ নিয়ে অন্য স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। খালেদার আমলে এ সেতুর সম্পূর্ণ আয়োজন শেষে ৭৫% কাজ সম্পন্ন হয়।

www.nagorikpathagar.org

২১। যমুনা সেতু নির্মাণসহ বি. এন. পি. সরকার তিন শতাধিক ছোট বড় সেতু, অসংখ্য কালভার্ট এবং কয়েক হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও পাকা করা হয় এবং অসংখ্য গ্রাম্য রাস্তা তৈরি করা হয়। বর্তমানের রাস্তাঘাট বি. এন. পি.-র আমলে তৈরি অথবা তাঁরই পরিকল্পনাধীন। তার বাইরে এমন বেশি কিছু রাস্তা তৈরি হয়নি বা তৈরির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি আওয়ামী লীগ সরকার।

২২। যে রূপসা সেতু বর্তমানে নির্মাণের পথে তাও বি. এন. পি.-র আমলে পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

২৩। খালেদা জিয়ার উৎসাহে ও পরিকল্পনায় বি. এন. পি. সরকার বড় পুকুরিয়ার কয়লা ও মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা উত্তোলন প্রকল্পের কাজ শুরু করে।

২৪। বি. এন. পি. সরকারের তত্ত্বাবধানে সঠিকভাবে ভোলা ও বঙ্গোপসাগরে নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের ও দিনাজপুরে কয়লা ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে।

২৫। বি. এন. পি. আমলে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে প্রতি বছর দু'টি করে অনুসন্ধান কূপ খননের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

২৬। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর পেনশন জটিলতার মধ্যে যেন অযথা হয়রানি না হন সেজন্য খালেদা অবসর গ্রহণের সাথে সাথে পেনশন পাবার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রী এবং প্রতিবন্ধী সন্তানদেরও আজীবন পেনশন প্রদানের সুবিধা করে দিয়েছেন।

২৭। ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৩ হাজার বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে আরো পরিকল্পনা ছিল।

২৮। খালেদা জিয়ার আমলে সরকারি চাকুরীর মেয়াদ ২৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

২৯। বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের দরিদ্র জনগণের আর্থিক উন্নয়নের প্রয়োজনে খালেদা জিয়া সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের মাধ্যমে দেশের রাস্তাঘাট ও পতিত জমিতে ব্যাপক হারে বৃক্ষ রোপণ, হাস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ এবং গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ ও পশু খামার প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়ে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছেন তিনি।

৩০। বেগম খালেদার সরকার মজুরী কমিশন গঠন করে শ্রমিকদের জন্য মজুরী এবং বিবিধ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে।

৩১। শিক্ষার মান বৃদ্ধিকল্পে এবং সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য দূর করার মানসে বি. এন. পি. সরকার বেসরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের বেতনের অনুদান ৮০ ভাগ বৃদ্ধি করেছে এবং প্রয়োজনে আরো বৃদ্ধির আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে।

৩২। দুঃস্থ ও গরীব মহিলাদের স্বাবলম্বী ও আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বি. এন. পি. সরকার প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে অর্থ যোগান দিয়ে দুঃস্থ মহিলাদের ঋণদান কর্মসূচি চালু করে। এভাবে বেগম জিয়া সমাজ হতে দুঃখ ও অভাব দূর করে সমাজকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

www.nagorikpathagar.org

৩৩। বেগম জিয়ার শাসন আমলে দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় এবং এভাবে বিদেশীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে বিদেশীগণ এ কাজে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসেন।

৩৪। জমির মালিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নদী ভাঙ্গনের পর ৩০ বছরের মধ্যে উক্ত জমি পুনরায় জেগে উঠলে তা জমির মূল মালিককে ফেরত দেয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করেছে বি. এন. পি. সরকার।

৩৫। ভারী শিল্পকারখানা তৈরির মাধ্যমে বেকার সমস্যা দূর করার মানসে এবং দেশের অর্থসম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনে এবং দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত ও নতুন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বি. এন. পি. সরকার সকল নতুন শিল্পকে প্রথম ৫ বছরের ট্যাক্স হলিডে মঞ্জুর করেছে।

৩৬। খালেদা ও তাঁর সরকার প্রকৃতপক্ষে টিকাদান কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন এবং এক বছরের কম বয়সী ৮৫/৯০ ভাগ শিশুকে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনে। এবং ১-৫ বছরের শিশুদের পোলিও টিকাদানসহ বিভিন্ন টিকাদান কর্মসূচি চালু করা হয়। এছাড়া দেশের ৯০% ভাগ জনগণের জন্য বিশুদ্ধ পানির সুব্যবস্থা করেছে বি. এন. পি. সরকার।

৩৭। জনগণের শিক্ষা বৃদ্ধির পাশাপাশি সকল জনগণের রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত ও নিশ্চিত করার প্রয়োজনে খালেদা দেশের বৃহত্তম জেলাগুলোতে ১০০ শয্যার হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় বৃদ্ধি করেন এবং ২৫০ শয্যা উপযোগী দালানকোঠা নির্মাণেরও ব্যবস্থা করেন। তাঁরই আমলে ৫০ শয্যার হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয় এবং এর জন্য দালানকোঠাসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়।

৩৮। বি. এন. পি-র শাসনামলে ৫ বছরে সারাদেশে তিন লক্ষাধিক টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা হয় এবং তার জন্য এ সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাতে ২০০০ সালের মধ্যে ৮ লক্ষ টেলিফোন সংযোগ স্থাপিত হবে এবং নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এ সংখ্যা আরো বাড়ানো যাবে। বি. এন. পি. সরকারের আমলে দেশে কার্ড ফোন, সেলুলার ফোন, গ্রামীণ আই এস এস ডি ফোন চালু করা হয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ফোন ও বিষয়াদি প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

৩৯। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মানসে বি. এন. পি. সরকার থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো প্রসারিত করে শয্যা সংখ্যা ৩১ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শয্যায় উন্নীত করেন। এছাড়া থানায় ও থানাধীনে অসংখ্য হাসপাতাল নির্মাণ ও সংস্কারসহ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে অসংখ্য এম্বুলেন্স, এক্সরে মেশিন ইত্যাদি সরবরাহ করে।

৪০। স্বনির্ভর বাংলাদেশ বাস্তবায়ন জিয়ার কর্মপদ্ধতির একটি অংশ ছিল। খালেদা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে আনসার-ভিডিপি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং আনসার-ভিডিপি সদস্যদের জন্য এ ব্যাংক থেকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ আনসার-ভিডিপি প্রতিষ্ঠা জিয়ার অবদান।

৪১। বি. এন. পি. সরকারের একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৯১—১৯৯৫ সালের মধ্যে উপকূলীয় এলাকায় এক হাজারেরও বেশি 'বহুমুখী সাইক্লোন সেন্টার' নির্মাণ করা হয়। যার ফলে উপকূলীয় এলাকার লোকজন সাইক্লোনের সময়ে গবাদিপশু ও সম্পদসহ

www.nagorikpathagar.org

আশ্রয় নিতে পারেন। খালেদা জিয়া ও বি. এন. পি.-র এ একটি বৃহৎ প্রকল্প হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। যমুনা সেতু ও এ প্রকল্পকে কেউবা এর জয়কে বা এ কাজের জয়কে অন্য কেউ কোন দিনই ছিনিয়ে নিতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে বেগম খালেদা জিয়া দেশের সকল প্রকল্প ও সকল কাজ সফলতার সঙ্গে করে গেছেন। পরবর্তী আঃ লীগ সরকার তার পেছনের ফরা (লৌকিক) ধরে গদ গদ হয়ে নাচানাচি করছে।

৪২। বি. এন. পি. সরকারই গবেষক নিয়োগ করে সবুজ পাট থেকে মণ্ড তৈরির ব্যবস্থা করে আমাদের দেশের পাট সম্পদকে মূল্যায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনে পাটের বহুমুখী ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৪৩। বি. এন. পি. সরকারের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে এবং দেশের সর্বত্র বিদ্যুৎ সরবরাহের অভিপ্রায়ে বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু ও তার চাহিদা মেটাতে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি। তাঁর আমলে ৩০০ টির অধিক থানায় পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এর ফলে ১৫ হাজার গ্রামের মানুষ বিদ্যুতের আলো দ্বারা উপকৃত হতে থাকে এবং সেচপ্রকল্প সুচারুরূপে চালু হয়। এরাই আরো সব থানায় বিদ্যুতায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারই পথ ধরে পরবর্তী সরকার কিছুটা অগ্রসর হলেও বি. এন. পি. আমলের মত ত্বরিত তা বাস্তবায়নে সমর্থ হচ্ছে না। অথচ পূর্ববর্তী সরকারের দেখানো পথে এরা আরো ত্বরিত গতিতে এগুতে পারত।

বি. এন. পি. সরকারের আমলে ধর্মীয় কার্যক্রম

৪৪। খালেদা জিয়ার আমলে তাঁরই একান্ত আগ্রহে ও বি. এন. পি. সরকারের সহযোগিতায় ঢাকায় স্থায়ী হাজী ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে।

৪৫। খালেদা জিয়ার একান্ত চেষ্টায় বি. এন. পি. সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় টঙ্গীতে বিশ্ব এজতেমার জন্য ৩০০ একরেরও বেশি জমি তবলিগ জামাতকে বরাদ্দ দেয় এবং তবলিগ জামাতের কর্মকর্তা তা তাদের জমি হিসেবে নিয়মিত ব্যবহার করছেন। সমগ্রবিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য এ এক বিরাট ও অবিস্মরণীয় কার্যক্রম তা সকলেই স্বীকার করবেন।

৪৬। বি. এন. পি. সরকার ইসলামী শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও কার্যকরী করার অভিপ্রায়ে মাদ্রাসার সকল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকায় মাদ্রাসা ট্রেনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করে।

৪৭। ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবতেদায়ী মাদ্রাসা এতদিন অবহেলিত ছিল এবং সকল প্রকার সরকারি সুবিধা হতে তাদের বাইরে রাখা হয়। বি. এন. পি. সরকারপ্রধান বেগম খালেদা জিয়া এতে বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং একারণে এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে বেসরকারি প্রাইমারী স্কুলের সমপর্যায়ের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা ও তা কার্যকরী করা হয়।

৪৮। এছাড়া বি. এন. পি. সরকার দেশের মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, মন্দির, গীর্জাসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মাণ, সংস্কার, পুনঃনির্মাণ, ও তার বিবিধ কাজে ব্যাপক হারে আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।

www.nagorikpathagar.org

৪৯। বি. এন. পি. সরকার খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করেন ও তাদের আমলে এর মাধ্যমে বহু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বিবিধ জনহিতকর কার্যাবলী যা খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বি. এন. পি. সরকারের আমলে গৃহীত হয়।

৫০। স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি. এন. পি. মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্নাত দল এবং দলের চেয়ারপার্সন স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিধায় বি. এন. পি. শাসনামলে মুক্তিযোদ্ধাদের চরমভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর সহযোগী বাহিনী কাদেরীয়া বাহিনী, মুজিব বাহিনী, নক্সাল বাহিনী ইত্যাদিকেও সম্মানিত করা হয়েছে খালেদা জিয়ার সরকারি আমলে। এছাড়া সকল জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে দু-একটি দল বাদে দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন বেগম খালেদা জিয়া। সে কারণে মুক্তিযুদ্ধের রক্তসাগরে স্নাত বি. এন. পি-কে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষশক্তি হলেও ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে নিজেদের সপক্ষশক্তি হিসেবে জাহির করেননি এবং সে কারণে ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে বি. এন. পি. দল মর্যাদা দিয়েছে তাজউদ্দীন ও তার সমর্থিত আওয়ামী লীগকে। মুজিব যে একাত্তরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন, ইতিহাসের এ সত্যকেও তুলে ধরে কয়েকজন জাতীয়তাবাদী নেতার মধ্যে মুজিবও যে একজন, সেকথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। একারণে মুক্তিযোদ্ধাদের যার যা অবদান নিরপেক্ষভাবে তাদের সে রকমই মূল্যায়ন করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য বি. এন. পি. সরকার "বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গ্যালান্ট্রি এ্যাওয়ার্ড প্রদান এবং রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ" করে। বর্তমানে বি. এন. পি-র চেয়ারপার্সন খালেদা ঘোষণা দিয়েছেন। বি. এন. পি. ক্ষমতায় গেলে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি মন্ত্রণালয় খোলা হবে।

৫১। বি. এন. পি. আমলে বার বার যে প্রলয়ংকরী ঝড়, বন্যা ও খরার প্রকোপে জনজীবন অতিষ্ট ও বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে খালেদা সরকার তা সফলভাবে মোকাবিলা করে সঠিকভাবে তাদের পুনর্বাসন করে এবং পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে জনগণের সংকট ও দুর্দশা লাঘব করেন। এ কাজে এ সরকার বিদেশ থেকে কোন সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করেনি।

৫২। বরাবরের মত প্রতিবেশী ও বিদেশী নৌ ও জলদস্যু সমুদ্র পথে এসে আমাদের অঞ্চলে মৎস্য শিকার ও অন্যান্য সম্পদ লুট করে নিয়ে যেত। বি. এন. পি. সরকার "দেশের জলসীমা পাহারা, নৌ ও সমুদ্র পথে জলদস্যুতা দমন ও চোরাচালান রোধের লক্ষ্যে 'কোস্ট গার্ড' প্রতিষ্ঠা করেন।

৫৩। নারী সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং শিশু জাতির ভবিষ্যৎ এ চেতনা বেগম খালেদা জিয়াকে নিরন্তর বিচলিত করত। এজন্য নারীদের শিক্ষার জন্য যেমন ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বেতন মওকুফ ও উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। তেমনি "নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান করে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন প্রণয়ন" করেন।

www.nagorikpathagar.org

৫৪। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর সরকার যে সফলতা অর্জন করে তার একটি নিদর্শন তিন বিঘা করিডোর বাংলাদেশের দখলে নিয়ে আসা। ভারত তিন বিঘা তাদের অধীনে রেখে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানে। খালেদা তাঁর রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে তিন বিঘা করিডোর অর্জন করেন ও তা ব্যবহার করা হচ্ছে এখন।

খালেদা জিয়ার আর একটি আন্তর্জাতিক কৃতিত্ব

৫৫। আন্তর্জাতিক নদী ব্যবহারের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নির্ভয়ে ফারাক্কা সমস্যা জাতিসংঘে উত্থাপন। গঙ্গা নদীসহ যে সমস্ত নদ-নদী ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে তাদের ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য ভারতকে রাজী করানোর উদ্দেশ্যে বেগম জিয়া তা জাতিসংঘে উপস্থাপন করে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। এতে দেশ-বিদেশে এ ব্যাপারে অবগত হয়েছে এবং বাংলাদেশ যে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণে প্রস্তুত নয় এবং নিজেদের স্বার্থে তিনি যে আপোসহীন এটিও প্রমাণিত হয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে।

৫৬। চাকমা শরণার্থীরা বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করার অভিপ্রায়ে ভারতে ট্রেনিং নিতে থাকে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে অশান্ত করে তোলে। বি. এন. পি. সরকার রাজনৈতিক কৌশলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনেন এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এ দেশের মূলনীতি হওয়ায় যে কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণের লোক নিজস্ব অধিকার নিয়ে এ জাতিসত্তার অধীনে বসবাসের সমঅধিকার প্রাপ্ত তা বি. এন. পি. তাদের বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়। ফলে বি. এন. পি. আমলে অন্য কোন চুক্তির প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু হাসিনা সরকারের নতজানুনীতির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমার একাংশ আ: লীগ সরকারকে দিয়ে দেশ বিভক্তির চুক্তি অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের সঙ্গে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি" করে এদেশকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয় ও দেশ বিভক্তির পথকে সুগম করে তোলে, যা দেশের জনগণ কোনদিনই মানবে না।

৫৭। বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্রকে সার্বজনীন রূপ দান করেছেন। সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। সেজন্য গণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে সকলের সহযোগিতা ও গঠনমূলক আলোচনাকে উৎসাহিত করার অভিপ্রায় দেশ পরিচালনায় বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। এজন্য বিরোদী দলের সদস্যদের সমন্বয়ে ৬০ টির মত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করেন এবং তার মাধ্যমে সকলের নিকট থেকে মতামত গ্রহণ করেন।

৫৮। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোতে মহিলা আসন সৃষ্টির ব্যবস্থা খালেদা জিয়াই প্রবর্তন করেন— যা নারীর মূল্যায়নে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখে।

১৯৯৬ সালের ১৫-ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ যে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল, সেকথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ সংবিধান পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের সকল ক্ষমতা রাখে। বি. এন. পি.-র শাসনামলের শেষ দু'বছর সরকার বিরোধী রাজনীতির নামে সংসদকে অকার্যকর করে তোলার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপ দেশকে একটি সরকারবিহীন, সংবিধানহীন, অরাজক

www.nagorikpathagar.org

পরিস্থিতির দ্বারপ্রান্তে এনে ফেলে দিয়েছিল। ৫ম জাতীয় সংসদের বিলুপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করা না গেলে দেশ এক চরম অরাজক সংকটে উপনীত হত। এ সম্পর্কে বি. এন. পি. চেয়ারপার্সন সচেতন ছিলেন এবং দেশকে এ সংকট থেকে রক্ষার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তা তিনি জানতেন। তাই বেগম খালেদা বলেছিলেন, "১৫-ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার জন্য অপরিহার্য"। তিনি ঘোষণা করেছিলেন "১৫-ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদের কাজ হবে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে সকল দলের অংশগ্রহণের উপযোগী সাংবিধানিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।" আল্লাহর রহমতে বেগম জিয়া দেশবাসীকে দেয়া অঙ্গীকার পালন ও ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে মাত্র ১৫ দিনের মাথায় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। সকল দল ও জনগণ বেগম জিয়ার এ ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। এ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে ১২-ই জুন ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাই "৬ষ্ঠ সংসদের স্থায়িত্বকাল যত স্বল্পই হোক তার গুরুত্ব ও অবদান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সংবিধানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

বি. এন. পি.-কে একদিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেবেন না বলে শেখ হাসিনা যে ঈর্ষাকাতর উক্তি করেছিলেন, "সেই আক্রমণের উদ্দেশ্য কেবল বি. এন. পি. সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করাই ছিল না। প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করা। রেল লাইন উপড়ে ফেলে, সমুদ্র বন্দর বন্ধ করে দিয়ে, কলকারখানায় উৎপাদন স্বচ্ছ করে, কৃষি উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত করে, আমদানী-রফতানী বাণিজ্য বিঘ্নিত করে, নীরিহ মানুষের উপর পেট্রোল বোমা (অন্যান্য বোমাও) মেরে, স্বাভাবিক জনজীবন বিড়ম্বিত করে এবং খেটে খাওয়া মানুষের অন্নসংস্থানের পথ রুদ্ধ করে এবং যমুনা সেতু নির্মাণকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে চেয়ে বাংলাদেশকে সিকিম বানানোর এক পরিকল্পনা করেছিল তারা। এককথায় বাংলাদেশের মেরুদণ্ডকে চুরমার করে ভেঙ্গে দেয়ার এক অশুভ নেশায় মেতে উঠেছিল তারা পরদেশীদের কৌশলগত ইশারায়। আমাদের স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৫-ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে এবং ১৫ দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক বিল পাস করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে ১৯৯৬ সালের ১২-ই জুন নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করেন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হওয়ার কারণে আসন্ন বিপদ হতে বাংলাদেশ রক্ষা পায়। এ সবই বি. এন. পি. সরকার এবং সরকারপ্রধান স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবদান, একথা সর্বজনস্বীকৃত সত্য।

১৯৯৯ সালের ৩১-শে জুলাই আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এক জনসভায় বলেছিলেন যে হাসিনার সরকার ভারতের সঙ্গে কোন ট্রানজিট চুক্তি করেনি, করেছে ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি। এর একদিন আগে ভারতের হাইকমিশনারের একজন কর্মকর্তা বলেছিলেন, বাংলাদেশ সরকার ২৮ জুলাই যে চুক্তির কথা বলেন তা ট্রানজিট বা করিডোর নয়, তা ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি। আমি তো এ তিনটি নাম সমার্থক অর্থেই ব্যবহৃত হয় বলে জানি। মূলকথা, যে নামেই ডাকি না কেন, এটি কলকাতা তথা ভারতের যে কোন স্থানের মালপত্র বা পণ্য আগরতলায় সোজাসুজি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা মাত্র। আমি নকল করিনি, শুধু বই দেখে লিখেছির মত ঘটনা আর কি।

www.nagorikpathagar.org

আমরা জানিনা, এ চুক্তির মাধ্যমে হাসিনার কোন গোপন উদ্দেশ্য আছে কিনা, তবে এটি নতজানু পররাষ্ট্রনীতিরই একটি রূপ যা এদেশের লোককে হতবাক করেছে। সেজন্য হাসিনা দেশের মানুষকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাঁর সরকারের "বাণিজ্যমন্ত্রী" বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য উৎসের 'কিউ' ধরে চলেছেন, এর ফলে বছরে আয় হবে ৭০০ থেকে ৮০০ কোটি টাকা। লন্ডনের এক সম্ভ্রান্ত পত্রিকার হিসাব মতে, এ আয় বড় জোর হবে ৩০০ কোটি টাকা। আর এ ৩০০ কোটি টাকার জন্য বাংলাদেশকে মূল্য দিতে হবে প্রচুর। বিদেশী সহায়তায় নির্মিত রাজপথ, সেতু কি এ ভার বহন করতে পারবে? এ প্রশ্ন অনেক বিদেশী সংস্থা এবং পর্যালোচকের।"

ভারত নিজ দেশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে যেতে দেবে না, কিন্তু তারা আসবে— এটা যে কত প্রভুত্বব্যাঞ্জক অভিব্যক্তি তা শেখ হাসিনা বোঝেন না। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী বললেও হেসে ফেলেন তিনি, আর আমরা এতে জ্বলে পুড়ে যাই। তিনি, তাঁর দল, তাঁর বুদ্ধিজীবী কিসের নেশায় ভারতের স্বার্থে এসব চুক্তি করে যাচ্ছেন, তা আমরা বুঝলেও কিছু বলতে পারি না। কেন ১৯৯৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বাংলাদেশ-নেপাল জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানেও প্রচুর করতালির মধ্যে যে ট্রানজিট উদ্বোধন করেন, তা "কিন্তু মাত্র পনের মিনিট পরে নেপাল থেকে বাংলাদেশে (ভারতের উপর দিয়ে) মাত্র তিনটি ট্রাক প্রবেশের পরই বন্ধ হয়ে গেছে।" যেখানে আয় হত বছরে ২০০ কোটি টাকার মত। কেন বন্ধ হল তা আমাদের প্রধানমন্ত্রী জবাব দিতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা এখন আবার কেন নেপাল-বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ-ভুটান পণ্য যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে পারছেন না? গ্যারান্টিক্লোজ ছাড়া ৩০ বছরের জন্য ফারাক্কা চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি, ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি, মুখ্যমন্ত্রী বলায় আপনার ক্রোধের পরিবর্তে হাসি— এসবই একজাতিতত্ত্বের যাঁতাকলে আত্মবলিদানের প্রস্তুতিকাল, এর জবাব তিনি দিতে পারবেন না— তা আমরা জানি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডের আগুনে জন্ম বি. এন. পি. ও জনগণ তা সহ্য করবে না।

সার্ককে অকেজো করে দিয়ে চতুর্ভুজ চুক্তির দিকে কেন ভারত এগিয়ে যেতে চায় এবং এসবের ব্যাপারে শেখ হাসিনার সরকার ও তার সমর্থিত বুদ্ধিজীবী কেন সমর্থন করছে তা আর কারো অজানা নেই। মনে রাখা দরকার, ১৯৮০ সালের চুক্তি, খালেদার ১৯৯৩ সালের সাপটা চুক্তি এবং জিয়ার সার্ক (SAARC) আদলের সমঝোতার সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারপ্রধান হাসিনার ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি এক নয়। অনেকটা বিপরীতধর্মী, বরং ভারত যে চতুর্ভুজ সংস্থা বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান ভারতকে নিয়ে করতে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। হাসিনা ভারতে আগ্রাসী চেহারা দেখেও সিকিমের মি: দর্জীর মত ভারতের সঙ্গে কতকগুলো চুক্তির ফাঁদে এবং দর্জীর নিজ স্বার্থে ভারতের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে যে সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিল তার পথেই সিকিমকে ২২ তম অঙ্গরাজ্য হতে হয় ভারতের, হাসিনা ঠিক একই পথে পা বাড়াচ্ছেন— ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তিসহ অন্যান্য চুক্তি ও ভারতের নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। এখানে ভারতের আগ্রাসী চরিত্রের কয়েকটি নমুনা তুলে ধরলাম।

ভারত বাংলাদেশের চুক্তির বলে (মুজিব আমলে) বেরুবাড়ীর উপর ভারতের আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ তা ছেড়ে দেয়, কিন্তু তার

www.nagorikpathagar.org

পরিবর্তে ভারত এখনও তিন বিঘা ছেড়ে দেয়নি। বাংলাদেশকে, শুধু তার উপর দিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে যাতায়াত করতে দিলেও তার উপর বাংলাদেশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। খালেদা এ নিয়ে হৈ চৈ ও দেন-দরবার করলেও হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়ে একেবারে চুপ করে আছেন। দক্ষিণ তালপট্টির বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে, বাংলাদেশের সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও, ভারতের জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছে। হাসিনা সরকারের পূর্বে খালেদাসহ '৭৫, পরবর্তী সরকারগুলো দখল, পুনর্দখল, বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনসহ তা নিজ দখলে রাখার একান্ত প্রচেষ্টা চালালেও প্রধানমন্ত্রী হাসিনা, আমার জানা মতে, একটি কথাও বলেন নি, বা বলে ওদের বিরাগভাজন হতে চাননি. "মুখ্যমন্ত্রী" টাইটেল নিয়ে আনন্দেই আছেন। ভারতের সীমান্তরক্ষী বি এস এফ-এর গুলিতে শতাধিক লোক ও বিডিআর মারা গেলেও তিনি গা বাঁচিয়ে এবং ভারতকে সন্তুষ্ট রেখেই গা বাঁচান গোছের মৃদু প্রতিবাদ করেছেন। স্বাধীনতা পিয়াসী উলফা নেতাদের অকারণে বন্দী করছেন, যারা কোনদিনই এদেশে ট্রেনিং দিতে আসেনি। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েক শত চাকমাদের ভারত শুধু আশ্রয়ই দেয়নি, তাদের সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা ট্রেনিং দিয়ে এ অঞ্চলকে করায়ত্ব করার চেষ্টা করছে এবং শান্তি চুক্তির মাধ্যমে মি: দর্জীর মত তা দখলের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছে। এছাড়া ভারতের 'পুশ ইন', 'পুশ আউট' খাঁড়ার নিচে অবস্থান করছে এদেশের কোটি কোটি মানুষ। ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্টের পথ ধরে এ বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনী ঢুকানো এখন পরিকল্পনাধীন।

ভারতের মৌলবাদীরা এদেশের ভূখণ্ড কেড়ে নিয়ে 'বঙ্গভূমি' করার আন্দোলনে রত। ফারাক্কাসহ বহু আন্তর্জাতিক নদীতে বাধ দিয়ে এদেশকে মরুভূমি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে তারের বেড়া দিয়ে আমাদের লোককে ভারতে অবৈধভাবে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু সীমান্তের কাটা তারের বেড়া তাদের স্থলে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের যে কোন অত্যাচারী এদেশে আসতে যেন পারে সে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশের সন্ত্রাসীগণ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রঘাতী তৎপরতায় লিপ্ত। অথচ এসব হাসিনা সরকার দেখেও দেখছেন না কোন্ স্বার্থে? ভারত তাকে 'মুখ্যমন্ত্রী' বলা সত্ত্বেও মুখ টিপে হাসেন তিনি, কোন প্রতিবাদ করেন না, আমাদের হৃদয়ে যে তাতে আগুন লেগে গেছে, এটিও তিনি ভাবেননি, ভাবেননি তাঁর সমর্থিত আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থিত ও ভারতের ইঙ্গিতবাহী বুদ্ধিজীবিগণ। এসব কিছুর অধিকাংশই জাতীয় সংসদকে এড়িয়ে করা হচ্ছে বা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরা দেখেছি, ভারত-নেপাল-বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি বাণিজ্যমন্ত্রী উদ্বোধনের ১৫ মিনিটের মধ্যে মাত্র ৩টি ট্রাক যাতায়াতের পরই তা বন্ধ হয়ে যায়। এখানে বাংলাদেশ ও ভারতের সঙ্গে চুক্তি করা বা না করা ভারতের স্বার্থেই করে থাকে এবং তাদের স্বার্থে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। বাংলাদেশের অবস্থানগত কারণে এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের কারণে ভারতের শিরপীড়া হয়েছে।

পাকিস্তান এখন যে অবস্থানে আছে, তাতে কাশ্মীর ব্যতীত অন্য তেমন কোন সমস্যা নেই, কিন্তু বাংলাদেশকে নিয়ে তার স্বার্থের সমস্যা চিরদিন থাকবে বলে ভারতের ধারণা এবং সে কারণে ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে স্টেট টু স্টেট সম্পর্ক না রেখে স্টেট টু গভর্ণমেন্ট অথবা স্টেট টু পার্টি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি বাংলাদেশকে দাস

www.nagorikpathagar.org

করে রাখা বা সিকিম করার এক জঘন্য ষড়যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ কারণেই ১৯৭১ সালে খন্দকার মোশতাক ও ফজলুল হক মনিকে দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন করতে চেয়েছিল ভারত। কারণ কনফেডারেশনভুক্ত বাংলা প্রদেশ বা পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের চাইতে অনেক দুর্বল। হয়ত এসব কারণে শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে একাত্তরের মুক্তিবাহিনী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে ভারতের যে ৭টি প্রদেশ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছেন—তাদের স্বাধীনতাকে বা স্বাধীনতা যুদ্ধকে দমন করার জন্য বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে চান এবং সে কারণে ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তির মাধ্যমে এদেশের উপর দিয়ে ভারতের সামরিক বাহিনী আনার পরিবেশ সৃষ্টি ও বাংলাদেশকে আসামসহ ৭টি প্রদেশের শত্রু করতে চান। ফলে ভারতও স্বাধীনতাকামীদের দ্বারা, (বাংলাদেশ) আক্রান্ত হওয়ার অদূর ভবিষ্যতে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এ কারণে তাঁরা চুক্তি করতে চান বা চুক্তি করতে চান না।

১। প্রথম উদ্ধৃতি, "বাংলাদেশে ভারতের প্রথম ডেপুটি হাই কমিশনার এবং ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জে এন দীক্ষিত তার সদ্য প্রকাশিত Liberation and Beyond গ্রন্থে ২৫৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, নেপাল ও ভুটানের সাথে বাংলাদেশের ট্রানজিট ব্যবস্থা কার্যকরী হলে তা ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে। তার নিজের কথায় ঃ Our security and political agencies felt that allowing transit facilities to Bangladesh through our territory to Bhutan and Nepal would only increase the Problems that India already faced in terms of illegal migration and security threats. JN Dixit (1999)— অর্থাৎ আমাদের নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অনুভব করেছেন যে, আমাদের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে নেপাল ও ভুটানের বাণিজ্যের জন্য বাংলাদেশকে ট্রানজিট দিলে ভারত অবৈধ অনুপ্রবেশ ও নিরাপত্তা সম্পর্কে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা আরো বৃদ্ধি পাবে।"

ভারতের অনুপ্রবেশ ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সমস্যা বৃদ্ধি পেলে এদেশের ভিতর দিয়ে ট্রানজিটের ফলে তা আমাদের পাবে না, একথা ভারত ও শেখ হাসিনা ভাবেন কি করে? বরং তাদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয়ত, ভারতের স্বার্থেই আবার বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে তারা ট্রানজিট সুবিধা পেতে চায়। "ভারতের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হবে এ আশঙ্কায় ভারত বাংলাদেশকে ভারতের উপর দিয়ে নেপাল ও ভুটানের সাথে বাণিজ্যের জন্য ট্রানজিট দিতে নারাজ। (অথচ) ভারতের নিরাপত্তার জন্যই কিন্তু বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারত চায় তার এক অংশ থেকে অন্য অংশে নির্বিঘ্নে যেতে, বাণিজ্যিক দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে প্রথমে এবং চূড়ান্ত মুহূর্তে সামরিক সরঞ্জামসহ।" দৈনিক দিনকাল, ৫–৬ আগস্ট ১৯৯৯।

জিয়ার ১৯৮০ সালের চুক্তি ছিল মুজিব সরকারের ১৯৭৩ সালের চুক্তির বর্ধিতাংশ যা মূল চুক্তি (ট্রানজিট)-র সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। ট্রানজিট প্রক্রিয়ার সূচনা হয় শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৭২ সালের ১৮–১৯ মার্চের ঘোষণায় "উভয় প্রধানমন্ত্রী দুই দেশের মধ্যে ট্রানজিট এবং সীমান্ত বাণিজ্য পুনরুজ্জীবন ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে একমত হন।"

www.nagorikpathagar.org

পরে ভারতের কারণে সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায় এবং হাসিনা সরকারের পূর্ব পর্যন্ত ট্রানজিট দেয়া হয় না এবং ভারতও তাদের স্বার্থে নেপাল–ভুটানের সঙ্গে বাংলাদেশের ট্রানজিট চুক্তি বন্ধ করে দেন। কিন্তু ভারতের স্বার্থে কলকাতা হতে বাংলাদেশ হয়ে আগরতলা যাওয়ার ট্রানজিট প্রদানের জন্য একতরফা চুক্তি করেন শেখ হাসিনা। যার ফলে দেশের স্বাধীনতাই বিপন্নের পথে। আর খালেদা জিয়া তারই বিরুদ্ধে জীবনপণ লড়াই করে চলেছেন দলীয় নেতা-কর্মী ও লেখক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে। ১৯৭৪ সালের ১২-ই মে মুজিব ভারতের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে রেল যোগাযোগ বা রেল ট্রানজিট (ভারত হতে বাংলাদেশ হয়ে ভারত) পুনঃপ্রবর্তনের জন্য "বাংলাদেশের চাঁদপুর এবং আখাউড়া হয়ে কলকাতা এবং আগরতলার মধ্যে" তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরীক্ষার জন্য সম্মত হয়ে উভয়ে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু বাংলাদেশ ভারত হয়ে নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে যাওয়ার ব্যাপারে ভারতের কিছু বলা হয় না। মুজিবের ২৫ বছর মেয়াদী গোপনচুক্তি ও বাংলাদেশের স্বার্থের প্রতিকূলে ছিল। তবে জনকণ্ঠে সাইফুর রহমান বলেন, ১৯৭৩ ও ১৯৮০-এর বাণিজ্য চুক্তির ৮নং ধারায় আছে। তা বাস্তবায়নের জন্য ট্রানজিট চুক্তি নয়। পরে তা করা হয় বা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

সে কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্যবাদী মনোভাবের কারণে যে ভারতভীতি সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে শ্রীলঙ্কার নিরাপত্তা বিশারদ শেলটন কোডিকারা (Shelton kodikara) বলেন, "A Perception of threat from India is currently common to all its neighbours and it is one of the dilemmas of South Asian Politics that while India perceives its neighbours as being integral to its own security, the neighbours perceive India itself as the entity against which security is necessary. ভারতভীতি বর্তমানে রয়েছে তার প্রত্যেক প্রতিবেশীর মনে। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির অন্যতম উভয় সংকট হল ভারত তার প্রতিবেশীদের মনে করে তার নিজস্ব নিরাপত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে। কিন্তু তার প্রতিবেশীরা ভারতকে মনে করে এমন এক জনপদ যা তাদের নিরাপত্তার জন্যে হুমকিস্বরূপ।"

আর এ কারণে জিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে নিরাপত্তাকে নিরাপদ করতে চেয়েছিলেন। SAARC বা দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা চুক্তির মাধ্যমে। এতে ভারতসহ ৭টি দেশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি এগিয়েছিল অনেক দূর। কিন্তু ভারতের অসহযোগিতামূলক মনোভাবের কারণে তা এখন মৃতপ্রায় এবং চতুর্ভুজ চুক্তির প্রতি আগ্রহ ভারতের উক্ত চেতনার স্বার্থে এবং হাসিনা সরকারের মনোভাবের জন্য যে কোন সময় স্বাক্ষরিত হতে পারে। যা বাংলাদেশকে পুরোপুরি দাস করে রাখবে। ভারত বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত বোনকে আসাম, অরুণাচল, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও মনিপুরের স্বাধীনতাকামী অঞ্চলকে দমিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে। বিদ্রোহের আগুন বাংলাদেশের সহযোগিতায় নিভিয়ে বাংলাদেশকে সে আগুনের সামনে ছুঁড়ে ফেলতে চায় ভারত। বাংলাদেশকে এ যুদ্ধের অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চায় ভারত, সেজন্য ট্রানজিট চুক্তি, সে কারণে চুক্তি করা হল পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চুক্তিসমূহ।

www.nagorikpathagar.org

ভারতীয় সমর ও নিরাপত্তা বিশারদ কে সুব্রামনিয়াম তাঁর Bangladesh and India Security নামক প্রবন্ধে বলেন, "বাংলাদেশের উপস্থিতি ভারতের কৌশলগত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি বড় ধরনের দুর্বল অবস্থানের সৃষ্টি করেছে। যদি আসাম বা তৎসংলগ্নজাতির রাজ্যে বা প্রতিবেশী মায়ানমারের পরিস্থিতির অবনতি ঘটে তাহলে এ অঞ্চলে ভারতের নিয়ন্ত্রণ রক্ষায় বাংলাদেশ বড় আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠতে পারে। অপর একজন সমরবিশারদ লে: জেনারেল এ এম বোহ্‌রার ভাষায়, "১৯৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশ চীনের সাথে যেভাবে নিরাপত্তার বন্ধনে আবদ্ধ এবং বর্তমানে পাকিস্তানের সাথে তার যে সামরিক সহযোগিতা গড়ে উঠেছে তা মনে রেখে ভারতীয় প্রতিরক্ষানীতি নির্ধারকদের এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, চীন অথবা পাকিস্তানের সাথে যে কোন বিরোধের সময় বর্তমান শক্তির বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর বড় এক অংশকে আটক রাখতে পারে।" আসাম অঞ্চলে ভারতের যে সেনাবাহিনী আছে তাদের রক্ষা ও তাদের বিদ্রোহ ও মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিহত করার প্রয়োজনে বাংলাদেশকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায়। সেজন্য এ ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্টের চুক্তি তা হাসিনা জেনে শুনেই তার সমর্থিত আওয়ামী লীগ ও তাঁর সমর্থিত বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে করেছেন।

ট্রানজিট চুক্তির কথা বলতে গিয়ে যে কথা এসে যায় তা হল, কেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার নিজেদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে এত আগ্রহ নিয়ে চুক্তি করতে গেলেন। হাসিনার নির্বাচনী ওয়াদা নেই, জনগণের ম্যান্ডেট নেয়া হয়নি, তার পরেও কেন স্বার্থ বিরোধী এ চুক্তি। এ ট্রানজিট এদেশের রাস্তাকে ভাড়া দেয়া ও মুটে মজুরদের কাজ ছাড়া অন্য কিছু স্বার্থ আছে বলে আমার জানা নেই। যে প্রতিবেশী (ভারত) তার ত্রিসীমানায় ১৫ মিনিটের বেশি [বাংলাদেশ (ভারত হয়ে) ভুটানে ট্রানজিট চুক্তি] আমাকে "একটি পাও ফেলতে দেয় না, কিছু অর্থের বিনিময়ে আমি তাকে আমার বাড়ির মধ্যে দিয়ে পথ করে দেব?"

একজাতিতত্ত্বের আদর্শ সামনে রেখে ভারত ১৯৪৭-পূর্ববর্তী ভারত-বাংলাদেশের পথকে উন্মুক্ত করে পূর্বের মত যাতায়াতের পথকে সহজ করার ভারতীয় স্বার্থের কাছে হাসিনা কোন্ স্বার্থে নতি স্বীকার করতে ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি করলেন তা দেশবাসীকে অবশ্যই জানতে হবে।

আওয়ামী লীগ বলে বেড়াচ্ছেন, জিয়ার ১৯৮০ সালের চুক্তির এটি বর্ধিত রূপ। কিন্তু আসলে ১৯৭২ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তিরই প্রতিফলন ঘটেছে হাসিনার চুক্তির মাধ্যমে। জিয়ার ১৯৮০ সালের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মূলতঃ SAARC সম্মেলনের পূর্বপ্রস্তুতি বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি দৃঢ়পদক্ষেপ। সেজন্য একে ট্রানজিট চুক্তি বলা যায় না বা ট্রানজিট চুক্তির কোন ধারা এমনভাবে স্পষ্ট নয় বা তা বাস্তবায়িতও হয়নি। তবে ভারত তাদের স্বার্থে ১৯৪৭ সালের পর থেকে এ দেশের উপর চাপ সৃষ্টি করে আসছিল। যার মূলে ছিল এদেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সিকিম রাজ্যে পরিণত করার হীন ষড়যন্ত্র। বর্তমানে হাসিনা সেই পথেই পা দিয়েছেন।

যে কোন চুক্তি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হোক না কেন— তা যদি জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের হুমকি হয় বা তার সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে সে চুক্তি অবশ্যই

www.nagorikpathagar.org

সবদিক ভেবে চিন্তে করতে হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে তার বিষয়বস্তু সকলের নিকট প্রকাশের প্রয়োজনে সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমগুলোতে আনা দরকার। রাজনৈতিক ঐক্যমত ও জনসমর্থন প্রয়োজন। আইন ও প্রচলিত বিধিবহির্ভূত না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার। স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব যেন এতটুকু ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে অবশ্যই নজর দেয়া উচিত। গোটা চুক্তির খসড়া সংসদে আলোচনার জন্য উপস্থাপন এবং প্রয়োজনে গণভোটের ব্যবস্থা করা উচিত। এছাড়া দেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এ ব্যাপারে আলোচনা সভা ডাকা উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু হাসিনা ফারাক্কা চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তি, ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তির মত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির ক্ষেত্রে এসবকে থোরাই কেয়ার করেছেন এবং জনমতের মর্যাদা হানি করেছেন তিনি।

আর সে কারণে বেগম খালেদা জিয়া সেসব চুক্তির বিরুদ্ধে আগাম টের পেয়ে হরতাল, প্রতিবাদ জনসভা ইত্যাদি করে চলেছেন এবং বি. এন. পি. ও চুক্তি বিরোধী দলগুলো এবং জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। শেখ মুজিব বাস্তবতার আলোকে এসব চুক্তির পরে বাস্তবায়ন বা তা সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। অথচ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার তা সাগ্রহে গ্রহণ করা ও এ সম্পর্কে উৎসাহী হওয়ার কারণ কি তা আমরা জানি। এসব হাসিনাকে মুখ্যমন্ত্রী বলার পূর্বপরিকল্পনা মাত্র। তা নাহলে ভারতের ধারণা হল কিভাবে, "বাংলাদেশকে ভুটান ও নেপাল ট্রানজিট দিলে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। কিন্তু ভারতকে ট্রানজিট দিলে (যা প্রধানমন্ত্রীর কথায় ট্রান্সশিপমেন্ট) বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না?" মানব জমিন, ৮ আগস্ট ১৯৯৯। এ কেমন কথা। সেজন্য এসব কারণে দেশের জনগণ আওয়ামী লীগকে পূর্বের মতই প্রত্যাখ্যান করেছে এবং "আওয়ামী বিরোধী মনোভাব ভারত বিরোধিতাকে তীব্র করে তুলেছে।"

ইতঃপূর্বে আমি বলেছি, ভারত ও তার অনেক পত্র-পত্রিকা এবং তাদের সরকার তা সে মৌলবাদী বিজেপিই হোক বা কম্যুনিস্ট পার্টিই হোক এ দেশকে একজাতিতত্ত্বের আওতায় এনে বাংলাদেশকে যে সিকিম বানাতে চায় এবং এ ব্যাপারে লেন্দুপ দর্জীর মত শেখ হাসিনা তাঁর সরকার, তাঁর আদর্শের অনুসারী আওয়ামী লীগ এবং বুদ্ধিজীবীও যে সে পথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এবং জ্ঞাতে কেউবা অজ্ঞাতে তাদের সমর্থন করে যাচ্ছে সে সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করেছি। আনন্দবাজার পত্রিকা ও দীক্ষিতের প্রবন্ধ তাকে আরও সুসম্পর্কিত করে তুলেছে। আনন্দবাজার পত্রিকায় উল্লিখিত মনোভাবের আলোকে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালের বাংলাবাজার পত্রিকা 'নতজানু হয়েও কি রক্ষা পাবেন'। শিরোনামে বলেন, " আদভানীর পথে বুদ্ধদেব"— এ শিরোনামে রচিত হয়েছে সম্পাদকীয়। এর কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় পুলিশের দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনার কৃতিত্বের জন্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকুমার মহান্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে 'অভিনন্দন' ও 'কৃতজ্ঞতা' জ্ঞাপন, অভিনন্দন এজন্য যে মার্কসবাদী সরকারের মন্ত্রী হয়েও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদী রথযাত্রাখ্যাত এবং অখণ্ড ভারতের 'নতুন' প্রবক্তা কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানীর (সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে আডভানী) 'দাওয়াই' তথা মতবাদকে শিরোধার্য করে আর একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রবেশে (বাংলাদেশের)

www.nagorikpathagar.org

বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত হননি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে এজন্য অর্থাৎ "যদি সন্ত্রাসবাদীরা ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর তাড়া খাইয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আত্মগোপন করিতে চায়, তবে পশ্চাৎধাবন করিয়া ভারতীয় রক্ষীরা সেই রাষ্ট্রের সীমান্ত অতিক্রম করিবে এবং তাহাদের সেখান হইতে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়া আনিবে" তাতে সম-সার্বভৌমত্বের আন্তঃরাষ্ট্রীয় নীতি লঙ্ঘিত হোক অথবা অন্য রাষ্ট্রে অনির্ধারিত প্রবেশের দায়ে অভিযুক্ত হোক না কেন আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির নির্লজ্জ লঙ্ঘন।"

একথা আনন্দবাজার পত্রিকাগুলো বলেছে, ইতোপূর্বে ভারতীয় রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলের এক গ্রামের মসজিদে ঢুকে ১৩ আগস্ট ১৯৯৯ সালের ৩০ কিলোগ্রাম RDX (আরডিএক্স) বিস্ফোরক উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এটিও আসামের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকুমার মহান্ত সগর্বে তাঁদের স্বাধীনতা দিবসে ঘোষণা দেন। এগুলো স্বাধীনতা আন্দোলনকারী উলফাদের কাজ এ বিষয়ে ইঙ্গিতও দেয়া হয়। করিডোর বা ট্রানজিট না পেয়েই যদি একটি স্বাধীন সার্বভৌম (বাংলাদেশে) দেশে তারা অনুমতি ব্যতিরেকে জোর করে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে করিডোর বা ট্রানজিটের মাধ্যমে যখন সেনাবাহিনী উলফাদের দমনের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাবে, তখন এসব কারণে এবং স্বাধীনতাকামী আসামীদের আক্রমণে বাংলাদেশও সমর ক্ষেত্রে war field-এ পরিণত হবে না, এ নিশ্চয়তা দেবে কে। হাসিনার এতে কি স্বার্থ রক্ষা হবে তাও প্রশ্নাতীত নয়— আর সেজন্য স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর নেতাদের ও বি. এন. পি. এবং তার অঙ্গ দলগুলো নিয়ে এসবের বিরুদ্ধে নিরন্তর আন্দোলন ও প্রতিবাদ করে চলেছেন। এ এক দেশপ্রেমের বিরল দৃষ্টান্ত, জনসমর্থনে যা আরো ব্যাপকতা লাভে সক্ষম হয়েছে।

তারপরেও হাসিনা-মন্ত্রিসভার সদস্যের একটি ঘৃণ্য চিত্র এখানে তুলে ধরতে চাই। দেশের পত্র-পত্রিকা একনাগাড়ে যখন সোচ্চার, তখন পররাষ্ট্র সচিব (মন্ত্রীর নির্দেশ মত) বলেন যে (শফি সামী) নতুন দিল্লীতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন থেকে অফিসিয়ালী রিপোর্ট না এলে তিনি কিছু বলবেন না। বলিহারি! সার্বভৌমত্বে অনুপ্রবেশ, আর তাঁরা রিপোর্টের অপেক্ষায় থাকবেন। পরে সচিব মুখ খুলে ভারতকে বাঁচানোর জন্য বললেন, আসামের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহান্ত 'একথা বলেননি'। উলফাদের প্রত্যক্ষ শক্রকে এভাবে তিনি রক্ষা করলেন এবং উলফাদের নিকট বাংলাদেশকে শত্রু করে তুললেন। বাংলাদেশের দুর্বল সরকারের বা ভারতের সহযোগী সরকার আওয়ামী লীগের কারণে আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন।

চীন ও ভারত পরস্পরের বৈরী হলেও এ দুটি দেশ পৃথিবীর কয়েকটি শক্তিশালীর মধ্যে তাদের স্থান করে নিতে বসেছে। অপরদিকে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছে। এটি চীন-ভারতসহ বিশ্বের অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ স্বীকার করেন। বাংলাদেশের চারদিকে ছোটবড় কয়েকটি রাষ্ট্র এর সঙ্গে সংযুক্ত বা নিকট স্থানে (অসংযুক্ত) অবস্থিত। সেজন্য এদেশকে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক উপায়স্থল হিসেবে এবং করিডোর হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। সেজন্য তাদের কোনো অঙ্গ স্বাধীনতা ঘোষণা বা বিদ্রোহ করলে বাংলাদেশ হতে তা দমন করার অভিলাষ পোষণ করে। এ ইচ্ছা অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে

www.nagorikpathagar.org

ভারতের অত্যন্ত বেশি। আর সে কারণে স্টেট টু স্টেটের মর্যাদা বাংলাদেশকে ভারত দিতে চায় না। অথচ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আর ভারত সেজন্য চাইছে বাংলাদেশকে বগলদাবা করে রাখতে অথবা সিকিমের মত রাজ্য বানাতে। বাংলাদেশের হাসিনা সরকারের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি এবং ভারতের নিকট নতজানু পররাষ্ট্রনীতি এবং স্টেট টু গভর্ণমেন্ট এবং স্টেট টু পার্টি সম্পর্ক হাসিনার সঙ্গে। সেকারণে ভারত নানাভাবে কবজা করার কৌশল করছে। কিন্তু তা হতে দেয়া যায় না। জনগণকেও এ ব্যাপারে ভেবে দেখতে হবে, একমাত্র আওয়ামী লীগই ভারতনির্ভর সরকার বা সিকিম হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য এ দলকে স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেয়ার জন্য ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসালে যে পরিণতি হবে তা বার বার ভেবে দেখতে হবে।

এবার ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের গতিপথ নিয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার। পূর্বে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের, যে গতিপথ ছিল বর্তমানে তা পরিবর্তন করার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভারতের উপর নির্ভরশীল হতে হবে আমাদের পূর্বে যা ছিল না। তাছাড়া ভারত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হলে হয়ত অতটা অসুবিধা হতো না, এর ফলে বৃহৎ ভারতের প্রভাব আমাদের অর্থনীতিকে ভারতনির্ভর করে তুলবে। দৈনিক দিনকাল, ১১ জুন ১৯৯৯-এর ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের পরিবর্তিত গতিপথ শিরোনামে বলেন, "মাত্র কদিন পুর্বে এসক্যাপের (ESCAP) উদ্যোগে ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ গ্রুপের ৪ দিনব্যাপী বৈঠকে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের (Trans Asian Railway) রুট চূড়ান্ত করা হল। এ রুটের গতিপথের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ন্তাগণ কতো অসহায়, কতো অবোধ অথবা কত নির্বোধ এবং কত পরনির্ভরশীল। এ বৈঠকে চূড়ান্ত করা রুটটি হচ্ছে চীনের দক্ষিণ ইউনিয়ন প্রদেশের কুনমিড থেকে শুরু হয়ে বার্মা—ভারত বাংলাদেশ– ভারত পাকিস্তান-ইরান-তুরস্ক হয়ে ইউরোপের বুলগেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এসক্যাপের বৈঠকও নতুন নয়। ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের বাংলাদেশের রুটের চিন্তা-ভাবনাও নতুন নয়। ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের বাংলাদেশ অংশের মূল রুট হবার কথা ছিল চট্টগ্রাম মায়ানমার রেলপথের মধ্য দিয়ে। এসক্যাপের ৫৩তম বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। বর্তমানে ক্ষমতাসীনদের মাধ্যমে (হাসিনা সরকার) দর্শনা-চট্টগ্রাম- মায়ানমার রুট পরিবর্তিত হয়েছে। সিলেটের কুলাউড়া-শাহবাজপুর-ভারতের ল্যাংডিং ও লাঘপাই মায়ানমার। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা ভদ্রভাবে বসে রইলেন সেই বৈঠকে এবং সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।" যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর।

ফলে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম মায়ানমারে যেতে হলে স্বাধীন ভারতের মধ্য দিয়ে যেতে হবে ভিসার মাধ্যমে। দুর্গমতার কথা তুললে বর্তমান পথই দুর্গম বেশি। সবই ভারতের স্বার্থে করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে আরো বিস্তৃত আলোচনা করলে ভারতের স্বার্থেই যে করা হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এখনই তার ফল পাচ্ছি মায়ানমার ও বাংলা সীমান্তে মায়ানমারের বাঁধ নির্মাণ ও সেনা সমাবেশ ঘটানোতে।

ঢাকা-কলকাতা বাসরুট চালু ভারতের একটি কূটনৈতিক বিজয় বলে অনেকে মনে করলেও, দু অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে, যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীসহ সুধীজন ও রাজনৈতিক অনেক

www.nagorikpathagar.org

নেতৃত্বই উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে পরস্পরের যাতায়াত ও সুবিধার জন্য স্টেট টু স্টেট সম্পর্ক ভাল। কিন্তু আমরা জানি ভারতের কূটচাল এর চেয়ে অনেক বেশি। এর ভিতরও তারা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায়। তাদের স্বার্থ ছাড়া তারা এক কদমও নড়বে না। প্রাথমিক কারণ এদেশের বুদ্ধিজীবীর একাংশ ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বদান করেও দাদাদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে সাধনার ধন বলে মাথায় রাখেন, কলকাতা প্রাদেশিক রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার সাহিত্য সংস্কৃতির মূল্যায়নে আমাদের ঢাকা তথা দেশীয় সংস্কৃতি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অতএব ওখানকার সংস্কৃতি এখানে আমদানী কর, হোক না তা মৌলবাদী হিন্দু সংস্কৃতি, তাতে কি এসে যায়। আর এখানেই আমাদের ভয়। এদেশীয় সংস্কৃতি এদেশের জীবনবোধের সঙ্গে এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ওদের সংস্কৃতি একজাতিতত্ত্বের আলোকে মৌলবর্ণবাদী হিন্দুদের দ্বারা সম্পৃক্ত— যা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। তা গ্রহণ করে আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে পারি না। যা পাকিস্তানীরা ভাষা আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়ে করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়টি আরও মারাত্মক— তা হল তার মাধ্যমে এক জাতিতত্ত্বের থিওরী আমাদের মাঝে ঢুকিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে সিকিম করে ফেলা। আর সেটাই তাদের মনোগত অভিপ্রায়। সেজন্য ওদের সঙ্গে এসবে না যাওয়াই ভাল বলে আমি মনে করি। সেজন্য মানবজমিন, ৯ জুলাই ১৯৯৯-এর সংবাদসূত্র ধরে বলতে চাই, "ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যেমন সৃষ্টি করে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, তেমনি সৃষ্টি করতে পারে বিরাগও। ঘনিষ্ঠতা থেকে ঘৃণারও জন্ম হয়। যদি তা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক না হয়ে থাকে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক হওয়ার সম্ভাবনা যে কম, তা জেনেই একথাগুলো বলতে হচ্ছে।

আঞ্চলিক সহযোগিতা পররাষ্ট্রনীতির এক সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা, তবে এসব সহযোগিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো নিজেদের আধিপত্য বিস্তার ও ক্ষমতাকে অন্যের উপর অর্পণ করে অন্যদেশকে হয় গিলতে, না হয় প্রভাবিত করতে চায়। সেজন্য এ সমস্ত সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানকে তারা গ্রহণ না বর্জন করবে, না কৌশলগতভাবে এড়িয়ে চলবে তা তাদের বৈদেশিক স্বার্থ ও নীতির মাঝেই বিশ্লেষণ বিবেচনা গ্রহণ ও বর্জন করে থাকে। ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো কিন্তু সব জেনেও এসব সহযোগিতায় অংশ নেয়, কখনও বা এরকম সংস্থার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের চেষ্টা ও তার সার্থকরূপায়ণে নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায়। এরূপ একটি সংস্থা "দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থা" (The South Asian Association for Regional Co-operation -SAARC) মূলত অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা হলেও রাজনৈতিক চেতনা এর মাঝে বিদ্যমান, আমি এ নিয়ে এ গ্রন্থের পূর্বেও আলোচনা করেছি। এখানে শুধু আমি একথা বলতে চাই, রাষ্ট্রপতি জিয়া দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ যথা— বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, মালদ্বীপ, নেপাল ও ভুটান নিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে কয়েকটি দেশে অনুষ্ঠান ও গণসচেতনতার মাঝে তা এগিয়ে যেতে থাকে। সকল দেশের জনগণ আনন্দের মধ্য দিয়ে একে গ্রহণও করে। এটি শক্তিশালী রূপ নিলে এর মাঝে কোন বৃহৎ শক্তি তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে না। এটা জানতে পেরেই ভারত এ সংস্থাকে পঙ্গু করে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও উৎসাহ না দেখিয়ে বিকল্প সংস্থা দক্ষিণ এশিয়া চতুর্ভুজ সংস্থা

www.nagorikpathagar.org

করার আগ্রহ প্রকাশ ও সে নিয়ে কাজ আরম্ভ করে। এর সদস্য ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান। বুঝতেই পারা যাচ্ছে, নেপাল ও ভুটান ভারতের অনুগত দেশ এবং বাংলাদেশকে অনুগত করার এ প্রচেষ্টা। সে কারণে ভারতের এ পদক্ষেপ। সার্কে পাকিস্তান থাকাতে ক্ষমতার যে ভারসাম্য রক্ষা হবে তা ভারত চায় না বলেই এ নতুন পরিকল্পনা। এদেশের জনগণকে নিয়ে বেগম খালেদা জিয়া তাঁর দল বি. এন. পি.-কে নিয়ে এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করার কারণে তা এখনও রূপলাভে সক্ষম হয়নি। তবে এ সংস্থায় বাংলাদেশ সংযুক্ত হলে বাংলাদেশের আর পৃথক অস্তিত্ব থাকবে বলে আমি মনে করি না। অতএব তা থেকে আমাদের সকলকে দূরে থাকতে হবে। সে কারণে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের বাজারে পাঠিয়ে দেয়া উন্নয়ন চতুর্ভূজ "দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ" বা "দক্ষিণ এশিয়া প্রবৃদ্ধি চতুর্ভুজ" (South Asian Growth Quadrangle)-কে অবশ্যই আমাদের পরিহার করা একান্ত কর্তব্য।

তবে হাসিনার কলকাতার বইমেলার প্রতি দুর্বলতা বিভিন্ন চুক্তি ও অন্যান্য নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে আমরা ভীত, যদি এ চুতর্ভুজের একভুজ হয়ে যাই আমরা শেখ হাসিনার মাধ্যমে, তখন আর কোন ভুজই থাকবে না। ভারত একভুজ হয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে বিশ্বের বৃহৎশক্তি হয়ে দাঁড়াবে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ ও বাংলাদেশের জনগণ মুসলমানসহ দহনে পরিণত হব। অতএব সাবধান। এ সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন খালেদা জিয়া স্বয়ং।

ইতিপূর্বে দ্বিপক্ষ সম্পর্ক বা ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে যে আলোচনা করা হল তা পররাষ্ট্রনীতিরই অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি থাকলেও আওয়ামী লীগ সরকারের ভারতপ্রীতির কারণে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি অনেকাংশে নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলেছে। সে কারণে চীন-ভারতের মধ্যে বিরোধ বাধলে আ: লীগ সরকার নিরপেক্ষ থাকতে পারবে বলে মনে করার কারণ নেই, তা না হলে চাকমারা ভারতের ট্রেনিং নিলে আমাদের বলার কিছু থাকে না কেন।

উলফা এখানে ট্রেনিং না নিলেও ভারতের প্রতিবাদের মুখে আমরা বা হাসিনা সরকার দৃঢ়তা দেখাতে পারেন না। আমাদের দেশের অভ্যন্তরে ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী রাজশাহী জেলার মসজিদে প্রবেশ করার সাহস পায় আরও কত কি। ভারতের বিগ ব্রাদার সুলভ আচরণের কারণে ভয় থাকলেও ভারতের প্রতি আমাদের ভালবাসা উক্ত আচরণের ফলে কমার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। এজন্য রাষ্ট্রের প্রতি রাষ্ট্রের যে সম্পর্ক, ভারতের কারণে ও হাসিনা বড়দা বলতে যেন অজ্ঞান, এ কারণে তা বজায় রাখা যায় না, হয়ত যাবে না।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নাম বাংলা হয়ে যাবে। এ সংশোধনী বিলটি ভারতের লোকসভাও পাস করবে বলে ধারণা করা যায়। পাস হলেই জয় বাংলা ও বাংলার মধ্যে ধ্বনিগত বিশেষ কোন পার্থক্য থাকবে না। এটি তারা কেন করছে তা আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

আমরা জানি, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলি ২০-শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সালে তাঁর পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন, তাঁরা ১৯৪৮ সালের ৩-রা জুনের মধ্যে ভারতের হাতে ক্ষমতা দিয়ে চলে আসবেন। কেন্দ্রীয় সরকার না থাকলে প্রাদেশিক সরকারের হাতে

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতা দেয়া হবে। ভারতের শেষ বড়লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে এসে ৩-রা জুনের ঘোষণা অনুযায়ী পাঞ্জাব ও বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব দেন। তখন বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে ৮০ জন হিন্দু সদস্য; ৫৮ জন সদস্য বঙ্গভঙ্গের পক্ষে এবং ২১ জন অবিভক্ত বাংলা রাখার পক্ষে ভোট দেন। মুসলমান সদস্য নূরুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় তাদের মধ্যে ১০৬ জন বাংলাকে অবিভক্ত রাখার পক্ষে এবং মাত্র ৩৫ জন বঙ্গ ভঙ্গের পক্ষে ভোট দেন। ফলে হিন্দু সদস্যদের বিরোধিতার কারণে বঙ্গ বিভক্ত হয় ও পশ্চিমবঙ্গ নাম ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুও অবিভক্ত বঙ্গের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এখন আবার তাঁরই মন্ত্রিসভা অবিভক্ত বাংলার আদলে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলা নামে ডাকতে চাচ্ছে। ব্যাপার কি? কি উদ্দেশ্য, তা আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

হিন্দুগণ ভারতে একজাতিতত্ত্ব ও অবিভক্ত ভারতের কথা বললেও. বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে (১৯৪৭) ছিলেন সোচ্চার। তাঁরাই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন। এসবই হিন্দুদের স্বার্থে তা সহজেই বোঝা যায়। আমরা Seperate Homeland for the Hindu, Gaya Chatterjee, Bengal devided; ইত্যাদি গ্রন্থে বাংলাদেশকে যাঁরা একত্রে রাখতে চেয়েছিলেন শরৎবসু ও তাঁর দল। তাঁদের কুত্তা-কুত্তিসহ সবরকম কুৎসিত ভাষায় গালাগালি এবং সাম্প্রদায়িক দল হিন্দু মহাসভায় নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী যে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন সে কারণে তাঁকে মাথায় নিয়ে নাচেন সবে। এতো হিন্দু চরিত্র। তৎকালীন আমলে কলকাতার পত্র-পত্রিকায় বলা হয়, "বঙ্গদেশ বিভাগ আন্দোলন যেন থেমে না যায়।" এ হচ্ছে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে তারা সব কিছু করতে পারে। নিজেদের স্বার্থের জন্যই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন আবার ১৯৪৭ সালে বঙ্গ- ভঙ্গের পক্ষে সংগ্রাম। যদি বাংলার হিন্দু-মুসলমান মিলে অবিভক্ত বাংলার আন্দোলন করত, তাহলে ১৯৪৭ সালেই বৃহৎ বাংলাদেশের জন্ম হতো। স্বাধীন ও সার্বভৌম বৃহৎ বাংলাদেশ এশিয়ার বৃহৎশক্তি হিসেবে অবস্থান করত। এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভারতে অঙ্গরাজ্য হিসেবে হারাবার ভয় নাই, কিন্তু '৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের অর্জন বাংলাদেশকে অতন্দ্রপ্রহরীর মত আগলে রাখতে হয় আমাদের— যেন অন্যের কবলে পড়ে সিকিম না হয়ে যাই, সেজন্য সবসময় হারাবার ভয়ে সজাগ থাকতে হয়। খালেদা বি. এন. পি. ও দেশের জনগণ সবসময় অতন্দ্রপ্রহরীর মত দেশটাকে আগলে আছেন। হাসিনাকে মুখ্যমন্ত্রী বললে সেজন্য বেদনায় আমাদের বুক ফেটে যায় কিন্তু হাসিনা কোন্ স্বার্থে মুখ টিপে হাসেন, তা আমরা বুঝতেও চাই না।

১—৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ যে এশীয় শান্তি সম্মেলন হয়ে গেল তাতে বিরোধী দলীয় সাংসদ যোগ না দেয়ার কারণে ডেভিড লকউড যে বি. এন. পি.-র বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, বি. এন. পি.-র নেতা ও অর্থমন্ত্রী (প্রা) সাইফুর রহমান তার সঠিক জবাব দিয়েছেন এবং না যাবার কারণও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তারপরও মি: লকউড এদেশের রাজনীতি নিয়ে কেন কথা বলেন তা সকলের জানা। হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তুলে ধরে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট "কান্ট্রি রিপোর্ট" থেকে। তারপরও মি: লকউড কেন চুপ করে আছেন— তা সকলেই জানে।

www.nagorikpathagar.org

আরও মজার ব্যাপার এশীয় পার্লমেন্টারিয়ানদের এ সম্মেলনে যোগ দেয়ার কারণে যে অগ্রগতি হয়, ভারত-জাপানের যোগ না দেয়ার কারণে তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আর বাংলাদেশ সরকারের কয়েক বছরের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এ সম্মেলন, তবু হাসিনা তাঁর ব্যর্থতা ঢাকতে পারেননি। মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যর্থতার গ্লানিও বইতে হচ্ছে শেখ হাসিনাকে। আর এসবের জবাবও দিতে হবে তাঁকে। আমার মনে হয়, বাংলাদেশে শান্তি সম্মেলনের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন শেখ হাসিনা, এটি আদতে ফলহীন একটি অপচয় ব্যবস্থা। কারণ যদি কোথাও আগুন জ্বলে তা নেভানোর ক্ষমতা হাসিনার নেই। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরও আছে বলে মনে হয় না। লকউডও তা জানতেন। অনেকটা আয়েসে সময় কাটাবার জন্য তাঁদের এখানে আসা। হাসিনা সরকারও সব কাজ ফেলে এখানে অনর্থক সময় ও অর্থ ব্যয় করেছেন। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে, অন্য সকলকে বোঝাতে যে বি. এন. পি.-সহ বিরোধী দল এটি চায় না। যেখানে বি. এন. পি.-কে বাদ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিগুলো হচ্ছে, সংসদকে অবহেলা করছে, সেখানে খালেদা কেমন করে যাবে এটা সকলেই জানেন। সেজন্য একটি ফলহীন সম্মেলনে বেগম খালেদা যোগ না দিয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো নিয়ে জনমত সৃষ্টি ও পরদেশীর আগ্রাসী থাবা থেকে সাবধান থাকতে জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এটি সবচেয়ে বড় কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। তবে বিফল সম্মেলনের হিসেব একদিন জাতির নিকট তার দিতেই হবে— জাতির ঋণ না শোধ করে তিনি বা তাঁর দল বাচবে না।

যে হাসিনা এক পা ভারতে রেখেই আছেন ও মুখ্যমন্ত্রী বলায় মুখ টিপে হাসেন, তিনি যখন নিউইয়র্কের হোটেল গ্রান্ড হায়াতের একটি জলসায় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভায় বলেন (১৯৯৯ সালের শেষের দিকে) "আপনারা অসাম্প্রদায়িক হলে আপনাদের মধ্যে মুসলমান নেই কেন? সংখ্যালঘু বলে চীৎকার দিলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন আপনারা। নিজেদের বাংলাদেশের মানুষ মনে করেন না কেন? এক পা রাখেন ভারতে আর এক পা রাখেন বাংলাদেশে।" এসব কথা শুনে মনে হয় তিনি সব ধর্ম তুলে দিয়ে বা সকলে মিলে ধর্মকে বাদ দিয়ে রাজনীতি করবেন। তাদের ভিন্নভাবে নিজেদের ধর্মকৃষ্টি নিয়ে রাজনীতি করার অধিকার নেই, জাতীয় সংসদের সদস্যপদ লাভের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার নেই— এমনি এক ভাব-চেতনা। তারা এসব না করে চোখ বন্ধ করে তাদের সমর্থন করুক এমনি ভাব আর কি। যেখানে জামাত বা কয়েকটি ইসলামী দল আছে, সেখানে তাদের (হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান) থাকাতে অপরাধ কোথায় তা বুঝি না— অবশ্য তারাও বড় আশা করে বড়দাদের ভক্ত বলে তাঁকে যা বলতে গিয়েছিলো হোঁচট খেয়ে তারা আহত হয়েছে, কিন্তু ফিরে এলে তাদের সম্মান থাকতো।

মানবজমিন পত্রিকায় ১৫-ই মার্চ ১৯৯৯ সালে 'সাবধান বাণী না হুমকি'- শিরোনামীয় একটি প্রবন্ধে পররাষ্ট্রগুলোর বাংলাদেশ সম্পর্কে যে বক্তব্য এ মাসেই লিখিত আকারে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ও বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে প্রদান করেন। এ সময় বাংলাদেশে নির্যাতন, হত্যা ও সন্ত্রাসের জ্বালায় জনজীবন অসহনীয়, সে সময় এল এ আহ্বান বা সতর্কবাণী। ৯ মার্চ এ বিবৃতি বাংলাদেশের উক্ত ব্যক্তিদের দেয়া হয়। বিবৃতি তৈরি করেন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মান, যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ড, জাপান, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড,

www.nagorikpathagar.org

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউরোপীয় কমিশন এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে। এতে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংঘাত ও মেরুকরণে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীরা গভীর উদ্বেগ এবং অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। কেননা, এতে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ এবং উন্নয়ন সম্ভাবনা বিপন্ন হয়ে উঠেছে। রফতানি হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির গতি মন্থর হচ্ছে। জনগণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। দেশে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে এবং আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী বিনিয়োগকারী উৎসাহ হারাচ্ছেন। বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, এসব কারণে দারিদ্র্য হ্রাসের সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে। তাই দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সুপারিশ হল নিরপেক্ষতা ও সহিষ্ণুতার উপর সুশাসন নির্ভরশীল। জাতীয় সংসদের মতো জাতীয় সংস্থার মাধ্যমে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সরকারকে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সংবাদ মাধ্যম ও ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমের অবাধ ব্যবহার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। তাই এ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নয়ন সহযোগীদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা ও হুমকির জন্য এ দেশের যে ক্ষতি হয়েছে তাতে তারা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।"

আন্তর্জাতিক অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রগুলো যে বিবৃতি প্রদান করেছে তাতে কয়েকটি দিক সুস্পষ্ট—

১। রাজনৈতিক সংঘাত সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

২। ক্ষমতাকে মেরুকরণ বা দলীয়করণ করা হয়েছে।

৩। রাজনৈতিক সংঘাত ও দলীয়করণ ও এককেন্দ্রীকরণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়ন সম্ভাবনা আজ বিপন্ন বা হুমকির দ্বারপ্রান্তে।

৪। জনগণের জীবনযাপন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে।

৫। গ-অনুচ্ছেদের যে অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়ন সম্ভাবনা শুধু বিপন্ন নয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিও মন্থর বা ধীর হয়ে পড়েছে।

৬। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে।

৭। গরীবরা অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারছে না বরং তাদের অবনতি ঘটছে।

৮। এসব কারণে দাতা দেশ, সংস্থা ও দেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগে তাদের উৎসাহ হারাচ্ছে। ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এ সবই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনের ত্রুটির জন্য এসব ঘটনা ঘটছে।

৯। সংবাদ মাধ্যম ও ইলেকট্রনিক সংবাদ বা রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে সংবাদ নিরপেক্ষ না হয়ে দলীয়করণ করা হয়েছে। সেজন্য তাঁরা হাসিনাকে কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন।

(ক) হাসিনাকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে বলেছেন।

(খ) তাঁকে নিরপেক্ষতা জাতীয় সংবাদসহ সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।

(গ) যারা রাজনীতি করে বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত বা রাজনৈতিক দল বি. এন. পি., আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ইত্যাদি সকল দলের সংবাদ রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) বিদেশী রাষ্ট্র ও সংস্থা সমাজ উন্নয়নে ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে যা করবে এসবের কারণে তারা উদ্বিগ্ন। এতো দেশের হালচাল। এরপরও কোন সরকারের

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতায় থাকা উচিত? উচিত নয় এবং নির্যাতন, হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, এসিড নিক্ষেপসহ যে সব কাণ্ড এ সরকারের আমলে ঘটছে— তাতে জনগণকে তা প্রতিহত করতে হবে, তা না হলে রক্তের গড়া এদেশ পরদেশের মুখে চলে যাবে। এজন্যই কি এসব করছে তারা— তাই বা কে বলবে।

এটি প্রচারের পূর্বে ১৫টি রাষ্ট্রের পক্ষে জার্মানীও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ এবং রাজনৈতিক সহিংসতা ও অসহিষ্ণুতা দূর করতে বলে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। ২৭-ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত কান্ট্রি রিপোর্টে বলা হয় বাংলাদেশের "রাজনীতি ব্যাপকভাবে সন্ত্রাস কবলিত। রাজনৈতিক প্রচারণা এবং নির্বাচন সবই সন্ত্রাসের ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত। নির্বাচন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি কবলিত।" যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব কার্ল ইন্ডার ফার্থও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির কথা হাসিনা সরকারকে বলেছেন।

কিন্তু এসবের সমাধান না করে বিদেশীদের বি. এন. পি.-ও সে দলের চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কথা বলে তাঁদের ব্যর্থতা বিরোধীদের ঘাড়ে চাপাতে গিয়েও পারেন নি হাসিনা ও তাঁর দল। তাঁদের উক্ত বিবরণ ও বক্তব্য থেকে তা স্পষ্ট। সেজন্য তাকেই এ অক্ষমতার দায়ভার বহন করতে হবে এবং জনগণের নিকট জবাব দিতে হবে হাসিনাকে। কিন্তু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মিথ্যার বেসাতি খুলে পানি আরো ঘোলা করে চলেছেন মাছ শিকারের আশায়। তাই সকলকে বলি দেশের জন্য এসব কাম্য নয়। অবশ্য দেশপ্রেম থাকলে তো এসব ভাবা যায়— না থাকলে কাম্য-অকাম্য নিয়ে কথা উঠলে উত্তেজনা বাড়ে বই কি! তারা পররাষ্ট্রনীতিকে এক পেশে করে তার নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলছে, অর্থনীতিকে বিপথে পরিচালিত করছে, আর্থিক সহযোগিতা আজ হুমকির সামনে, আর্থিক অগ্রযাত্রা আজ ব্যাহত। এসব আমাদেরই ভাবতে হবে এবং খালেদার ভাবনাকে সহযোগিতা করা দরকার আমার আপনার সকলের।

এখানে একটি কথা বলা দরকার, বর্তমান সরকারের (হাসিনা সরকার) ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া বা রেডিও, টেলিভিশন ও নিজস্ব বা সরকার পরিচালিত সংবাদকে দলীয়করণ করার ফলে তারা তাদের নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলেছে। সেজন্য নিরপেক্ষ সংবাদ-পত্র এবং ইতিহাসের আলোকে লিখিত সংবাদ এবং এদেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, (স্বাধীনতাকে নিয়ে যারা বিকৃতি ঘটাচ্ছে তারা বাদে) যেসব সংবাদ, প্রবন্ধ, গ্রন্থ প্রকাশ পাচ্ছে তা পড়ুন ও জানুন— তাহলেই প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারবেন। হরতাল ও হরতালের নিরপেক্ষভাবে তোলা ছবি বন্ধের জন্য সরকার ও পুলিশি তৎপরতাও ন্যক্কারজনক— তা বলা যায়।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তি ও যুক্তিগ্রাহ্য মতামত পেশ করেও জোটনিরপেক্ষতার প্রয়োজন এজন্য আছে যে এতে অন্তত ছোট ছোট দেশ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। জোটের যাঁতাকলে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে না। বাংলাদেশের জন্যও তাই এর প্রয়োজন আছে। এ সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৯৮ সালের ৬-ই সেপ্টেম্বর বলে, "জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের আবেদন এতটুকু হ্রাস পায়নি, বরং বেড়েছে। বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর দেশগুলোর জন্য রাজনৈতিক শর্তহীন সহায়তা লাভ, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান অর্জন,

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বব্যাপী না হলেও অন্ততঃপক্ষে আঞ্চলিক পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সংরক্ষণ (সার্কের মত), জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মাধ্যমে সহজতর হয়। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের একটি চিঠি ও ফোরাম। আর্থিক দৈন্যকে ছাপিয়ে, রাজনৈতিক প্রভাবকে উপেক্ষা করে প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজের মতো করে নিজের ইচ্ছা প্রকাশের মাধ্যমে স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবান অবস্থানের প্রতীকও এ আন্দোলন।"

এককালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমানে লোকসভায় (ভারতের জাতীয় পরিষদ) পররাষ্ট্রবিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল বা মি. গুজারাল ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে কয়েকজন পররাষ্ট্রবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও গবেষক যারা ভারতের অত্যন্ত উঁচু পদে আসীন, তাঁদের নিয়ে এদেশের সরকারের সঙ্গে পররাষ্ট্রবিষয়ক নীতি নিয়ে আলোচনার জন্য আসেন। ঝানু পণ্ডিত গুজরাল সরকারের সঙ্গে পররাষ্ট্র বিষয় নিয়ে ও পরস্পরের স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করেন। তারপরও তিনি আমাদের যে চোখে দেখেছেন তা বাংলাদেশের জনগণ গ্রহণ করতে পারে নি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেছেন তাতে অনেকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করছে— যা তাঁর নিকট থেকে আমরা আশা করিনি। এখানে 'ভারতীয় নেতাদের চোখে বাংলাদেশ' শিরোনামের একটি সংবাদপত্রের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল। গুজরাল বলেন, "১৯৯৬ সালে ভারতে ও বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, 'এক শুভ নক্ষত্রের প্রভাবে' (Under an auspicius star)। ঐ নির্বাচনে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন হয় আওয়ামী লীগ এবং ভারতে যুক্তফ্রন্টের আদলে এক মিত্র গোষ্ঠী। যুক্তফ্রন্ট বছর দুয়েকের মত ভারতে ক্ষমতাসীন ছিল। এ দু'বছর সম্পর্কে তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সুসম্পর্ক এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়, যা আমাদের উপমহাদেশে অত্যন্ত উঁচুমানের সাফল্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে ইতিহাসে লেখা থাকবে। আই কে গুজরাল এখানেই থেমে থাকেন নি, তিনি বলেছেন, 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে অতীতের গৌরবময় অবস্থানে ফিরিয়ে নিতে হবে'। ১৯৯৬ সালের পূর্বে, তার কথায়, 'ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্বের জাহাজ সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অগভীর চড়ায় আটকে পড়েছিল, তার অবসান ঘটেছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর আবারো শুভ দিনের সূচনা হয়েছে।"

গুজরাল আওয়ামী লীগের ভক্ত বা আওয়ামী লীগ গুজরাল বা ভারতের যতই ভক্ত থাক, বাংলাদেশকে তাদের তাবেদার বানানোর এতবড় নির্লজ্জ অভিব্যক্তি আর হয় না। এটি স্টেট টু স্টেট এর কথা নয়, এটি স্টেট টু পার্টির কথা। ভিতরে যতই প্রীতি থাক বাইরে তার নির্লজ্জ প্রকাশ অত বড় রাজনীতিবিদ কেমন করে করতে পারলেন এবং তাঁর বক্তব্যে শেখ মুজিবের বাকশালরূপ একদলীয় শাসনকে সমর্থন করলেন— তা আমরা ভেবে পাই না। জনসমর্থনও আওয়ামী লীগে আছে, তাও নয়। তবু তাঁর বিদেশে রাজনীতির নিরপেক্ষতা বজায় রেখেই কথা বলা উচিত ছিল। তিনি কি এ উদ্দেশ্যেই শেখ হাসিনাকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন। এটিও এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। সেজন্যই বাংলাদেশ ভারতকে প্রীতির চোখে দেখে না, ভীতির চোখে দেখে থাকে। ভারত বাংলাদেশকে যদি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে দেখত, তাহলে এমন মন্তব্য করতে পারত না। দেশের অবস্থা নিয়েই তিনি কথা বলতেন। তারা চায় বাংলাদেশ ভারতকে কত বেশি ভক্তি করে, বড়দা বলে স্বীকার করে এবং ভারতনির্ভর দল ক্ষমতায়

www.nagorikpathagar.org

আছে কিনা সেই নিরিখে— যা একটি স্বাধীন দেশের জন্য মোটেও শোভন নয়। সেজন্যই বি. এন. পি. ও তার চেয়ারপার্সন স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী খালেদা জিয়া এ সব কারণে ভারতকে সুনজরে দেখেননি বলেই গুজরাল সাহেবের এমন খেদোক্তি। জিয়ার দৃঢ় আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ সে কারণে তারা সহ্য করতে পারেননি। তারা বাংলাদেশের প্রতি এ যাবৎকাল যে অবিচার করে চলেছে তার সমর্থন আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্য কেউ দেবে না বলে তারা ভারতের নিকট এত প্রিয়। সেজন্য দক্ষিণ এশীয় চতুর্ভুজের পথ ধরে বাংলাকে সিকিম করার এক হীন ষড়যন্ত্রের পথে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত, আওয়ামী লীগ তাদের সহযোগিতা করবে— এটা তারা বিশ্বাস করে। সে কারণে, "গুজরাল সাহেবের এমন উচ্ছ্বসিত বাণীর মূলে রয়েছে ভারতের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সকল দরজা উন্মুক্ত করার উদার মনোভাব।" তবে তারা বোঝে না তারা দেশটাকে গিলতে চাক বা সিকিম করতে চাক— আমাদের স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী প্রায় ১২ কোটি— এরা খালেদার নেতৃত্বে দেশটাকে রক্ষা করেই চলবে। তাই বলি— ভারতের অত বেশি উচ্চাশা ভাল নয়। ভাল নয় একজাতিসত্তায় উদ্বেলিত বুদ্ধিজীবীদের উচ্ছ্বাস।

ভারতে নাকি আমাদের এক কোটি লোক গিয়ে বাস করছে— তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে ২০ লাখ। এত বড় নির্লজ্জ মিথ্যাকে পররাষ্ট্র সচিব জোর দিয়ে বললেও প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আ: সামাদ আজাদ জোর দিয়ে বলতে পারেন নি। অস্বীকার করলেও গলার স্বর ছিল নরম, নতমুখী— এক্ষেত্রে তা হওয়া মোটেও উচিত নয়। এ নিয়ে কোন আলোচনায়ও বসা যেতে পারে না। সেকথাটি স্পষ্ট করে না বলার কারণে পুশ ইন করানোর চেষ্টায় তারা রত। এটি আমাদের কূটনৈতিক ব্যর্থতা— হাসিনা তা বুঝেও বুঝতে চাচ্ছেন না। দানবের মত ক্ষমতা নিয়ে এবং দৈত্যের মত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সব কিছু গ্রাস করার মতলবে উন্মুখ হয়ে আছে। তাই হাঙ্গরের গহ্বর হতে কূট-কৌশলে আমাদের রক্ষা পেতে হবে।

ভারতের প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু হাসিনার পিতা শেখ মুজিবের বন্ধু। তিনি বন্ধুকন্যা হাসিনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন কলকাতার বইমেলায়। ভাল কথা—বন্ধুকন্যাকে তিনি নিমন্ত্রণ করতে পারেন। হাসিনাও যেতে পারেন। তবে বন্ধুকন্যা হলেও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাজকীয় নিয়মে নিমন্ত্রণ করতে পারেন না। করলেও হাসিনা প্রধানমন্ত্রী যতদিন আছেন, ততদিন যেতে পারেন না একজন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে। এতে সার্বভৌম বাংলাদেশের মর্যাদা ধুলার সঙ্গে মিশে যায়। রাজকীয় মর্যাদা বা ডেকোরাম বলে একটা বিধান আছে— জ্যোতি বসু সে মর্যাদা দেননি, হাসিনাও দেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন। ক্ষুণ্ন হতো না হাসিনা যদি একা যেতেন, থাকতেন, বইমেলা দেখতেন, ঘুরে বেড়াতেন, কিন্তু হাসিনা তা করেন নি। ৮১ জনের একটি রাজকীয় দল— তার মধ্যে মন্ত্রীও আছেন, তাদের নিয়ে রাজকীয় সফরে গেছেন ও রাজকোষের অর্থ ব্যয় করেছেন— এখানেই আমাদের আপত্তি। সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যাবেন সার্বভৌম ভারতের ডাকে, তার একটি প্রদেশের ডাকে নয়। গেলে ব্যক্তিগতভাবে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়। অথচ তাই হয়েছে। এসব কিসের আলামত।

আর সেকারণেই হাসিনাকে তারা মুখ্যমন্ত্রী বলতে দ্বিধা করেন নি। তিনিও হাসি মুখে তা মেনে নিয়েছেন। এসব কারণে একে কেউ যদি একটি ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করে,

www.nagorikpathagar.org

তাকে কি দোষ দেয়া যায়? মনে হয়, প্রদেশমন্ত্রীর আহ্বান, প্রদেশমন্ত্রী বলে ডাকা, সব কিছুর মধ্যেই কূট-কৌশল থাকতে পারে, বিশেষ করে এদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য এখনও তারা করতে চায়, এমন অভিপ্রায় যখন সুকৌশলে ব্যক্ত করে, তখন সব কিছুর মধ্যেই যেন একটি ষড়যন্ত্র কাজ করছে বলে আমরা মনে করতে পারি। এ ষড়যন্ত্র একপক্ষের অথবা দুই পক্ষেরও হতে পারে। কয়েকজন মন্ত্রীসহ একটি প্রদেশ সরকারের আমন্ত্রণ আত্মমর্যাদা হানিকর, হাসিনা তা বোঝেন না। যিনি বোঝেন না, তাঁকে কি করে উক্ত পদে রাখা যায়। এটিও ভাবার কথা। "আত্মমর্যাদাবোধ এক আকাশছোঁয়া স্পর্ধা। এটি যার আয়ত্তে থাকে তার পদতলে পর্বতও মাথা নোয়ায়। জাতীয় পর্যায়ে এ সম্মানবোধ আরও প্রচণ্ড।" আমরা দেখেছি এদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তোয়াজ করতে গেছেন প্রাদেশিকমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে। জ্যোতি বসু ঢাকায় এলে প্রধানমন্ত্রীসহ সব মন্ত্রী তাঁকে নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করলেন, সার্বভৌম বাংলাদেশের এসব সকলের খারাপ লাগে। বইমেলা সম্পর্কেও প্রধানমন্ত্রী হাসিনা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেও আমাদের খারাপ লাগে। খারাপ লাগে সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলে। হাসিনা বলেন, কোলকাতায় আমাকে যখন মুখ্যমন্ত্রী বলা হচ্ছিল আমার তখন হাসি পাচ্ছিল। তারা ভুল করে এটা করেছে। কিন্তু একে আমরা অত সহজভাবে মেনে নিতে পারি না। পরে সংশোধনও করেছে।

ভারতের আগ্রাসী চেতনা প্রাদেশিক মন্ত্রীর আমন্ত্রণ, সেখানে রাজকীয় মর্যাদায় গমন, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির প্রতি দুর্বলতা, তাদের পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থে এদেশকে সিকিম করার পরিকল্পনা, আগ্রাসী মানসিকতা, গুজরাল সাহেবের উক্তি, করিডোর, ট্রানজিট, পার্বত্য চুক্তি ইত্যাদি সবকিছু মিলে যখন বিশ্লেষণ করা হয় তখন একে ভুল বলা যায় না। ওদের রাজনৈতিক একটি কৌশল হিসেবেই ধরা যায়। আর তাদের সে কৌশলকে হাসিনা হেসে উড়িয়ে দিলেও আমরা তা উড়িয়ে দিতে পারি না। পররাষ্ট্রনীতিতে আমরা নতজানু মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছি—আমাদের সরকারের কারণে। হাসিনা ভারতকে যে ছাড় দিচ্ছে তা দেশের সার্বভৌমত্বকে যে কোন সময় ভারত আঘাত করতে পারে এবং দেশের স্বাধীনতা এক ঝুঁকির সম্মুখীন হবে এতে। সে কারণে আমাদের দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শ সৈনিক জিয়ার উত্তরসূরি স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতকে শক্তিশালী করা আমাদের একান্ত কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নতজানুনীতির মানসিকতাসম্পন্ন চেতনাকে পরিহার করে সম মর্যাদার ভিত্তিতে যে কোন পররাষ্ট্রের সঙ্গে অবস্থান করলে— তারা কোন দিনই সার্বভৌমত্ব ধ্বংসের জন্য এগিয়ে আসতে সাহস পাবে না। আর এ শক্ত মানসিকতার অধিকারী বেগম জিয়া—তা আমরা জানি। অতএব তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিলে দেশের কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

১৯৯৬ হতে ২০০০ সাল সামাজিক অবক্ষয়, সন্ত্রাস, লুট, হাইজ্যাক, এসিড নিক্ষেপ, হত্যা, ডাকাতি, শিশু ধর্ষণ, নারী ধর্ষণ অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ফলে তা জাতীয় জীবনকে করেছে অস্থির, ক্ষতবিক্ষত। আহত করেছে মানুষের বিবেককে; মানবতা হয়েছে পদদলিত। এ সন্ত্রাস আওয়ামী শাসনের অযোগ্যতাই শুধু প্রমাণ করে না; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের দলীয়করণ প্রণালী, বিরোধী দল দমননীতি, আধিপত্য বিস্তারের জন্য শক্তি প্রয়োগ এবং পরোক্ষ অভিপ্রায় এক দলীয় বা বাকশাল গঠনের পরিবেশ সৃষ্টি। আর এসব করতে গিয়ে পুলিশী নির্যাতন, দলীয় নির্যাতন, প্রশাসনিক নির্যাতন— সব রকম

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে হাসিনা সরকার। আর এ সন্ত্রাস দমনের প্রয়োজনে জননিরাপত্তা আইন প্রবর্তন করা হয়েছে বিরোধী দল বি. এন. পি-কে ও অন্যান্য দলকে দমন, নির্যাতন ও মামলা-মোকদ্দমা ও হাজত বাসের মাধ্যমে তাদের নাজেহাল করার প্রয়োজনে। পুলিশও এ-নির্যাতন থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। নারীর সম্ভ্রম বিনষ্ট করার জন্য পথে-প্রান্তরে গা থেকে বস্ত্র খুলে নেয়া হচ্ছে। শত ধর্ষণের জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ হত্যা ও নির্যাতনের জন্য এমপির বাড়িতে বোমা তৈরি করা হয়— আরো কত কি। হরতালের সময় প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্তমান এমপিদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় অন্যায়ভাবে। হামলা করা হয় নির্মমভাবে।

মামলায় সরকার পক্ষ পরাজিত হয়ে লাখ টাকা সম্মান হানির জন্য প্রদান করতে বলা হলেও তাদের মাঝে বিবেক জাগে না। উল্টে প্রধানমন্ত্রীসহ অনেক আওয়ামী লীগ মন্ত্রী, এমপি, কর্মী উচ্চ আদালতের বিচারকদের সমালোচনা করেন যেমন শেখ মুজিবের বাকশাল সৃষ্টির সময় বিচারকদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছিল, অনুরূপভাবে। দমনের জন্য মুজিবের রক্ষীবাহিনী না থাকলেও নিজস্ব বাহিনীর অত্যাচারে এখন জনজীবন অতিষ্ঠ। পত্র-পত্রিকা হতে হাজারো উদাহরণ ও লক্ষ লক্ষ ঘটনার উল্লেখ করা যায়। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী যে কোন ঘটনা ঘটলে তদন্ত ও বিচারের আগেই বি. এন. পি.-র ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের অপরাধকে আড়াল করার কৌশল অবলম্বন করেন। সেজন্য "এ অবিশ্বাসের ছিদ্রপথেই পুলিশ বাহিনীর কিছুসংখ্যক সদস্যের মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড বিক্ষোভ এবং ক্ষমতাসীনদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা। সরকারের ব্যর্থতা ব্যাপক এবং গভীরও। মানব উন্নয়নে সূচকের নিরিখে বাংলাদেশের অবস্থান নেমে গেছে কয়েক ধাপ। ১৯৯৭ সালের ১৪৬ তম অবস্থান থেকে দু'বছরে ১৫০তম স্থানে। এ অবস্থা পরীক্ষায় ফেল করে একই ক্লাশে দু'বছর থাকার মতোও নয়, আরো এক ক্লাশ নিচে নেমে যাওয়ার মত। দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি রাষ্ট্রের (সার্কভুক্ত ৭টি দেশ) মধ্যে সপ্তম হওয়ার এবং গভীর দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল, নেপাল ও ভুটানেরও নিচে নেমে যাওয়া, অর্থনীতির হিসেবে জাতীয় আয় (১৯৯৯) শতকরা ৫.২-এর পরেও। আইন-শৃঙ্খলায় সীমাহীন দুর্নীতি সম্পর্কে যতো কম বলা যায় ততোই ভালো। কোন নাগরিক ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে আজ আর নিশ্চিন্ত নয়। সন্ত্রাস রাজত্ব করছে প্রচণ্ড প্রতাপে সমাজ জীবনের সর্বত্র। দলীয়করণ এবং সরকারপ্রধানের পারিবারিকীকরণের মাত্রা সর্বোচ্চ। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাতিলকৃত (দেশে আন্দোলনের পরে) ৩০১ জনের সরকারি আবাসিক প্লট প্রাপকের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, সরকার এখন কোন স্তরে নেমেছে। মানবজমিন ঃ ২০-৭-৯৯।

বিরোধী দলকে দমন করার জন্য তারা আরো বেশি করে সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করেছে। তার জন্য, "বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের পেটানো, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা, মিছিল ভেঙ্গে দেয়া এবং অন্যান্য কর্মসূচি নস্যাৎ করার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকারের সাফল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক পুলিশ বাহিনীকে দলীয় স্বার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে ব্যাপকভিত্তিক। মানবজমিন, ২০.৭. ১৯৯৯।

এসব প্রতিকূলতাকে সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রতিহত করার লক্ষ্যে বর্তমানে লড়ে যাচ্ছেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর দল বি. এন. পি.-র অঙ্গ সংগঠন এবং অন্যান্য গণতন্ত্রমনা দল।

www.nagorikpathagar.org

আবহনকালের সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের আমলের অপরাধের উচ্চমাত্রার একটি খতিয়ান ২৪-শে জুলাই ১৯৯৯ সালের দৈনিক ইত্তেফাক হতে তুলে ধরা হল। "দেশে অপরাধের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলছে। চুরি-ডাকাতি, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় তিন মাসব্যাপী পুলিশী অভিযান সত্ত্বেও অপরাধ সংঘটনের উচ্চমাত্রায় কোনো তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। পুলিশের উৎস উদ্ধৃত করে এক জাতীয় দৈনিক রিপোর্ট করছে, এবছরের (১৯৯৯) প্রথম পাঁচ মাসে নিহত হয়েছেন ১৫৭১ জন এবং বলপূর্বক আটকে রেখে বিভিন্ন প্রকার অত্যাচারের শিকার হয়েছেন ৪৯০ জন। ১৯৯৮ সালের প্রথম পাঁচ মাসে এ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩০৫ এবং ৪৬১ জন। এ সময় নারকীয় ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১২৬৪টি, যদিও গত বছরে এসময়কালে তা ছিল ৯৫৪। গত বছরে এ সময়ে সংঘটিত নারী নির্যাতনের ঘটনা ছিল ২৫১৫টি। এবছর তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩২০৩। এবছরের জানুয়ারী-মে সময়কালে অপরাধমূলক মামলা হয়েছে ৫০২৪২টি, যদিও গত বছরে এ সংখ্যা ছিল ৪৪৯২৮। সব মিলিয়ে মনে হয় সমগ্র সমাজটা তলিয়ে যাচ্ছে অপরাধ প্রবণতার অতলে, যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে নৃশংসতা, অমানবিক নির্যাতন এবং বীভৎস দুষ্কর্মের ঘন কুয়াশায়।"

হাসিনা সকল প্রশাসনকে রাজনীতিকরণের প্রয়োজনে (অবশ্য তা বাকশাল স্টাইলে ও কম্যুনিস্ট স্বভাবে) তাদের (হাসিনার বিরোধী দলের নেতৃত্বে) ১৯৯৫ সালের প্রথম দিকে "সরকার বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে যখন 'জনতার মঞ্চ' স্থাপন করা হয়, তখন গণতন্ত্রের মূল নীতিকে দুমড়ে-মুচড়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের একাংশ জনৈক শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তার নেতৃত্বে পুলিশ বিভাগের কিছু কর্মকর্তাও সেই মঞ্চে আরোহণ করে বিরোধী দলের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। কোনো গণতান্ত্রিক সমাজে এ ধরনের ঘটনা অকল্পনীয়।"

আর একারণে পুলিশ ও প্রশাসন বিভাগের সরকার ও কর্মচারীর পরস্পরের স্বার্থের প্রয়োজনে পরস্পরকে কাজে লাগানোর কারণে তারা কাজের নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলেছে; পরস্পরে পরস্পরের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার কারণে আইনের প্রতি আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়েছে এবং একই কারণে হাসিনা সরকার (ক) আইনের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধিতে সচেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারেননি। (খ) আইন ভঙ্গের কারণ বিশ্লেষণেও আগ্রহী হওয়ার ইচ্ছাও তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। খালেদা সরকারের আমলে এসব কল্পনাও করা যায়নি, হাসিনার আমলে সে কারণে এসব অনায়াসে সংঘটিত হচ্ছে— কে জানে এর পরিণতি কোথায়।

শেখ হাসিনা সংসদকে ও অন্যকে বক্তব্য দিতে না দিয়ে এবং জাতীয় প্রয়োজনে "জাতীয় ঐকমত্যের" যেখানে খুবই দরকার তা না করে তিনি সৃষ্টি করেছেন" "কিম্ভূতকিমাকার ঐক্যমতের সরকার।" এবং অন্য দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের এমপিকে ভাঙ্গিয়ে এনে সেই আদল প্রতিষ্ঠার জন্য মন্ত্রী উপমন্ত্রী বানিয়েছেন, মন্ত্রী পরিষদ দলের কাজ করছে রাষ্ট্রের কাজ না করে। ফলে "সংঘাত ও সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করে ১৯৯৮ সালে।" রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর অভিমত।

নির্যাতন ও সন্ত্রাসের যাঁতাকলে পিষ্ট জনগণ আওয়ামী লীগ সরকার ও হাসিনার সরকারের দুঃশাসনের সময়ের একটি করুণ চিত্র তুলে ধরেছে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.nagorikpathagar.org

সালের বাংলাবাজার পত্রিকা "এ সময় কিভাবে অতিক্রম করব?"-শিরোনামে। আমি এখানে তার দুঃসহ জীবনের লেখাযুক্ত অনুভূতির কিয়দংশ তুলে ধরব।

"এ সময় অতিক্রম করব কিভাবে? এযে ভয়ংকর সময়। সুনীতি ও সুরুচির সবটুকু নিঃশেষ প্রায়। সহিষ্ণুতার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। যুক্তির পরিবর্তে ক্ষমতা প্রয়োগের নগ্ন মানসিকতা আজ প্রকট। প্রজ্ঞার স্থান দখল করেছে ক্ষমতাশ্রয়ী মূঢ়তা। সভা-সমিতিতে, এমনকি জাতীয় সংসদেও অকথা-কুকথার প্রাবল্য মর্মান্তিকভাবে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে।..... দেশে আইন আছে বটে, কিন্তু নেই তার কোনো প্রয়োগ ..... বিচার বিভাগ রয়েছে, কিন্তু বিচারের বাণী নিভৃতে ক্রন্দনরত, কেননা বিচার বিভাগের নিম্ন পর্যায়ে নির্বাহী কর্তৃত্বের দাপট অপরিসীম এবং উচ্চপর্যায়ের বিরুদ্ধে নগ্ন ক্ষমতার শাণিত দন্ত নখর বীভৎস অট্টহাস্যে রত। এ সময় কিভাবে অতিক্রম করব।........সমাজ জীবনে নিরপত্তাহীনতার অনলকুণ্ডে। আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে। ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যাকাণ্ড এবং ধর্ষণের নারকীয়তা সামাজিক সুস্থতা থমকে দাঁড়িয়েছে। সহিংসতার উচ্চমাত্রা যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সামাজিক অর্জনগুলোকে গ্রাস করতে উদ্যত। কোনো পর্যায়ে সৃজনশীল আলোচনার ক্ষেত্র নেই। .... বাংলাদেশের ইতিহাসেও এ অধ্যায় রচিত হয়েছিল আর একবার ১৯৭৪—'৭৫ সময়কালে। তখনও শুনেছি, 'আমরা আইনের শাসন চাই না, বঙ্গবন্ধুর শাসন চাই। 'বঙ্গবন্ধু'-ও বলতেন, 'নকশালদের দেখলেই গুলি করো' ...... এখন প্রধানমন্ত্রী (শেখ হাসিনা) প্রশ্ন করছেন 'বিচারক এবং সাংবাদিকরা কেন জবাবদিহি করবেন না?' তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর একটু এগিয়ে বলেন, 'আমরা নই, ওরাই (সুপ্রিম কোর্টের বিচার পতিরা) দুষ্টের লালন ও শিষ্টের দমন করছে। ...... তখনকার (১৯৭৩—'৭৫) এবং এখনকার (১৯৯৬—২০০০) ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্যে অনেক মিল দেখে আরো আতঙ্কিত হই। ..... তখন নির্যাতন চলত প্রধানত রক্ষীবাহিনীর মাধ্যমে। এখন সে ভূমিকা পালন করছে দলীয় সন্ত্রাসী এবং পুলিশের কিছু কিছু সদস্য। বিরোধী দলের হরতালের সময় ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের "শান্তি মিছিলে" মুক্তিযুদ্ধকালে (১৯৭১) "শান্তি কমিটির (পাক বাহিনীর) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের 'শান্তি বাহিনীর' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৭২—'৭৫ সময়কালে কোনো নেতা আইনের শাসন অথবা গণতন্ত্রের বন্দনা করেন নি। গণতন্ত্র যে এদেশে অচল তাই তাঁরা এ 'অর্থহীন' ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করতে প্রকাশ্যে যুক্তি দেখাতেন। আইনের মাধ্যমে যে বৃহৎ কোন কিছু অর্জন সম্ভব নয় তা বলতে কেউ দ্বিধা করতেন না। এখন কিন্তু প্রকাশ্যে আইন ভাঙ্গলেও আইনের শাসনের কথা বলতে তাঁদের জুড়ি নেই। প্রধানমন্ত্রী সেদিনও রাষ্ট্রীয় তথ্য মাধ্যমে রেডিও-টিভিতে জোর দিয়েই বললেন, 'আইন তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাবে। সন্ত্রাসী যেই হোক তাকে ছাড়া হবে না। এমনকি সন্ত্রাসী যদি তার নিজের দলেও হয় তাহলেও তাকে ছাড়া হবে না।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ধরনের বক্তব্য এ ক'বছরে প্রায় ডজন চারেক বার উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু অন্য কোন ঘটনার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেডের (ইউসিবিএল) ব্যবস্থাপনা হাইজ্যাকের নির্লজ্জ ঘটনাটি স্মরণ করুন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই নরপশুর ধর্ষণ উল্লাসের কথা মনে করুন, চট্টগ্রাম ও ফেনীর গড ফাদারদের কথা ভাবুন, তাহলেই বোঝা যাবে এসব নেতা-নেত্রীরা যা বলেন তাদের কাজ যে তার থেকে কয়েক হাজার যোজন দূরের— তা বুঝতেও বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে

www.nagorikpathagar.org

না। ....১৩-ই সেপ্টেম্বরে এক হরতাল বিরোধী সমাবেশে তিনি (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) বলেন, "বি. এন. পি. আমার পদত্যাগ চায়। আমি এখনো তো আমার কাজ শুরু করিনি। ...... সেদিন বি. এন. পি. যা করেছে (সচিবালয় ঘেরাও) তা করতে দেয়া উচিত হয়নি। ভবিষ্যতে এমন কিছু করলে বি. এন. পি.-র যত বড় নেতা বা নেত্রী হোক না কেন তাকে শায়েস্তা করে ছাড়ব।" .....১৯৭২—'৭৫ সময়কালে এমনি অরাজনৈতিক রাজনৈতিক নেতাদের জন্য সমগ্র জনপদে নেমে এসেছিল দুঃশাসনের কালোছায়া। এখন আবারো তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। চারদিকে সুস্পষ্ট হচ্ছে তাদেরই লজ্জাকর কার্যক্রম। তাদের কাজেকর্মে না রয়েছে কোন ভব্যতার নিদর্শন, কথাবার্তায়ও নেই শুচিতার কোন নিদর্শন। সমাজ জীবনের সর্বস্তরে এর প্রতিফলনে তাই সবাই ভীত, সন্ত্রস্ত। এ অবস্থা আর যাইহোক কোনোরূপ সুস্থতার লক্ষণ নয়। সহিংসতার যে উচ্চমাত্রা দিনে দিনে প্রকট হয়ে উঠছে তাতে সবারই আশংকা, কোথায় গিয়ে এর সমাপ্তি ঘটবে? এই দুঃসময় কিভাবে কাটাবো আমরা।

পূর্বেই বলেছি, ১৯৯৯ সালের কল্যাণমুখী শাসন সূচকের কষ্টি পাথরে বিচার্য বা প্রেক্ষাপটে ১৯ সেপ্টেম্বরের রিপোর্টে বলা হয়, "দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ হল সবচেয়ে বেশি কুশাসিত বা অপশাসিত দেশ।" আরো বলা হয়, এর উন্নতি না হলে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে বাংলাদেশ। এসব বিবেচনা করেই ১৯ সেপ্টেম্বর ড. কামাল বলেন, "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ লংঘন করে জাতিসংঘে গিয়েছেন। সেখানে ভাষণ দিয়েছেন। তাই তিনি আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকার লংঘনকারী রূপে চিহ্নিত হয়েছেন।" এ মন্তব্য শুধু তাঁর নয়। এ দেশের প্রায় সকলের। যে স্বাধীনতা অর্জন নিয়ে বিচারপতিদের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টিপ্পনী কাটেন, "সুপ্রীম কোর্টের কোনো রায়ে স্বাধীনতা আসেনি।" তাঁরা জানেন না : স্বাধীনতার ঝড় ওঠে বিচার বিভাগ, ছাত্র ও শিক্ষকের তরফ থেকে এবং জনগণের সহযোগিতায় তা সার্বজনীন রূপ লাভ করে ও স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়।

আওয়ামী লীগের ব্যর্থশাসন ও দলীয়করণ প্রক্রিয়া এবং বাকশালী চরিত্র এবং গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রকে হত্যার মানসিকতা ও সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দানের ফলে সীমাহীন সন্ত্রাস শুরু হয় এদেশে। বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও মানবাধিকার লংঘনের চিত্র তুলে ধরে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ১৯৯৮ সালে কান্ট্রি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সূচনায় বলা হয়, "সন্ত্রাস হল রাজনীতির ব্যাপক ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক প্রচারণা এবং নির্বাচন সন্ত্রাস কবলিত। প্রায় প্রত্যেকটি নির্বাচনে রয়েছে সন্ত্রাস এবং ভোট চুরির নগ্নতা। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, "আওয়ামী লীগ সরকার তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত।"

আর এই আওয়ামী লীগকে সমর্থনকারী বুদ্ধিজীবী ও লেখক সম্পর্কে বলতে হয়, "মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই ব্যস্ত ছিলেন হয় আত্মসমর্পণে, না হয় আত্মগোপনে। এ সরকারের ক্ষতাসীন হবার সাথেই এঁদের সংশ্লিষ্টতা।" কারণ বুদ্ধিজীবীদের যে নিরপেক্ষতা দরকার, স্বীয় স্বার্থে তারা তা ভুলে গেছে। সেজন্য হাসিনা সরকার তথা প্রধানমন্ত্রীকে সমাজ ও দেশের নাজুক চিত্র তুলে ধরে তাদের সাবধান করা বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব— তা না করে রাজনৈতিক ও দলীয় কর্মীর মত সন্ত্রাসকে ঢাকার

www.nagorikpathagar.org

চেষ্টা করা যে দল, জাতি ও নিজেদের ক্ষতি— তা বুদ্ধিজীবীদেরই জানিয়ে দেয়া উচিত। তা তাঁরা নিজেদের স্বার্থে করেন না। সেজন্য, "সরকারি কর্তৃত্বে এবং অন্যান্য পন্থায় একদিকে যেমন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে সন্ত্রাসীরাও সারাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। ফলে জনজীবন আজ এক অবর্ণনীয় দুর্দশায় নিপতিত।" এটা জেনেও সঠিক চিত্র তুলে ধরে তাঁদের সাবধান করা তাঁদের জন্যই যে মঙ্গলজনক সেটা বুদ্ধিজীবিগণের বুঝিয়ে দেয়া উচিত বলে অনেকেই মনে করেন। তা না দেয়ার কারণে এবং হাসিনা সরকার নিজেদের অবস্থানকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সন্ত্রাসের যে পথ বেছে নিয়েছেন তা অভিশপ্ত "দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতার সাথে সাথে এখন পীড়িত হচ্ছে নতুন অভিশাপ সন্ত্রাসের দ্বারাও। ক্ষমতার রাজনীতির ফলে সৃষ্ট সন্ত্রাস এবং সংঘাত এভাবে হয়েছে তাঁদের উপরি পাওনা।"

আজ (১৯৯৯) "সন্ত্রাসের কালো ছায়ায় চারদিকে অন্ধকার। মাত্র ৩৩ মাসে ক্ষমতাসীন সরকারের এ ব্যর্থতা দেশকে নিমজ্জিত করেছে অনিশ্চয়তার জমাট বাঁধা এক ঘন অন্ধকারে। এ অবস্থা শুধু ১৯৭২—'৭৫ সময়কালের নির্যাতন, দুঃশাসন এবং অপশাসনের সাথে তুলনীয়।" ৩০ বছরের বাংলাদেশের রাজত্বকালে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের রক্তসাগরে সৃষ্ট তাঁর বি. এন. পি.-র আমল (জিয়া ও খালেদা জিয়ার সরকারের আমল) ছাড়া বাকী যে কয় বছর আওয়ামী লীগ ও অন্যের দ্বারা এদেশ শাসিত হয়েছে— তার একটি সন্ত্রাসের রাজত্বে আচ্ছন্ন অপরটি স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট। সে কারণে বি. এন. পি.-ও দল প্রধান বেগম খালেদা জিয়াকে দেশের প্রয়োজনে নিবেদিত প্রাণ রাজনৈতিক দল হিসেবে মনে করা উচিত। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলে যে দেশকে ভালবাসা যায় না, সন্ত্রাসী ও স্বৈরাচারী শাসনই তার প্রমাণ। বি. এন. পি.-ই মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট। আওয়ামী লীগের একাংশ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও যারা মুজিব বাহিনী তৈরির নেতৃত্ব দিয়েছে তারা এত গভীরভাবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট ছিল না— ইতিহাসই তার প্রমাণ দেয়। কারণ মুজিব বাহিনীর অধিনায়কই খন্দকার মোশ্‌তাকের সঙ্গে একত্র হয়ে বাংলাদেশে কনফেডারেশন স্টাইলে একটি সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন, একথা তৎকালীন পত্র-পত্রিকায়ও এসেছে এবং নানা তথ্য প্রমাণে জানা গেছে। শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য চেষ্টা করার কারণে রবদের সঙ্গে এব্যাপারে মনকষাকষি হয়। সেজন্য রব মুজিব সম্পর্কে যে কথা বলেছেন— তা রাজাকারদের বিরুদ্ধে বলার সঙ্গে তুলনীয়। এগুলো আমার বানানো কথা নয়, ইতিহাস থেকে পাওয়া ঘটনা।

জিয়াকে আমরা দ্য গলের সঙ্গে তুলনা করি এ কারণে যে তিনি যেমন স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়ে প্রবাসী সরকার গঠনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, জনগণকে এর ফলে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা দান করেছেন। প্রবাসী সরকার গঠনের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক, সরকারি ও সামরিক দায়িত্ব পালন করেছেন। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস জেনারেল ওসমানীর পরেই তাঁর উপর মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং মুক্তিবাহিনীকে ৩টি ব্রিগেডে ভাগ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করা হয়। অতঃপর স্বাধীনতার পর ভারতের ইঙ্গিতে তাঁকে সামরিক বিভাগের চীফ অব স্টাফ করা না হলেও দেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে চাকরী করে যান তিনি

www.nagorikpathagar.org

এবং '৭৫-এর ৭ নভেম্বরে দেশ ও রাজনীতির প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন, বাকশালের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক দল বি. এন. পি. প্রতিষ্ঠা করেন। যার উত্তরসূরী বেগম খালেদা জিয়া বর্তমানে বি. এন. পি.-র চেয়ারপার্সন ও দক্ষ পরিচালক। কাজেই সন্ত্রাসী, ধর্ষণকারী, দলীয়করণকারী সরকার এবং স্বৈরাচারী সরকার দেশে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং দেশকে অসুস্থ করে তুলেছিল— তার মাঝের জিয়া সরকার ও খালেদা সরকারই দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে সক্ষম হয়েছিল— তা আমরা ও জনগণ এখনও ভুলে যায়নি। সেজন্য সন্ত্রাস সৃষ্টির হোতারা দক্ষিণ অঞ্চলের সন্ত্রাসীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আনসার বানালেই তারা আনসার হয়ে যাবে না। দু-একজন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তি থাকলেও তাদের দ্বারা সকলকে সৎ পথে আনা সম্ভব নয়। সকলে আর নিজামউদ্দীন আউলিয়া নয়। সেজন্য এ পরিকল্পনার ফলে গড়ে সন্ত্রাসী বাড়বে বই কমবে না এবং 'গরদের চাদর' পরেই (সাধু সেজে) তারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কেউ কেউ চালিয়ে যাবে। তখন তাদের সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করাও মুস্কিল হয়ে যাবে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে দলীয় স্বার্থে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বাকশাল স্টাইলে সরকার গঠনের চেতনায় তারা নানাভাবে সন্ত্রাসীকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে আসছে।

মাননীয় স্পীকার অবশ্য সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সহায়তা করছেন না। তবু সংসদের বিরোধীদলকে সংসদীয় বিধানমতে তাঁদের বক্তব্যে বিল উত্থাপনে ও বিবিধ আলোচনায় বিধিসম্মতভাবে ও নিরপেক্ষভাবে সুযোগ প্রদান করলে, স্বাভাবিক নিয়মেই সমস্ত দেশের উপর তার প্রভাব পড়ে এবং ফলে সন্ত্রাস এমনিতেই কমে যায়। কিন্তু সংসদের স্পীকারের আচরণে তার সে লক্ষণ না থাকায় সমস্ত দেশের উপর তার প্রভাব পড়ছে। ফলে সকল ক্ষেত্রেই দেশের পরোক্ষভাবে তিনি অবনতির সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন বলে অনেকে ধারণা করে থাকেন। সম্মানিত স্পীকার তাঁর নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলার কারণে দেশের ও সমাজের মঙ্গলের পরিবর্তে ক্ষতিই হচ্ছে বেশি। অথচ তা হওয়া উচিত নয়, শোভনও নয়। —এটিও অনেকের ধারণা।

স্পীকার হিসেবে তাকে সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বলতে হয়েছে, "আমি আইন অনুযায়ী সংসদের স্পীকারের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব; আমি ভীত বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ কবির।" অথচ স্পীকার (হাসিনা সরকারের) কি এসব দায়িত্ব সততার সঙ্গে সঠিকভাবে পালন করেছেন? এ প্রশ্ন শুধু বিরোধী দলেরই নয়, সচেতন নাগরিকেরও। আর এ প্রশ্ন এজন্য যে বি. এন. পি.-র নির্বাচিত সাংসদ (১৯৯৬) ডা. মোহাম্মদ আলাউদ্দীন এবং হাসিবুর রহমান স্বপনকে হাসিনা কিম্ভূতকিমাকার 'ঐক্যমতের সরকার'-এর নামে প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী পদে উচ্ছিষ্ট ভোগী হিসেবে প্রদান করেন, যা দলের নির্দেশ লঙ্ঘন ও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের আওতায় পড়ে। এটি বিরোধী দলীয় উপনেতা ড. বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তা তিনি অগ্রাহ্য করার কারণে বিতর্কিত হন। হাইকোর্ট বিভাগে আবেদনের প্রেক্ষিতে স্পীকারের নিকট এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ বিতর্কিত বিষয়টির উপর তিনি রুলিং দান করেন এবং

www.nagorikpathagar.org

সংবিধানের ৬৬(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তার যা করা উচিত ছিল তা না করে উল্লিখিত বিষয়ে কোনো বিতর্ক দেখা দেয়নি বলে ঘোষণা দেন। "অতঃপর তাঁর এই ঘোষণা প্রথমে হাইকোর্ট বিভাগ-এর এক ডিভিশন বেঞ্চে, পরে ২৯-শে জুলাই সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ফুল বেঞ্চে প্রদত্ত এক রায়ে আইনসম্মত নয় বলে নির্দেশ দেয়া হয়। তারপরেও স্পীকার সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ফুল বেঞ্চের রায়কে ঝুলিয়ে রেখে সুপ্রীম কোর্টের নিকট আরো সময় চেয়ে চিঠি লেখেন। "পরে হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহাল থাকে। এসবই স্পীকার সাহেব করেছেন, যা তাঁর নৈতিক চরিত্রকে মসিলিপ্ত করেছে। তারপরেও তিনি ক্ষান্ত হয়ে ৬৬(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে পাঠাতে পারতেন, যা পাঠান নি। পরে অবশ্য তাঁকে পাঠাতে হলোই— অথচ প্রথমে তা স্বীকার না করাই একজন স্পীকারের নির্মল ভাবমূর্তিকে তাঁর কালিমালিপ্ত করা উচিত হয়নি। এখানে বৃটিশ পার্লামেন্টের স্পীকার সম্পর্কে বলতে হয়, "কোনো এক রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে স্পীকার নির্বাচিত হন ঠিকই কিন্তু যেদিন থেকে তিনি স্পীকারের পদে অধিষ্ঠিত হলেন সেদিন থেকে তিনি পুরোপুরি ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। বৃটিশ পার্লামেন্টের ঐতিহ্য এমনি গৌরবময়। দলের হয়েও তিনি দলীয় চিন্তার উর্ধ্বে। নিরপেক্ষতার মূর্ত রূপ স্পীকার। সমগ্র পার্লামেন্টের অভিভাবক।" যে স্পীকার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সভাপতির পদ অলংকৃত করবেন— তাঁর স্পীকারের পদে থেকে সংসদে বসে দলীয় নির্দেশে চলা লজ্জার ব্যাপার— তা তাঁর মত একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্মানজনক নয়।

কোনো স্পীকারের, সংসদ অধিবেশনে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সংসদ পরিচালনা করা উচিত নয়— যা করেছেন স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। কারণ, "সরকারি দলের নেতা-নেত্রীর দিকে চোখ রেখে সংসদ পরিচালনায় না আছে কোন দক্ষতা, না আছে ন্যায়নিষ্ঠতা। ঐ নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকেও তিনি শেখ মুজিবকে সাংবিধানিকভাবে জাতির পিতা বানাবার 'ধর্মযুদ্ধেও' অবতীর্ণ হয়েছেন। যে স্পীকারের দায়িত্ব বিতর্কের অবসান ঘটানো, তিনি নিজেই আগ বাড়িয়ে বিতর্কের সূচনা করেছেন।" যা সত্য নয় দলীয় নির্দেশে তা করার জন্য 'চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে' দেয়া একজন স্পীকারের জন্য উচিত নয়, শোভনও নয়। এ চ্যালেঞ্জ মুজিবকে জাতির পিতা সাংবিধানিকভাবে বানাতে না পারলে মি. চৌধুরী পদত্যাগ করবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু মুজিবকে জাতির পিতা বানাতে পারেন নি এবং তার জন্য পদত্যাগ করবেন বললেও পদত্যাগ করেননি তিনি।

আমাদের দেশে এবং হাসিনা সরকারের আমলে পুলিশকে দলীয়করণ করার ফলে পুলিশী নির্যাতন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুলিশ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, নারী ধর্ষণ সবই করছে, তাদের অত্যাচারে থানা হাজতে মৃত্যু ঘটে অনেকের, পুলিশ ধরে নিয়ে ধর্ষণ করে এমন ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটতে দেখা যায়। দলীয়করণের কারণে এসব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। নিজেদের স্বার্থে সরকার ও পুলিশের মধ্যে কর্মজগতের যে ব্যবধান, আমরা তা মানতে চাই না। "রাজনৈতিক দলের কর্মপ্রচেষ্টা রাজনৈতিক, কিন্তু পুলিশ বিভাগের মৌল দায়িত্ব প্রশাসনিক। রাজনীতি দলীয়, কিন্তু প্রশাসন দল নিরপেক্ষ।" বর্তমান সরকার তা মানতে চান না নিজেদের স্বার্থে। সে কারণে দেশের সুন্দর পরিবেশ সন্ত্রাসী সমাজে পরিণত হয়েছে। দলীয়করণের ঘোলা জলে তার স্বচ্ছতাকে বিষাক্ত করে ফেলেছে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের সমাজ জীবন ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি ও সন্ত্রাসের কারণে সমাজ জীবনে যে অধঃপতন নেমে এসেছে কালজয়ী নাট্যকার শেক্সপিয়রের হ্যামলেট নাটকের একটি সংলাপে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শেক্সপিয়র তাঁর নাটকের একটি চরিত্রের সংলাপে লিখেছেন, "ডেনমার্ক রাষ্ট্রে পচন ধরেছে।" বাংলাদেশের ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতন, দুর্নীতি-অনিয়ম, ক্ষমতার প্রতি সীমাহীন লোভ, দলীয়করণ ইত্যাদি দেখে আমরাও বলি এ সময় (১৯৯৯) বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পচন ধরিয়েছেন তাঁরা। এ পচন বহু আকারের, বহু রকমের সেকথা আলোচনা করেছি। লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে ১৯৯৯, জুলাইয়ের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রাজউক কর্তৃক বরাদ্দকৃত তালিকার দিকে একবার তাকান, দেখবেন ৩০১ জন ব্যক্তির নামে যে প্লট বরাদ্দ করা হয়েছে— তার মাঝে নিরপেক্ষতার নাম বিন্দুমাত্র নেই। ১১ জন আওয়ামী লীগ মন্ত্রী, ৬২ জন আ: লীগ সাংসদ এবং বাকী আ: লীগ নেতা-কর্মী। জনগণ একে "শতাব্দীর সেরা দুর্নীতি" বলে আখ্যায়িত করছেন। ঘৃণ্যতম দলীয়করণ। এসব দেখে মনে হয়, শেখ হাসিনার নীতির বালাই বলে কিছু নেই। জনগণের চাপে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত বদল করলেও এ সব কাজ কোন্ নীতিতে করা হয় তা আমার মাথায় আসে না।

গণতান্ত্রিক দেশে ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বা গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনিক নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, তা সকলেই জ্ঞাত আছেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব নীতি নির্ধারণ করেন, সমালোচনা ও আলোচনার মাধ্যমে বিরোধী দল তাতে সহযোগিতা দান করে, নীতি নির্ধারণের পর প্রশাসন কর্তৃপক্ষ তাকে বাস্তবায়ন করে। প্রশাসনের কাজ নীতিকে বাস্তবায়িত করা, সরকারি দল বা বিরোধী দলের সঙ্গে এদের কোন রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা থাকে না। নীতির সঙ্গে অবশ্য বা তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে প্রশাসনের সম্পৃক্ততা থাকবে। কিন্তু যদি নীতিকে বিসর্জন দিয়ে প্রশাসন বা সরকারি কর্মচারী পক্ষ বা বিপক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, তখনই তা হয় দলীয়করণ অথবা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া— যা কাম্য নয় এবং তা দেশের চরম অকল্যাণ সৃষ্টি করে।" আওয়ামী লীগের সেই "জনতার মঞ্চে" ফেস্‌লেস্ (faceless) আমাদের (প্রশাসন বা সরকারি কর্মচারী) মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে আহ্বান (১৯৯৬) করে রাজনীতির সাথে সরকারি কর্মকর্তাদের সরকার বিরোধী আন্দোলনে (আ: লীগ বিরোধী দলে থাকাকালে) একাত্ম করার 'অশুভ' পদক্ষেপ "কাহিনী" যা রাজনৈতিক সমাজে কাল অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

গণতান্ত্রিক বিধানে সরকার পরিবর্তন হয় কিন্তু প্রশাসন অপরিবর্তনীয়। এর কোনো পরিবর্তন নেই। সেজন্য সংসদীয় গণতান্ত্রিক বিধানে আমাদের দেশে সংবিধানে যে নিয়ম আছে তা হল যে দল সরকার গঠন করবে, তার প্রশাসনিক বিধানকে, তার পতন না হওয়া পর্যন্ত, সংবিধানের আলোকে সরকারি কর্মচারী মানতে বাধ্য। কিন্তু যদি সরকারের বিরুদ্ধে অথবা যে দল সরকার গঠন করেছে, সরকারি কিছু কর্মচারী যদি তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে ও দলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়, তখনই দেশের শাসনের চরম সংকট ও অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। বি. এন. পি.-সরকারের আমলে জনতার মঞ্চের নামে প্রশাসকগণ আওয়ামী লীগ দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই সংকট সৃষ্টি করেছিল। যা একটি জঘন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং এরূপে যে কোন দল এ সুযোগ

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণ করলে আমাদের বলার কিছু থাকবে না। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, "বিরোধী দলের (আ: লীগ) অবিবেচনাপ্রসূত ডাকে সাড়া দিয়ে জনতার মঞ্চে এসে উপস্থিত হন বেশ কিছু সংখ্যক প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যুরোক্রাটিক নামকে দুমড়ে মুচড়ে, তত দিনের গড়া প্রশাসন ব্যবস্থার সকল নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে, এক একজন ক্ষুদে রাজনীতিকের অবয়বে, লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে" আবির্ভূত হন।

সন্ত্রাসী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা সক্রিয়ভাবে পালন করেছে তৎকালীন (১৯৯৬ ফেব্রুয়ারি) বিরোধী দল আওয়ামী লীগের এবং ক্ষুদে রাজনীতিকের অবয়বে, লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে কিছু আমলা তাদের স্বার্থে দেশের মঙ্গলময় কার্যপ্রবাহের বিরোধিতা করে স্ব স্ব অবস্থান থেকে সরে এসে দেশের সর্বনাশ সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল— যার পথ ধরেই আজ সর্বনাশ, সন্ত্রাস, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদির মত জঘন্যতম ঘটনাবলী সৃষ্টির মাধ্যমে দেশটা রসাতলে যেতে বসেছে।

মনে রাখা দরকার : এসময় বি. এন. পি.-র খালেদা সরকার এটা জানতেন এবং এর পরিণতির কথা ভেবেই দেশকে রক্ষা ও ভারতের থাবার তলে যেন বাংলাদেশ বিলীন হয়ে না যায় সেজন্য শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন। তাদের এ অন্যায় কার্যকলাপে মাথা নত করেন নি। দৃঢ় হাতে এসমস্ত অন্যায়ের মোকাবিলা করে গেছেন স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। হাসিনা তাঁর পিতার প্রতিশোধ বাসনায় এত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে দেশ রসাতলে যাক, সেদিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। অবশ্য খেয়াল না থাকার কারণও আছে, তিনি বা তার পিতা নয়মাস মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করে দেশটা স্বাধীন করেননি— মায়া হবে কিভাবে। বাংলাদেশটাকে সরকারবিহীন করে সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ যে সরকার, তাকে অকার্যকর করতে চেয়েছিলেন। দৃঢ় মানসিক বলের অধিকারিণী, অক্লান্ত কর্মী, স্বামী, নিজে তথা জনগণ ও তৎকালীন দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের জীবন বাজী রাখা কর্মের ফসল স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষার জন্য সামরিক ক্যুকে (শোনা যায়) প্রতিহত করেন। (এ সামরিক ক্যু, খালেদ মোশাররফের আদলে হতো বলে অনেকে ধারণা করেন) এবং এখানে দেশটাকে সিকিমের মত ভারতের প্রদেশ করার বাসনাকে চিরতরে প্রতিহত করেন। অতঃপর খালেদা জিয়া বিরোধী দল সংসদে না আসার কারণে তত্ত্বাবধায়ক বিল পাস হতে পারেনি। এজন্য ১৯৯৬ সালে এ বিল পাস করার নিমিত্তে ও সরকারকে স্থিতিশীল করার প্রয়োজনে নির্বাচন দেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করে ১৫ দিনের মধ্যে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে তত্ত্বাবধায়কের হাতে খালেদা জিয়া ক্ষমতা অর্পণ করেন। দেশের স্বাভাবিক গতিকে ঠিক রাখার জন্য এটার এত বেশি প্রয়োজন ছিল যে তা ইতিহাসই বিচার করবে। এ কারণেও খালেদা জিয়া ও তাঁর বি. এন. পি. জনগণের এত কাছাকাছি অবস্থান করছে। জনগণ থেকে তাকে কোনক্রমেই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

শেখ হাসিনা এবার (২০০০ সালে) ন্যক্কারজনকভাবে ৮ জন সিনিয়র সামরিক অফিসারকে পাশ কাটিয়ে ৯ম ব্যক্তিকে চিফ অব স্টাফ করেন কোন্ নীতিতে তা অনেকে বুঝতে পারেন না। এক/দুই জন হলে কথা ছিল না, একে সরকারের প্রশাসনিক ব্যাপার বলেও ধরে নেয়া চলত। কিন্তু এটাকে তিনি কি বলে চালিয়ে নেবেন? কেউ যদি বলে হাসিনা দেশের ও সার্বভৌমত্বে সজাগ প্রহরী সামরিক বাহিনীকেও দলীয়করণ করতে

www.nagorikpathagar.org

চাচ্ছেন, সেটা কি খুব একটা ভুল হবে? হাসিনা ও তাঁর সরকার নিজের হীন স্বার্থে দেশটাকে কি করতে চান। দেশপ্রেমিক ও প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী যিনি দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সঠিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলেন স্বাধীনতার পথে এবং পরিশেষে তাদের সামরিক বাহিনী, জনগণ ও তৎকালীন সংগ্রামী বুদ্ধিজীবীদের কারণে যেদেশটাকে স্বাধীন করা হল, সেই অগ্রপথিক তাজউদ্দীনের সহধর্মিণী জ্ঞানী ও বিচক্ষণ অধ্যাপিকা মিসেস তাজউদ্দীনের কণ্ঠ আজ নীরব কেন? কে তাঁর কণ্ঠকে নীরব করে দিয়েছে— এসব আমার মত অনেকেরই জিজ্ঞাসা।

হাসিনা সরকারের আমলে দেশ-বিদেশে কোথাও আলোর আশা নেই— তার দু'একটি উদাহরণ (অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে) ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম পক্ষের পাক্ষিক পত্রিকা "পাক্ষিক পালাবদল" হতে "কোথাও আশার আলো নেই" হতে ক'টি উদাহরণ তুলে দিতে চাই।

১। গুলশান-বনানী-উত্তরায় আবাসিক প্লট একেবারে নিজের নিকট স্বজন, আত্মীয় ও দলীয় লোক ৩০১ জনকে দেয়ার কারণে যে আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেল তাতে তা প্রত্যাহার করলেও লজ্জাবোধ সৃষ্টি হয়নি তার।

২। হক কথা বলাতে মুক্তিযুদ্ধের বীরসেনানী কাদের সিদ্দিকীর উপর যে অত্যাচার হল তা কে না জানেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিকের উপর এমন অত্যাচার করা ঠিক হয়নি। যে শেখ মুজিবকে হত্যা করার কারণে এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দেশ ত্যাগ করেন।

৩। নতজানু পররাষ্ট্রনীতি ও সিকিমের ভাবাদর্শে ভারতকে সুবিধাদানের জন্য ট্রান্সশিপমেন্ট প্রদান একক ঘৃণ্য চক্রান্ত ভিন্ন অন্যকিছু নয়।

৪। ঢাকার গরীব ও অত্যন্ত নিম্নবিত্তদের মাথা গোঁজার স্থান বস্তি উচ্ছেদ আওয়ামী সরকারকে ধনীদের ও স্বজনদের জন্য সুরম্য অট্টালিকা সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত ছাড়া একে অন্য নামে অভিহিত করা যায় না। ১৯৯৯ সালের "আগস্টের ৮ এবং ৯ তারিখ থেকে ঢাকা মহানগরীর বস্তি উচ্ছেদ সম্পর্কে সরকারের (হাসিনা) যে সিদ্ধান্ত তা কত নির্মম কত হৃদয়হীন। এক হিসেব অনুযায়ী দেখা যায়, ঢাকা মহানগরীর প্রায় কোটি খানেক জনসমষ্টির মধ্যে অন্ততপক্ষে ৩০ থেকে ৩২ লক্ষ বসবাস করেন বিভিন্ন বস্তিতে। অন্যকথায় ঢাকার ৩ জনের ১ জন বস্তিবাসী। রিকসাওয়ালা, ঠেলাগাড়ী চালক, গৃহকর্মে নিযুক্ত কর্মী এবং গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরীতে কাজে নিযুক্ত নারী-পুরুষ। তাদের উচ্ছেদ কেন যে হাসিনা করতে চান তা আমরা বুঝি বরং কাদের জন্য করতে চান সেটাও অজানা নয়।

৫। হাসিনা ও তাঁর সরকারের স্বজনপ্রীতি দেশ-বিদেশের ভাবমূর্তি এমনভাবে ক্ষুণ্ন করেছে যে তা ভাবতেই লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে। "ক্ষমতাসীনদের স্বজনপ্রীতি (হাসিনা সরকারের), তাও সকল 'অযোগ্য', 'অপদার্থ'দের মাধ্যমে। কসোভোতে ৪৯ সদস্যের যে পুলিশ কনটিঞ্জেন্ট পাঠানো হয়েছিল অযোগ্যতার অভিযোগে তাদের ৩৬ জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। দক্ষ পুলিশ কর্মকর্তাদের ভূমিকা, তা যদি দেশের বাইরে হয়, তাহলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। কিন্তু দলীয়কারণ, আত্মীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির মাত্রা এ আমলে এত উঁচু যে, গত তিন বছরে দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে অযোগ্যতা প্রকট হয়ে উঠেছে। বিদেশে বলেই 'কসোভো' থেকে 'অপদার্থরা' ফিরে

www.nagorikpathagar.org

এলো, দেশের ভেতরে যারা বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে আসীন তাদের ভার কিন্তু দেশ বহন করতে বাধ্য হচ্ছে।" অন্যদিকে দেশের সাধারণ দেশপ্রেমিক মানুষদের যোগ্য সন্তানগণ তাদের দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির কারণে উক্ত পদে যোগদান করতে পারছেন না। ফলে দেশের ও জনগণের কত বেশি ক্ষতি করছে এ আওয়ামী লীগ সরকার— তা সহজেই সকলে বুঝতে পারছেন।

৮ জন সিনিয়রকে বাদ রেখে ৯ম জনকে সামরিক বাহিনীর প্রধান করার কারণে সামরিক বাহিনীতেও দলীয়করণ প্রক্রিয়াজাত কালচার সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তার কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলা যায়। ১৯৯৯-এর ১২-ই আগস্ট সেনাকুঞ্জে অনুষ্ঠিত একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে "এ (হাসিনা) সরকারের আমলে সামরিক বাহিনী সংস্থা ও সুবিধাগুলোকে কত ন্যক্কারজনকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, আমন্ত্রিত অতিথিদের বাছাই প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, তাও একজন, দুজন নয়,২০ জনেরও বেশি এবং বিদেশী কূটনীতিকও বাদ পড়েছেন এবং বাদ দিচ্ছেন সামরিক বাহিনীর বিশিষ্ট একটি সংস্থার কর্মকর্তা" আরো কত কি।

স্বাধীনতা উত্তরকালে এ দেশের জনগণ গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে ১৯৭০ সালে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের বিরোধিতা করেননি। কিন্তু ১৯৭২ সালে ক্ষমতায় গিয়ে ক্ষমতায় অপব্যবহার শুরু করে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার। গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র শুরু হয় মুজিবের চারপাশের মোসাহেবদের দ্বারা। এ মোসাহবদের পরামর্শে স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্রসেনা, স্বাধীন বাংলার প্রথম প্রবাসী সরকারপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে মন্ত্রিপরিষদ থেকে সরিয়ে দিয়ে গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করা হয় এবং তাকে ক্রমান্বয়ে অকার্যকর করে ফেলে বাকশাল সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করেন মুজিব ও তাঁর নিজস্ব সভাসদ। ফলে আওয়ামী লীগের গণতন্ত্রমনা ও আদর্শবান নেতা-কর্মী মুজিবের নিকট থেকে দূরে অবস্থান করতে থাকে। মোশতাক গংদের নিয়ে তিনি আরামে ক্ষমতার উচ্চ শিখর চিরদিন ধরে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষটি নাকি তাঁকে সরিয়ে দেন। পরিশেষে গণতন্ত্রকে হত্যা করে মুজিব বাকশাল নামক একটি দল মাত্র রেখে একদলীয় শাসন সৃষ্টির মাধ্যমে সকল দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৭৫ সালের প্রথমে, ৪টি খবরের কাগজ রেখে সকল পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল, বিচারকের ক্ষমতা খর্ব করা হল এবং মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হল। যার ফলে ঘটল তাদের পতন। অতঃপর গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং গণতন্ত্র রক্ষা পায়। ১৯৯৬-এর পর থেকে আজ (২০০০ সাল) পর্যন্ত মুজিবের কন্যা হাসিনার শাসনের আমলে বিভিন্ন চেহারায় একই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবারও পুনরুদ্ধারকৃত গণতন্ত্র হত্যার নানাবিধ কৌশল শুরু করেছেন হাসিনা ভিন্ন আদলে, ভিন্ন আঙ্গিকে।

১৯৯৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম পক্ষে প্রকাশিত পাক্ষিক পালাবদল পত্রিকায় বলা হয়েছে, "২৩-শে ডিসেম্বর জাতীয় দৈনিকগুলোয় প্রকাশিত ১১০ জন সংসদ সদস্যের বিবৃতি দেখুন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত চুক্তি বাতিলের দাবির পক্ষে তৎপরতার জন্যে চট্টগ্রামের ২ জন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে যে পুলিশী প্রয়াস তার নিন্দা করে ৩০০ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় সংসদের ১১০ জন সদস্য বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "সরকারি দল তাদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে নগ্নভাবে

www.nagorikpathagar.org

ব্যবহার করে দেশকে মগের মুল্লুকে পরিণত করতে চাচ্ছে। প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের ভাবমূর্তি, অধিকার ও সম্মান সম্পর্কে এ সরকারের ন্যূনতম ধারণাও নেই।'

হাসিনা সরকার ও তাঁর সমর্থিত আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রকে বিলীন, প্রশাসনকে দলীয়করণ, বিরোধী দলকে ধ্বংস করে একদলীয় প্যাটার্ণ ঐক্যমতের সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন তার একটি বিবরণ একই প্রবন্ধ হতে তুলে দেয়া হল। "বেগম জিয়ার আমলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এক সমাবেশ থেকে রক্তাক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। বেগম জিয়ার আমলের মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আব্দুল মান্নান, মীর্জা আব্বাস এবং গয়েশ্বর রায় দেশে বিদ্যুৎ সংকট সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হন। হাইকোর্ট ঐ মামলায় ঐ সব সম্মানিত ব্যক্তিদের শুধু সসম্মানে মুক্তি দেননি, ভিত্তিহীন অভিযোগে গ্রেপ্তারের জন্যে সরকারকে জরিমানাও করেন চার লক্ষ টাকা। খন্দকার মোশাররফ হোসেনও জাতীয় সংসদের একজন সদস্য।"

কোর্ট বা হাইকোর্টের এমন ন্যায় বিচারের কারণে বাকশাল সরকার হাইকোর্টের ক্ষমতা খাট ও তার প্রশাসনের অধীন করেছিল এবং বর্তমানেও হাসিনা, হাসিনা সরকার হাইকোর্টের সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন না ও হাইকোর্টের জবাবদিহিতার প্রশ্ন তোলেন, এসব নিয়ে হাইকোর্ট শেখ হাসিনা বা প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে এসব বক্তব্য থেকে বার বার বিরত থাকার নির্দেশ দান করেন।

এ প্রবন্ধে আরো বলা হয়, "গণতন্ত্র নিয়ে আমরা এত কথা বলি, অথচ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা পর্যন্ত যেখানে নির্বিঘ্নে কথা বলতে অক্ষম, অথবা, কথা বলতে গিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে বাধ্য হন, তখন সমাজে নিরাপত্তা রয়েছে কার? ক'দিন আগে সরকারের সমর্থক (১৯৯৭ সালের শেষ মাসে) দৈনিক ভোরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, হাইকোর্টের একজন বিচারক বলেছেন, "সরকার নিজেই সন্ত্রাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।" এসব আলামত যে ভাল নয় তা সকলেই বোঝেন। বিচারকের এসব কথার জন্য বোধ হয় বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার কথা তাঁরা তুলছেন।

হাসিনা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন খালেদা জিয়াকে একদিনের জন্যও শান্তিতে দেশ শাসন করতে দেবেন না। এর জন্য দীর্ঘদিন হরতাল, ভাঙ্গা-চুরা কার্যক্রম ছাড়াও সরকারকে স্থবির করার জন্য প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তাকে হাত করে জনতার মঞ্চে উঠিয়ে দিয়ে দেশটাকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছেন, কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা গণতন্ত্রের পথেই তার মোকাবিলা করেছেন এবং অন্যায় জেনেও গণতন্ত্র চর্চার প্রয়োজনে অনর্থক কাউকে বন্দী বা বিচারের সম্মুখীন করাননি। অথবা স্বাভাবিক আইনের গতিপথকে নিজে নির্দেশ দিয়ে বাধাগ্রস্ত করেন নি। আমরা বুঝে উঠতে পারি না, রাজনৈতিক নেতৃত্ব শেখ হাসিনার অহংবোধ কেন এত প্রবল, ক্ষমতালিপ্সা কেন এত বেশি, তার দলের অনেক লোকই বাকশালী আমলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় কেন, হাসিনাদের চরিত্র থেকে বাকশালী মেজাজ এখনও দুরীভূত হয়নি কেন, আবার কোন্ গণতন্ত্রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলছে। গণতন্ত্রীদের ধ্বংস করার কেন এত চেষ্টা প্রতিহিংসাপরায়ণতা তাঁদের মধ্যে কেন এত তীব্র। যোগ্য ও ইতিহাসখ্যাত লোকদের নির্মূল করার কেন এ চক্রান্ত, অযোগ্য লোকদের ও

www.nagorikpathagar.org

অগণতন্ত্রীদের ক্ষমতায় বসিয়ে বাকশালের দিকে ধাবমানের প্রবণতা তাঁদের মধ্যে এত বেশি কেন? এসব জনগণকে গভীরভাবে চিন্তা করে সরকার গঠনে কাকে সমর্থন করতে হবে— তা আজ ভাবার সময় এসেছে। সময় এসেছে খালেদা জিয়াসহ বি. এন. পি.-র সকল নেতাকর্মীকে এসম্পর্কে জনগণকে সজাগ করার। তা না হলে এদেশকে রক্ষা করতে কেউ পারবে না। এটি শুধু আবেগের কথা নয় অথবা রাজনৈতিক কৌশল অথবা বক্তব্য নয়, এ হচ্ছে বাস্তব চেতনার আলোকে এ এক সত্য অনুভূতি। একাত্তরের সত্য অনুভূতি থেকে আমার লেখা 'রক্তশপথ' নাটকের মত।

শেখ মুজিব '৭৫ সালে গণতন্ত্রকে এদেশ থেকে চিরতরে বিলুপ্ত করার অভিপ্রায়ে একদলীয় বাকশাল কায়েম করেছিলেন এবং তারই উত্তরসূরী হাসিনা গণতন্ত্রকে নির্জীব ও পরে স্তব্ধ করার জন্য গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপই শুধু শুরু করেন নি, হাইকোর্টের ক্ষমতাকে শুদ্ধ বিতর্কিত করে তুলতে চাইছেন। আর এ গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করেন স্বাধীনতার ঘোষক ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব জেড ফোর্সের অধিনায়ক জিয়াউর রহমান। অতঃপর তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলেন সরকারের আদল বদলে অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে আরো বেশি গণতন্ত্রায়ন করার মানসে ক্যাবিনেট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করেন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বেগম জিয়া। গণতন্ত্রকে সার্বজনীন রূপদান করলেন বি. এন. পি.-র চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। গণতন্ত্রের ইতিহাসে সেজন্য জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরা কারো কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে চাননি। যা বাকশাল গঠন ও হাসিনা সরকারের আমলে নানা ঘটনার মাধ্যমে করা হচ্ছে। মানুষের মৌলিক অধিকার নষ্ট করে নিজের রাজত্বকে স্থায়ী করার অপকৌশল গণতন্ত্র জগতে গ্রহণযোগ্য নয়। হাসিনা গণতন্ত্রের কথা যতই বলুক তাঁর চরিত্রে ও কার্যকলাপে গণতন্ত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। জন স্টুয়ার্ট মিল তার On liberty-গ্রন্থে লিখেছেন, "একজন ছাড়া সমস্ত মানবজাতি যদি কোন বিষয়ে একমত হয় এবং শুধুমাত্র একব্যক্তি ভিন্নমত পোষণ করেন তাহলেও মানবজাতির যেমন উচিত নয় একজনের মতকে স্তব্ধ করা, তেমনি উচিত নয় ওব্যক্তির যদি তার সে ক্ষমতা থাকে সমগ্র মানবকুলের মতকে স্তব্ধ করা।" তিনি এছাড়া আরো বলেন, "একটি মত প্রকাশকে বাধা প্রদান মানবজাতিকে লুণ্ঠনের মতো।" তাঁরা সেই লুণ্ঠনের কাজটিই করছেন। সরকারি রেডিও, টেলিভিশন আজ আ: লীগ সরকারপ্রধান ও সরকারের দলীয় প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ফলে "রেডিও- টেলিভিশনের বন্দীদশা শুধুমাত্র মায়ার উদ্রেক করে না, গণমনে জাগায় তীব্র ঘৃণাও।" এছাড়া "১৯৯৬ সালের ২৩-শে জুন ক্ষমতাসীন হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিসিদের কিভাবে অপসারিত করা হয়েছে, তাও মাত্র এক বছরের মধ্যে কিভাবে দলীয় ব্যক্তিদের দ্বারা (যোগ্য-অযোগ্য বাছবিচার না করে) ওই সব গুরুত্বপূর্ণ পদ পূরণ করা হয়েছে— জাতি তা জানে।" আর এসব আওয়ামী লীগ সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা তাঁর কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এসব করছে। সেখানে কর্তৃত্ব আছে কিন্তু দায়িত্ব নেই মোটেও। কারণ, "কর্তৃত্ব দায়িত্ববোধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েই হয় বৈধ। দায়িত্ববোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তা হয় পাশব শক্তি।" এর ফল কোনদিন শুভ হয় না। শেখ হাসিনা এভাবে গণতন্ত্রের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে তুলছেন, অন্যদিকে এ ক্ষমতার দাপটে অন্যের মৌলিক

www.nagorikpathagar.org

অধিকারকে পদদলিত করার মানসে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। "শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে আজপর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটি জনসভায়, এমনকি প্রত্যেকটি সাংবাদিক সম্মেলনে, আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন, নিজের দল এবং দলীয় নেতৃবৃন্দ ব্যতীত সকলকে। সকল বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে। বিশেষ করে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। আক্রমণ করেন অত্যন্ত অশ্লীল ভঙ্গীতে। নিম্নস্তরের শ্লেষাত্মক কথায়। আক্রমণের সময় তাঁর চোখে মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। এমন কথা নেই যা তাঁর মুখে আটকায় । তিনি সাংবাদিকদের সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন। কটূক্তি এবং অভিযোগ এনেছেন শেষপর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের বিরুদ্ধে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে।" যা গণতন্ত্রের মানদণ্ডে অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যাপার।

গণতন্ত্রের চিরন্তন রূপকে বাদ দিয়ে শেখ হাসিনা কোন্ স্বার্থে নিজস্ব আদলে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করতে চান বাকশালী অভিজ্ঞতার আলোকে, তা এখন একজন সাধারণ লোকও বোঝে। "কেন তিনি (শেখ হাসিনা) তাঁর সরকারের মূল্যায়নে ভিন্ন মানদণ্ডের (গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে নয়) কথা বলেছেন?" সেটাও জনগণ জানেন। তাই বলি গণতন্ত্র— গণতন্ত্রই। আমাদের গণতন্ত্রের রূপ ভিন্ন হয় না, যেমন হয় না তিন বাহু ব্যতীত একটি ত্রিভুজ।" যার রূপ জিয়া ও খালেদা জিয়ার সময় ছিল। কিন্তু বাকশাল আমলে গণতন্ত্রের রূপ পাল্টে যায় এবং হাসিনার আমলে পুনঃ তা নিজস্ব ভঙ্গীতে বদলানোর কথা যে কে না বলছেন তা আর কাউকে বোঝাতে হবে না। সেজন্য এ গণতন্ত্রকে যেন আর কেউ নস্যাৎ করতে না পারে তার জন্য দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সর্বদা প্রস্তুত।

আওয়ামী লীগ নিজেদের স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি হিসেবে যতই বলুন না কেন, আদতে হাসিনা বা তাঁর পিতা স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। এবং '৭১-এর মার্চের আলোকে বলা যায় মুজিবকে যাঁরা অন্ধের মত অনুসরণ করেন, তারাও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি বলে না কেউ। তাই তাঁরা আদতে ক্ষমতার জন্য ও তা চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি বলে জনগণের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছেন— সত্যকে এভাবে আড়াল করতে চাইছেন। তাদের যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা রূপে স্বীকৃতি দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ করলেই সত্যিকার রাজাকারও হয় মুক্তিযোদ্ধা। আর সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের মুক্তিযুদ্ধস্নাত দল বি. এন. পি. করলেই হয় সে রাজাকার। একাত্তরের মার্চে যে ব্যক্তি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান করে বন্দীত্ববরণ করলেন তার দল কি করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি হয় বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সেই অংশ— যার ধারাবাহিকতা হাসিনার সঙ্গে সংযুক্ত এবং স্বাধীনতার ঘোষকের মুক্তিযুদ্ধস্নাত বি. এন. পি.-এর ধারাবাহিকতা বেগম খালেদার সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই বুঝুন কোন্ ব্যক্তি ও কোন্ দল মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। হাতের কাঁকন কি আয়নায় গিয়ে দেখতে হবে? দেখলেও যে একই রেজাল্ট আসবে তা কে না জানেন। "নিজেকে পরশমণি রূপে চিহ্নিত করে আওয়ামী লীগ (তাদের সরকারের ও বিরোধী দলে থেকেও), যারাই এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে তাদের মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে (সত্যিকার রাজাকার হলেও), এ প্রক্রিয়ায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদেরও কাছে পেয়ে তাদের মুক্তিযোদ্ধারূপে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে, এমনকি মন্ত্রিপরিষদে সযত্নে

www.nagorikpathagar.org

স্থান করে দিয়ে এবং আওয়ামী বিরোধী মুক্তিযোদ্ধাদের অনেককেই, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের কোনো কোনো সেক্টর কমান্ডারদের পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী রূপে আখ্যায়িত করে যে ইতিহাস রচনা করেছে," তা যে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইতিহাস বিকৃতি— তা জনগণকে এবং বি. এন. পি.-র সকল নেতা-কর্মীকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। এবং জনগণের মাঝে ইতিহাসের এ সত্যই তুলে ধরতে হবে।

তাজউদ্দীন ও তার সমর্থক আওয়ামী লীগ ব্যতীত মুজিব ও তাঁর সমর্থক যে পাকিস্তানের ক্ষমতার শীর্ষে থেকে পাকিস্তান শাসন করতে চেয়েছিলেন, ইতঃপূর্বে সে নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এখন মনে হচ্ছে, শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনায় এত বেশি আগ্রহী ছিলেন যে ৬ দফার আদলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনও তিনি ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। আমি দৈনিক প্রথম আলো, বুধবার ১৭-ই জানুয়ারি ২০০১ সাল থেকে পকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি 'হামুদুর রহমান রিপোর্ট' হতে "পাকিস্তানিদের চোখে একাত্তরে তাদের পরাজয়" নামক প্রবন্ধ হতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে এর সত্যতা প্রমাণ করতে চাই।

ঃ রিপোর্ট বলছে, বঙ্গবন্ধুকে বলা হয়েছিল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের তোয়াক্কা না করে সহজে সংবিধান পাস করিয়ে নেবে। এর জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, না, না, আমি একজন গণতন্ত্রী এবং পুরো পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমি কেবল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে নয়। বিশ্ব জনমতের কাছেও দায়ী। আমি গণতান্ত্রিক রীতিনীতির আওতাতেই সব কিছু করব। আমি আশা করব, পার্লামেন্ট অধিবেশন শুরুর তিন বা চার দিন আগে আপনি (ইয়াহিয়া খান) ঢাকা আসবেন। তখন আমি আপনাকে খসড়া সংবিধান দেখাব। আপনি যদি এতে আপত্তিকর কিছু দেখেন, তাহলে আপনার ইচ্ছাকেও তাতে স্থান দেয়ার চেষ্টা করব।

কমিশন লক্ষ্য করছে, বঙ্গবন্ধুর এ আশ্বাসকে হাল্কাভাবে নিলেও বোঝা যায় যে, আওয়ামী নেতারা ছয় দফার ব্যাপারে অনড় থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার কথাও চিন্তা করছিলেন। এ পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার অর্থ বলতে কমিশনের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের সেই দৃষ্টিভঙ্গিকেই বুঝেছেন যাতে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের কথাই বলা হয়েছে। এটি সেই ধরনের কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা যা যথেষ্ট শক্তিশালী না হলেও তার হাতে অনেক ক্ষমতাই থেকে যেত। কমিশনের মতে, এ ধরনের কেন্দ্রীয় সরকার হলে পাকিস্তান একটি সত্যিকারের একক রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারত।

কমিশনের এ রিপোর্টের আলোকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমগ্রদেশ যখন স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত তখনও শেখ মুজিব অখণ্ড পাকিস্তানকে রেখে এবং প্রয়োজন হলে অনেক কিছু ছাড় দিয়েও পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় বসতে চান। এটিকে আমরা অবশ্যই স্বাধীনতার বিরোধী চেতনা বলেই আখ্যায়িত করব। যা মুজিবের চিন্তা ও আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে তিনি এদেশের স্বায়ত্তশাসন চেয়েছেন ৬ দফায়। প্রথম আলো—বৃহস্পতিবার ১৮-ই জানুয়ারি ২০০১ সালের কিছু

www.nagorikpathagar.org

অংশ উত্তোলিত করে বুঝাতে চেষ্টা করব, শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন চাইলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। রিপোর্টে বলা হয়—

"বঙ্গবন্ধু জেনারেল ইয়াহিয়াকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এসময় কয়েকজন শীর্ষ জেনারেলের সঙ্গে গোপন বৈঠক হয় (ইয়াহিয়ার সঙ্গে) এবং বৈঠকে বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতার নাগাল পেতে না দেয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়। ভুট্টো কমিশনকে দেয়া সাক্ষ্যে বলেছেন, বঙ্গবন্ধু নাকি তখন একপ্রকার কঠোর মনোভাব দেখান এবং ছয় দফা থেকে কোন প্রকার বিচ্যুতি একেবারেই খারিজ করে দেন। পার্লামেন্ট অধিবেশন স্থগিত করায় (প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১লা মার্চ ৩রা মার্চের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।) পূর্ব বাংলার লোকজন বুঝতে পারল যে নির্বাচনের ফল তারা যে আর ভোগ করতে পারবে না, তারই চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হয়ে গেছে। পূর্ব বাংলার জনগণ তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনাবাহিনী তলব করা হল।"

উক্ত পত্রিকায় কমিশন রিপোর্টে যা বলা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, শেখ মুজিব স্বায়ত্তশাসন চাইলেও স্বাধীনতা চান নি, জনগণের বিক্ষোভই স্বাধীনতার গর্ভযন্ত্রণা। তবে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী অংশ তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যান, কিন্তু তাঁরাও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে এগিয়ে আসেননি, বরং স্বাধীনতার এ ক্রান্তিলগ্নে মেজর জিয়াই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। প্রথম আলোর ১৯-শে জানুয়ারি, ২০০১ পত্রিকায় বলা হয়— "হামুদুর রহমান কমিশনের ঘোর সন্দেহ, জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং সামরিক উপদেষ্টারা একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার নামে প্রতারণাই করেছিল। তারা আসলে আলোচনায় কালক্ষেপণের আড়ালে পূর্ব বাংলায় একটি সামরিক অভিযান চালানোর জন্যই তৈরি। মার্চে জেনারেল ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা প্রসঙ্গে রিপোর্টে বলা হয়, তখন মোট পাঁচটি প্রস্তাব সামনে রাখা হয়। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে—

১। অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

২। পাঁচটি প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৩। আপাতত কেন্দ্রে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে না।

৪। পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে দুই অংশের জন্য প্রাথমিকভাবে দুটো কমিটি গঠিত হয়।

৫। পার্লামেন্টের অধিবেশন বসবে এবং দুই কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সংবিধান রচনা করা হবে।

এসব প্রস্তাব হয় স্বায়ত্তশাসন, না হয় confederation গঠনের প্রক্রিয়া অথবা পূর্বের অবস্থানে থেকে পাকিস্তানের ক্ষমতায় থেকে শাসনকার্য পরিচালনা। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য এর মধ্যে ছিল না। পরবর্তী আলোচনা থেকে বোঝা যায় তাজউদ্দীনসহ তাঁর সমর্থকগণ এসব কিছুই মানতে রাজী নয়, বরং তাঁরা স্বাধীনতার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন, একই তারিখের পত্রিকায় উল্লিখিত কথাগুলো সেভাবেই প্রকাশ করেন। রিপোর্টে বলা হয়—

"ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধুর এ বৈঠকের পর ১৯-শে মার্চ (৭১) ভুট্টোর কাছে একটি বার্তা পাঠানো হয়েছিল। বার্তায় বলা হয়, বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন

www.nagorikpathagar.org

এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর ঢাকায় আসা উচিত। পিপিপির কাছে প্রস্তাবগুলোর কোনটিই গ্রহণযোগ্য হয়নি। দলটির মতে, পার্লামেন্টের সদস্যদের দু'ভাগে ভাগ করলে দেশ দ্বিখণ্ডিত না হলেও কনফেডারেশনের ধারণাকেই নীতিগত সম্মতি দেয়া হবে। (ভুট্টো ঢাকায় এসে) বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টো ইয়াহিয়ার উপস্থিতি স্থলটি ত্যাগ করেন। ভুট্টোর সঙ্গে একা আলাপ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন (মুজিব)। তিনি ভুট্টোকে বলেছিলেন, পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে গেছে এবং এ থেকে উত্তরণের জন্য ভুট্টোর সাহায্য প্রয়োজন। ২৪-শে মার্চ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ বলে, তাদের চূড়ান্ত অবস্থানের কথা ইয়াহিয়াকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং আলোচনা করার মতো কিছু নেই। .... কমিশন বলেছে, একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ২৫ মার্চের পর ২৬-শে মার্চ রাত ৩টা নাগাদ আওয়ামী লীগ নিজেই একটা ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছিল।"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মার্চের আলোকে বলা যায় : তাজউদ্দীন তাঁর সমর্থকদের নিয়ে মুজিবকে পরিহার করেই স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সেজন্য কমিশন পূর্বে মুজিবের কথা বললেও পরে আর মুজিবের কথা বলেনি। আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী গ্রুপের কথাই বলেছেন। একাত্তরের মার্চ নিয়ে ইতঃপূর্বের আলোচনায় জানতে পারি : রব-তোফায়েলদের কার্যক্রমকে মুজিব মানেননি ও নানা আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তানীদের সঙ্গে আপোস ফর্মুলায় তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা ধ্বনিত হয়। বেগম মুজিব, তাজউদ্দীন, ড. কামালের আলোচনা ও ২৭-শে মার্চ হরতাল ডাকার কারণে তিনি বন্দীত্ব বরণকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন— স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে। অতঃপর হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। তবে তাজউদ্দীন গং ২৬-শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা দেননি— তা তাঁরা নিজেরাও স্বীকার করেছেন তাঁদের কার্যক্রম দিয়ে। তবে ১লা মার্চ ইয়াহিয়ার সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণায় "পূর্ব বাংলার লোকজন বুঝতে পারল যে নির্বাচনের ফল তারা যে আর ভোগ করতে পারবে না, তারই চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হয়ে গেছে। পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল।" হামুদুর কমিশন রিপোর্ট।

এ থেকে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে : প্রকৃতপক্ষে জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ও নির্বাচনের ফল তারা যে ভোগ করতে পারবে না, তাদের দাস করে রাখা হবে— এটা জেনেই স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়। বলা যায়, এটিই হল জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অলিখিত স্বাধীনতা ঘোষণা। ফলে ১লা মার্চ থেকেই রবসহ ছাত্র সমাজ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। ৯ মার্চ ভাষণে ভাসানী, কাজী জাফর, আতাউর রহমান খানসহ নেতৃবৃন্দ মুজিবকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে বলেন। রেডিও-টেলিভিশন স্বাধীনতা সঙ্গীত প্রচার করতে থাকে, পথে পথে গণসঙ্গীতে স্বাধীনতার কথা বলা হতে থাকে। ২৩-শে মার্চ স্বাভাবিকভাবে রবদের নেতৃত্বে ঢাকায় ও সারা দেশে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়। নওগাঁর বি এম সি কলেজের মাঠে উন্মুক্ত মঞ্চে ২৩-শে মার্চ ১০—১১ হাজার নরনারীর জুতা বৃষ্টির মাধ্যমে (তাদের ধিক্কার দিয়ে) রক্তশপথ নাটকে স্বাধীনতার কথা বলা ও মৃত লাশদের মাঝে স্বাধীনতার পতাকা উড়ানো হয়। লেখক অধ্যাপক খোন্দকার মকবুল হোসেন (অত্র গ্রন্থের লেখক) একই মঞ্চের দর্শক-শ্রোতা প্রকাশিত রক্তশপথের কয়েক হাজার কপি ক্রয় করে নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে রক্তশপথ অভিনয় করতে থাকে ও লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধা সৃষ্টি করে। তাজউদ্দীনকে

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে বলেও ব্যর্থ হন। চট্টগ্রামে বাংলাদেশের সামরিক বিভাগ মার্চেই মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে ও মুজিবকে সেকথা জানান হয়। তবু মুজিব ১লা মার্চ থেকে ২৫-শে মার্চ পর্যন্ত বন্দীত্ব বরণের পূর্বপর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যান— যা কোন ফলই বহন করে না। পরিশেষে জাতীয় প্রয়োজনে মেজর জিয়া ২-শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দান করেন। কোটি কোটি জনতা, ছাত্র-তরুণ, যুবক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী দলমত নির্বিশেষে এবং সামরিক বাহিনী, পুলিশ, বিডিআর, আনসারসহ সকলে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে প্রবাসী সরকার গঠনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এসব পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সম্প্রতি হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টেও সেকথা বলা হচ্ছে।

অতঃপর আওয়ামী লীগ প্রধান গণতন্ত্রের চিরন্তন রূপ পাল্টে দিয়ে নিজের স্টাইলে গণতন্ত্রকে চালাতে চায় তা আমরা ইতঃপূর্বে জেনেছি। এর ফলে অযোগ্য এ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন সংকটেও অব্যবস্থায় মিছিল, বিক্ষোভ, ঘেরাও করে চলেছেন স্বতঃস্ফূর্ত জনতা—বিনা উস্কানিতে। এ গণআন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ। ক্রমান্বয়ে তা তীব্ররূপ লাভ করেছে। সাবেক সরকারের চলতি ও অনেক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতাকে বন্ধ করে বা বিপথে চালিত করে, অর্থের অপচয় ঘটিয়েছে এরা। অপরদিকে তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে সাবেক সরকারকে দায়ী করে মাঠ গরম করে বক্তৃতা দিলেও জনগণ তা বিশ্বাস করে না। সাবেক সরকারকে দোষ দিয়ে নিজের ব্যর্থতা ও অযোগ্যতাকে যে ঢাকা যায় না— তার প্রধান উদাহরণ শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি, যা অর্থনীতিতে ধ্বস নামিয়ে রাজস্ব আয় ও সরকারি অর্থের সীমাহীন ক্ষতি করেছে আওয়ামী লীগ সরকার ও তার দলপ্রধান শেখ হাসিনা। তার সঙ্গে বাড়তি যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাস, ছিনতাই, নারী ধর্ষণ, হত্যা, লুণ্ঠন, দখলসহ সকল অপকর্ম। জনগণকে এসব ব্যাপারে অসহিষ্ণু করে তুলছে। নাটোরের মত জেলা শহরের জনগণ সরকার ও প্রশাসনের প্রতি আস্থা হারিয়ে নিজেরাই সংঘটিত হয়েছে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজদের দমনে। জনগণের এ প্রতিরোধ যেমন সরকারের ব্যর্থতাই প্রমাণ করে এবং তা গণতান্ত্রিক পথকে তাদের নিজস্ব স্টাইলে চালানোর ফলে গণআন্দোলনের পথে তা এগিয়ে যায়। হাসিনা সরকারের ব্যর্থতায় সে আলামতই দেখা দিয়েছে। পত্রিকার ভাষায় বলতে হয়, "এসব কারণে রাজনীতি এখন নেমে এসেছে রাজপথে। জনতার কল-কোলাহলের মাঝখানে গণআন্দোলন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানই (৭-ই নভেম্বর এর মত) হয়েছে বাংলাদেশ রাজনীতির নিয়ামক।" অথচ "সরকারের নেতৃস্থানীয়দের (হাসিনা প্রতিহিংসার জ্বালা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন) বুকে সঞ্চিত রয়েছে পর্বত সমান প্রতিহিংসার জ্বালা।...... জনগণ চায় এ অসহনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ। এসবই হল গণআন্দোলনের প্রকৃষ্ট উপাদান।" আর সেকারণে যতই নির্বাচন এগিয়ে আসছে জনগণ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত বি. এন. পি.-র সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে তত বেশি। সুবিধাবাদীগণ ক্রমান্বয়ে ওদের সঙ্গে (আ: লীগ) সংযুক্ত হচ্ছে এবং জনগণ সংযুক্ত হচ্ছে 'মুক্তিযুক্তস্নাত' বি. এন. পি.-র সঙ্গে। গণজোয়ারের এ ব্যাপকতা দেখে তারা ভীত হয়ে ষড়যন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছে।

সঠিক গণতান্ত্রিক পথকে অনুসরণ করেই আওয়ামী লীগ দলের মনোনীত রাষ্ট্রপতি অবশ্য নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে এক সময় বলেন, "বোঝাপড়ার জন্য প্রত্যেককেই কিছু

www.nagorikpathagar.org

ছাড় দিতে হবে। নড়তে হবে নিজের অবস্থান থেকে। তিনি জাতীয় নেতার মতোই বলেছেন, আমাদের দেশে কোনো রাজনীতিক বা রাজনৈতিক দল জীবিত থাকতে তাদের দোষ স্বীকার করবে না। নিজের অবস্থান থেকে এক ইঞ্চিও নড়বে না। অন্য কোন দল। (ইতঃপূর্বে সরকার থাকলে) ভাল কাজ করলে তার স্বীকৃতিও দেবে না। দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারলে প্রধানমন্ত্রী এখন যা বলছেন বা করছেন তা নিশ্চয়ই করতেন না। এখন শুধুমাত্র দেশের জনগণই নয়, বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীরাও উদ্বিগ্ন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভয়াবহতায় তারাও সন্ত্রস্ত।" বাংলাবাজার পত্রিকা, ২৭-শে এপ্রিল ১৯৯৯।

যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেয়া উচিত এবং কিছু বেশি দিলে তার কাজের উৎসাহ বাড়ে— কিন্তু প্রাপ্যের অধিক দিতে গিয়ে তা যদি স্তুতিবাদ হয়, তাহলে তা হয়ে ওঠে লজ্জাকর এক অভিশাপ। অনেকে এ লজ্জাকর স্তুতিবাদ পছন্দ করেন। কিন্তু সচেতন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক তা পছন্দ করেন না। কেউ যদি করে তা হয়ে ওঠে এক অবমাননাকর বোঝা। নিজে বা স্তুতিগ্রহণকারী তা বুঝতে না চাইলেও অন্যান্য সকলে বুঝে হাসাহাসি করে। সেজন্য অযাচিত প্রশংসা বা স্তুতিবাদ কোনদিনই ভাল নয়। আর যে এ তেলমর্দন করে, সে হয় তাঁর নিজের আখের গোছানো না হয় দু'পয়সা কামাইয়ের জন্য করে থাকেন। অথবা তাকে চিরদিনের জন্য ডুবিয়ে দেয়ার জন্য করেন। সেজন্য প্রশংসাব একটা মাত্রা থাকা দরকার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১–৪ সেপ্টেম্বর (১৯৯৯) ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশিয়ার আইন প্রণয়নকারীদের এক সম্মেলনে "এ্যাসোসিয়েশন অব এশিয়ান পার্লামেন্টস ফর পিস"-এর সভাপতি নির্বাচিত করায় সংসদে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এতে ধন্যবাদের স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে তা স্তুতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে সংসদ। অনেক দর্শক এতে লজ্জায় মাথা নত করেন। ৮-ই সেপ্টেম্বর (১৯৯৯) এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় যে বিবরণ দিয়েছে তার নমুনাস্বরূপ আজকের কাগজ, ১৭-ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, হতে কিছু অংশ তুলে দিলাম। "বিশ্বনেত্রী ......শেখ হাসিনা শুধুমাত্র বাংলাদেশে অথবা এশিয়াতেই নয়, 'সমগ্রবিশ্বে অনাবিল শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছেন।' কিন্তু সকলকে টেক্কা দিয়ে স্থানীয় সরকার পল্লীউন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী জিল্লুর রহমান বললেন, 'বিশ্বনেত্রী হিসেবেই শেখ হাসিনা সম্মানিত হয়েছেন।' তিনি বক্তৃতাদানকালে এমন আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বার পাঁচেক 'মহাননেত্রী' হিসেবে উল্লেখ করে সবশেষে উচ্চাবণ করেছেন 'মহামানব' এবং তুলনা করলেন ভারতের মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে, ধর্মপ্রাণ মাদার তেরেসার সঙ্গে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক আব্রাহাম লিংকনের সঙ্গে, এবং সবশেষে পণ্ডিতপ্রবর সক্রেটিসের সঙ্গে। তাঁর কথায় শেখ হাসিনার মতো মর্যাদা ও সম্মান পৃথিবীর অন্য কোনো নেতা, ব্যক্তি বা সরকারপ্রধান পাননি।" এযে সীমাহীন স্তুতি। উক্ত গান্ধী, তেরেসা, আব্রাহাম লিংকন, সক্রেটিসের মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান তার সবগুলোই শেখ হাসিনার মধ্যে বিদ্যমান। সেজন্য বোধ হয় তাকে মহামানব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ উক্ত চারজনের কেউ মহামানব নন। একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (দ:)-কে আমরা মহামানব বলে থাকি— অন্য কাউকে নয়। এ পত্রিকা যখন বিশ্ববাসী পড়বে কি ভাববেন তারা। লজ্জার মাথা খেয়ে এসব মোসাহেবি কেন করা হয়— তা আমার জানার কথা নয়। তবে এ ধরনের অবান্তর মোসাহেবি জাতির জন্য লজ্জার কারণ হয়ে উঠে।

www.nagorikpathagar.org

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্ভট ভাবে দু-একজন বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা করছিল। সে সময় কে একজন খবর দিল, শেখ হাসিনার জ্বর হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বুদ্ধিজীবী আবেগ ভরে বলেন "বাংলাদেশের জ্বর হয়েছে।" পরে তিনি ব্যাখ্যা দেন, শেখ হাসিনা মানেই বাংলাদেশ, হাসিনার জ্বর অর্থই হল বাংলাদেশের জ্বর। হায়রে মোসাহেবি। তবু তিনি জিল্লুর সাহেবকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। এজন্য সে বুদ্ধিজীবীর একারণে আক্ষেপ হয়েছিল কিনা; জানতে পারলে ভাল হতো। আমরা বলেই এসব বেহায়াপনা সহ্য করে যাচ্ছি। এরা প্রশংসায় যেমন পঞ্চমুখ, তেমনি তাদের স্বার্থবিরোধী ন্যায় কাজ হলেও বা ন্যায় কথা বললেও নিন্দায় তারা সিদ্ধহস্ত। তা না হলে রুচিহীনভাবে বিচার বিভাগকে আক্রমণ করে কি করে বলতে পারেন, "আমরা নই, ওরাই (বিচার বিভাগ) দুষ্টের লালন ও শিষ্টের দমন করছে।"

শেখ হাসিনা কাদের সিদ্দিকীকে 'পাগল-ছাগল' বলতেও দ্বিধা করেন নি। অথচ বি. এন. পি.-র নেত্রী এ ধরনের কথা কোনদিন বলেননি। অনেক মানসিক অত্যাচারের ফলে বোধ হয় 'বেয়াদব' কথাটি বলার বেশি কোনদিন এসব অগণতান্ত্রিক শব্দ বা আচরণ করেন নি। ১৯৯৯ সালের ১১-ই মে হরতালকালে এক মহিলাকে পুলিশের বিবস্ত্র করা যে জাতির জন্য কতখানি লজ্জাকর ব্যাপার ছবির মাধ্যমে তা ধরা পড়ায় সে ব্যাখ্যাও টেকেনি। তবু হাসিনা লজ্জাহীনার মত যখন বললেন, "একজন মহিলা আঁচল খুলে দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিল।.......আপনারা সকল পত্রিকায় সেই ছবি কোন্ বিবেচনায় ছেপে দিলেন। .....ওই মহিলা ওভাবে সেখানে গেল কেন।" নিজেদের লজ্জা ও দোষ ঢাকার জন্য এযে মিথ্যার অবতারণা, তা দেখে জাতির বিবেকও লজ্জায় মুখ ঢাকে।

হাসিনা, তাঁর সরকার ও তাঁর বর্তমান দলের অন্যের প্রশংসা (যা সত্য নয়), অন্যের নিন্দা করা ও অপরকে আঘাত করা তাঁদের একটি অপসংসংস্কৃতি। এটি হতে দিলে বা তার সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে জাতির একদিন ভরাডুবি হবে। সেজন্য জাতি ও জনগণকে তাঁদের নিকট থেকে দূরে থাকা দরকার বলে মানুষ মনে করে। অবশ্য এ পরিবেশ হাসিনার মধ্যেই প্রকট আকারে প্রতিভাত হয়। তাই দেখি, "জাতীয় সংসদেও যখন তিনি (হাসিনা) বক্তৃতা করেন, দেখা গেছে, অপরকে আক্রমণ না করে, বিশেষ করে বিরোধী দলীয় নেত্রী সম্পর্কে দু'চারটি কথা না বলে তিনি বক্তৃতা শেষ করতে পারেন না।" অথচ তাঁর প্রশাসনের অপরাধ, পুলিশ কর্তৃক সাংসদ প্রহৃত এসব প্রশ্ন সাংবাদিকরা তুললে কোন মন্তব্য করেন না তিনি। করলে অপর পক্ষের দোষ আবিষ্কার করেন। "বিদেশে শান্তির পতাকা হাতে নিয়ে, বিদেশ থেকে ফিরে সংঘাতময় রাজনীতির আবর্তে মিশে যাওয়াই খুব সম্ভব তাঁর নিকট স্বাভাবিক" হওয়ার কারণ বা তার এ দুমুখো নীতি। নির্বাচনের সময় তসবী হাতে ভুল করেছি, বলে ক্ষমা নিয়ে ক্ষমতায় এসে, তার চেয়েও কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ, নির্বাচনী ওয়াদা করে তা পালন না করা, গণতন্ত্রের কথা বলেও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সবসময় অবস্থান গ্রহণ— এসব হাসিনার ওয়াদা বরখেলাপ তা বলা যাবে না। ইসলামী পরিভাষায় মোনাফেকী বলা হবে অথবা এসব করবই, সব জেনে শুনে জনগণ ভোট দেয় বলে থাকেন— ভোট কারচুপি করার পর এসবকে কি নামে অভিহিত করা যায়। আপনারাই বলবেন, আমি ব..তে চাই না। ইচ্ছামত কাজ করে দেশের কাজ করছি বলে যতই গলা ফাটাক না কেন— জনগণ তা জানে। "বিশ্বময় গণতন্ত্রায়নের এ প্রবল প্রবাহের

www.nagorikpathagar.org

যুগেও কিন্তু জমিদারী মানসিকতা যে একান্তভাবে অচল, আধুলির মতো অচল, তা অনেকে বুঝেও বোঝেন না। বোঝেন না আমাদের প্রধানমন্ত্রীও (১৯৯৬—২০০০)।"

বিদেশী সার্টিফিকেট সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠ (১ অক্টোবর ১৯৯৮) বলে, "অবিশ্বাস এবং সন্দেহের এ বিরাট সমুদ্রে অন্যেরা (বিদেশ) যা বলল, তাই হয় নির্ভরযোগ্য 'লাইট হাউস'। সার্চলাইটটা নিজের দিকে না ফেলে...... দূরের— বহু দূরের কাউকে খুঁজে ফিরি যেন তারা অভয়বাণী দিয়ে আমাদের আশ্বস্ত করে। এ কারণে বিদেশী সার্টিফিকেটকে এত মূল্যবান মনে করি।" এ সার্টিফিকেটের করুণায় আমরা গদ্‌গদ চিত্ত হলেও জাতির কপোল মসিলিপ্ত হয়ে উঠে। মাদার তেরেসা-সক্রেটিসের সমতুল্য না হয়েও নিজেকে তেরেসা বা সক্রেটিস মনে করা বা মোসাহেবের স্তুতিতে তেরেসা-সক্রেটিস বনে যাওয়া এক লজ্জাকর করুণা, তা আমরা বুঝতে চাই না। এযে কত বড় আত্মপ্রবঞ্চনা, তা কে নেতাদের বোঝাবে? যাদের বুঝ মানবেন তাঁরাই স্তাবক হয়ে দুধে ভাতে আছে। ভারতের আঙ্গাবাড়ী এসব দাসদের স্বরূপ উদঘাটন করলেও তাঁদের জ্ঞানের চোখ খোলে না। ভারতের অনুগতরা বাংলাদেশকে সিকিম বানানোর ষড়যন্ত্র করছে বলে আমরা স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী হয়ে দেশটাকে আগলে আছি, আগলে আছে স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী জনগণ এবং তাদের দেশনেত্রী স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী বেগম খালেদা জিয়া এবং বি. এন. পি.-র নেতা-কর্মী। দেশটা তাঁদের দ্বারা ধ্বংস হোক, সার্বভৌমত্ব নষ্ট হোক তা চাই না বলে, আমাদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। এখন পাক-প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সহজ কিন্তু সংলগ্ন আগ্রাসী ও লোলুপ প্রতিবেশীর থাবা থেকে আমাদের দেশকে বাঁচাতে হবে, আমাদের বাঁচতে হবে। তা সত্যিই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতিহাস সচেতন নেতৃত্বই দেশকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ইতিহাস চেতনাবোধের অভাব হলে সে নেতৃত্ব দেশের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তা অদূরদর্শী নেতৃত্বের জন্ম দেয়। সেজন্য প্রত্যেক জাতির ও জাতির কর্ণধারদের ইতিহাস সচেতন হতে হয়। একটি জাতি ইতিহাস সচেতন তখনই হবে, যখন তার নেতা হতে হয়। একটি জাতি ইতিহাস সচেতন তখনই হবে। যখন তার নেতা-কর্মী ইতিহাসের আলোকে নিজেকে আলোকিত করে জাতির দায়িত্ব পালন ও দেশের কর্ণধাব হয়ে কাজ করবেন। অন্যথায় দেশের কল্যাণ সাধন তার দ্বারা সম্ভব হবে না। সে কারণে ঐতিহাসিক ঘটনা বা ইতিহাস থেকে ইতিহাসের আলোকে আলোকিত হওয়া যায় এবং ইতিহাস সচেতনতা জন্মলাভ করে। তা ইতিহাস বিকৃতি থেকে আসে না, আসতে পারে না। আমাদের দেশের স্বাধীনতা লগ্নকাল থেকে একদল ইতিহাস বিকৃতিকে মূলধন করে দেশের শাসনভার গ্রহণ করছে, অপর দল ইতিহাসের আলোকে আলোকিত হয়ে জনগণ— অর্থাৎ সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে দেশকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র পুনঃপ্রদান ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত থেকেছে এবং তারই উত্তরসূরিগণ একই দায়িত্ব পালন করে দেশের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত আছে। ইতিহাস বিকৃতির পথে এগিয়ে এসেছেন শেখ মুজিব ও তাঁর উত্তরসূরি তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনা ও তাঁর দল। স্বাধীনতার পরেই ইতিহাসের আলোকে আলোকিত আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রবাসী সরকারপ্রধান তাজউদ্দীন ও তাঁর অনুসারীদের সে কারণে মন্ত্রিপরিষদ থেকে বিতাড়িত করে। ইতিহাস বিকৃতিকে নিষ্কণ্টক

www.nagorikpathagar.org

করে তুলেছেন। অপরদিকে ইতিহাসের আলোকে আলোকিত ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি স্বাধীনতার ঘোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা, সফল রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমান ও তারই উত্তরসূরি বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর দল জাতিকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সেকারণে যারা দেশকে সিকিম বানাতে চায়, তাদের হাত থেকে রক্ষার জন্য তাঁরা মরণ-পণ সংগ্রাম করে চলেছেন।

৪ মে, ১৯৯৮ সালে মানবজমিন পত্রিকাটি দেশের সম্পদ সম্পর্কে দেশকে সচেতন করে দিয়েছেন এবং ইতিহাস বিকৃতিকারী ও ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন শক্তির হাতে দেশের সম্পদ বন্টন ও ব্যবহারের কর্তৃত্ব থাকলে সুফল বয়ে আনবে না— এমন কথা উক্ত পত্রিকার শিরোনামে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আভাসিত করেছে। উক্ত শিরোনামে দেখি, "বদরুল ইমাম ১৯৮৬ সালে বাপেক্স কর্তৃক হরিপুর তেলক্ষেত্র আবিষ্কারের পরে পি এস সি-চুক্তির মাধ্যমে একটি বিদেশী তেল কোম্পানীর হাতে তুলে দেয়া যে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী ছিল, তা উল্লেখ করেন।....... তার মতে, ব্লক ৯, ১০ এবং ১১ দেশীয় অনুসন্ধানী সংস্থা বাপেক্স-এর জন্য সংরক্ষিত রাখা উচিত এজন্য যে, সম্ভাবনাময় দেশীয় সংস্থাটি জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে গ্যাস ও তেল প্রযুক্তির মাধ্যম হিসেবে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে এবং আবিষ্কৃত গ্যাস ও তেলের শতকরা একশত ভাগ মালিকানা নিশ্চিত করবে। এসব ব্লক বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলে দিলে এসব কোম্পানী তাদের প্রধান চালিকাশক্তি মুনাফার (Profit) দিকে লক্ষ্য রেখে জাতীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনে মনোনিবেশ করবে এবং অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী প্রক্রিয়ায় রপ্তানীর মাধ্যমে জটিলতা যেমন সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় সম্পদের অপচয়ের পথ প্রশস্ত করে বাংলাদেশকে ঘিরে ষড়যন্ত্রেরও সূচনা করতে পারে। ..... সবকিছু পরের হাতে তুলে দেবার ঔদার্য ব্যক্তিগত। সমষ্টিগত পর্যায়ে কিন্তু জাতীয় স্বার্থই প্রধান নিয়ামক। মোগল সম্রাটদের ব্যক্তিগত উদারতার ছিদ্রপথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সুযোগ পেয়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তসীমায় শেকড় বসাতে। এসব ঘাঁটিই কালক্রমে মীরজাফর, জগৎশেঠদের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হয়।" পরিশেষে সিরাজদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরদেশের হাতে চলে যায়। আমাদের ভয় এখানেই করিডোর, পার্বত্য চট্টগ্রামের ফাঁকা দিয়ে এদেশে তাদের ঘাঁটি গড়ার যে সুযোগ হাসিনা ও তাঁর সরকার করে দিল, তার পথ ধরেই চলবে ভারতের ষড়যন্ত্র, যেমন ভারতের ঘাঁটি গাড়ার সুযোগ করে দিয়েছিল মি: দর্জী সিকিমে, পরে ভারতের ঘাঁটি থেকে ষড়যন্ত্রের শুরু হয় এবং পরিশেষে ভারত সিকিমকে তার অঙ্গরাজ্যরূপে একটি প্রদেশে রূপান্তরিত করে। হাসিনা ভারতের জন্য যা করছে সেপথ ধরে চলছে বাংলাদেশকে ভাতের অঙ্গরাজ্য করার ষড়যন্ত্র ; আর আমাদের ভয় এখানেই। হাসিনা ইতিহাসকে বিকৃত করে মিথ্যা ইতিহাস সৃষ্টির মাধ্যমে ইতিহাসের আলোকে আলোকিত না হয়ে অন্ধকারে পথ চলছেন, তাই এ ভয় আরো বেশি এবং ভয়ংকর। তাই আমাদের সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে পথ চলতে হবে। খালেদা জিয়া নিরলসভাবে এপথে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সেকারণে দেশের মঙ্গলের প্রয়োজনে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। "ইতিহাসের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠিগত (দলীয়) স্বার্থে অন্ধ, সমষ্টিগত স্বার্থ সম্বন্ধে

www.nagorikpathagar.org

উদাসীন মীরজাফর নিজে হয়েছেন চরমভাবে নিন্দিত এবং সমগ্র জনপদকে পদদলিত হবার পথ করেছেন প্রশস্ত।" সিরাজের পর মীরজাফর ক্ষমতায় এসে এমনিভাবে দেশকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে ইতিহাসের মীরজাফর অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক হয়ে রইলেন। খালেদার সরকারের পর আবার যেন আর একটি মীরজাফর অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক এসে দেশটাকে ভারতের হাতে তুলে দিয়ে দেশটাকে সিকিম না করে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। আমাদের দেশে একগুচ্ছ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের মত ভারতের হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। "বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মীরজাফর শুধু একটি ঘৃণ্য ব্যক্তি বলেই চিহ্নিত হননি, অনেকেই ছিলেন তার সঙ্গে, প্রায় দুশো বছর ধরে এ বিশাল জনসমষ্টিকে পরাধীনতার শেকল পরে থাকতে হয়েছে। আত্মদান করতে হয়েছে— অসংখ্য স্বাধীনতাপ্রিয় মানব সন্তানকে। তাঁদেরই ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং আত্মদানের আগুনে পুড়ে জাতীয় পতাকা হয়েছে রক্তে রঞ্জিত।" আর এদেশের স্বাধীনতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য জিয়াকে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হয়েছে, স্বাধীনতার জন্য রক্তশপথ নাটক লিখতে হয়েছে, মার্চে পতাকা উত্তোলন করতে হয়েছে তরুণদের, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, বেগম খালেদা জিয়া দেশ ও জাতির কথা চিন্তা করেই, প্রতিশোধের জ্বালা নিয়ে নয়, রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন, দেশের ও জাতির প্রয়োজনে এবং তাঁর স্বামীর ঘোষিত বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে অটুট ও পরদেশীর হাত থেকে রক্ষার জন্য বি. এন. পি. দলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একবারও তিনি উচ্চারণ করেননি তাঁর স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে ক্ষমতায় এসেছেন— বরং দেশের মঙ্গল সাধনের ব্রত নিয়ে তাঁর দলে ও ক্ষমতায় আসা। কিন্তু হাসিনার স্বভাবে তা লক্ষ্য করা যায় না। তা বাংলাদেশের মাটিতে পা দেয়া থেকে এখন পর্যন্ত নানাভাবে নানা কৌশলে বলে চলেছেন। দেশের প্রচলিত আইনে যে কোন হত্যার বিচার হতে কারো আপত্তি নেই। কিন্তু তার সঙ্গে ব্যক্তিগত আক্রোশের জ্বালা যখন যুক্ত হয় এবং এজন্য হত্যাকারীদের সঙ্গে সমগ্র জাতিকে কটাক্ষ করে কথা বলা হয়, তখনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাতি ও দেশ। তাই "যে উগ্র প্রতিহিংসাপরায়ণতা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে পেয়ে বসেছে— তা কিন্তু স্বাভাবিক নয়। তিনি রাজনীতিতে এসেছেন শুধু প্রতিশোধের জ্বালা জুড়াতে,— এই মানসিকতা অস্বাভাবিক। এ অস্বাভাবিকতার কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতি আজ কক্ষচ্যুত, দিকভ্রষ্ট, হিংসাপ্রবণ, সর্বোপরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ..... তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সংকল্প কত মারাত্মক কত অরাজনৈতিক।" দৈনিক দিনকাল— ২৩-শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯।

আমরা জানি, এসব কারণে শেখ হাসিনা সরকারপ্রধান হয়েও ব্যক্তি ও দলের উর্ধ্বে উঠে জনগণের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন নি। কারণ সরকার পরিচালনায় "সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় জনগণের দাবীর প্রতি একাত্মতা এবং গণইচ্ছাকে ধারণ করার সক্ষমতা। ..... প্রধানমন্ত্রী জনগণের প্রধানমন্ত্রী (হাসিনা) না হয়ে রয়ে গেছেন আওয়ামী লীগের নেত্রী। শুধু তাই নয়, সরকারি কর্মকর্তাদের বিশেষ করে পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের রূপান্তরিত করেছেন দলীয় কর্মীরূপে। দলীয় স্বার্থের বাইরে

www.nagorikpathagar.org

তাদের দৃষ্টি বিন্দুমাত্র প্রসারিত হয়নি।" ফলে দেশের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস আরও কত কি।

অত্যন্ত খোলামেলাভাবে বিদেশের এককালের প্রধানমন্ত্রী গুজরাল আন্তর্জাতিক শালীনতার মাথা খেয়ে কি করে বলতে পারেন, "এক শুভ নক্ষত্রের প্রভাবে" আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে। তিনি আরও বলেন, "১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর আবারো শুভ দিনের সূচনা করেছে।" এটি কি স্টেট টু স্টেট সম্পর্ক, নিদেনপক্ষে স্টেট টু গভর্ণমেন্ট সম্পর্কেও নয়, যা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গ্রহণীয় নয়। গুজরাল আরো নিচে নেমে স্টেট টু পার্টি ও স্টেট টু ম্যান পর্যায়ে নেমে এসেছেন— সিকিমের দর্জীর মত। কারণ ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে মনে করে না। বিচার করে তাদের পছন্দমত দল সরকার গঠন করে বাংলাদেশে শাসনকার্য পরিচালনা করবে এবং তাদের ইঙ্গিতে একটি প্রদেশের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকবে। সেজন্য অন্য দল ক্ষমতায় যাক তা তারা পছন্দ করে না এবং ক্ষমতায় গেলে তারা ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়। আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে তারা "উঁচুমানের সাফল্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে" চিহ্নিত করে। দেশের জনগণ এ লজ্জাকর ও অধীনতামূলক আচরণ থেকে মুক্তি চায়। সেজন্য হাসিনা সরকারকে জনগণ এখন আর সহ্য করতে পারছে না। এ সরকারের আমলে ভারতের অবৈধ পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ, অর্থনীতিকে দেউলিয়া করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, বিধ্বস্ত হয়েছে আমাদের অর্থনীতি। "আর এসব কিছুই আই কে গুজরালের প্রিয় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের শাসনামলে তারা বাংলাদেশকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশকে চেনে না তারা, বানরের লেজের আগুনে লঙ্কা পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল, বাংলাদেশের বুকের জ্বালায় যে আগুন জ্বলবে— তা কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ হিন্দু মৌলবাদী রাষ্ট্রকে পুড়ে ছারখার করে দিতে পারে। সেজন্য খালেদা জিয়ার যে আহ্বান তাতে সাড়া দিয়ে State to State or State to People সম্পর্ক বজায় রাখুন। লঙ্কাকাণ্ডের ইতিহাস তো আমাদের চেয়ে আপনাদেরই ভাল জানা আছে। অতএব সাবধান।

আর একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। ভারতের মানসিকতাকে ও তাদের লালসাকে সমর্থন করে পরকীয়া প্রেমিকার মত একটি দল যেভাবে ভারতের সুচতুর চাহনিতে ভুলে আত্মসমর্পণের চেতনায় অস্থির তা থেকে বাঁচার জন্য জনগণের উচিত চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করা এবং এজন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। "কারো কারো মতে, জাতীয় নিরাপত্তা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে অবিলম্বে দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে চীনের মতো পারমাণবিক শক্তিতে শক্তিমান কোনো মহাশক্তির সাথে বাংলাদেশের জোটবদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা ভারতের মতো আধিপত্যবাদী আগ্রাসী শক্তি যে কোনো অজুহাতে বাংলাদেশের সর্বনাশ ঘটাতে পারে।" মানবজমিন—২২ জুন, ১৯৯৮। তবে প্রো-ইন্ডিয়ান বা প্রো-পাকিস্তানী না হয়ে আমাদের বন্ধু খুঁজতে হবে এ দুই পরাশক্তির বাইরে। কারণ এ দুই পরাশক্তির তাঁবেদার এ দেশে সক্রিয় থাকার কারণে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও সার্বভৌমত্বের প্রতি তারা হুমকি হয়ে অবস্থান করছে।

www.nagorikpathagar.org

আওয়ামী লীগ সরকারের আর একটি শ্লোগান হল তারা নিজেদের স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি বলে মনে করে, আর সব বিপক্ষ শক্তি। তারা বুঝতে পেরেও একথা বলে বেড়ায়। আদতে আওয়ামী লীগের তাজউদ্দীনসহ একাংশ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় থাকলেও শেখ মুজিব ও তাঁর উত্তরসুরি শেখ হাসিনা ও তাঁদের অনুসারিগণ আদতেই স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি নয়। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি সমগ্র জনগণ, সেজন্যই মুক্তিযুদ্ধের রক্তসাগরে স্নাত বি. এন. পি. স্বাধীনতার সম্পৃক্ত শক্তি। জামাতে ইসলামী ব্যতীত আওয়ামী লীগ বিরোধী সকলেই মুক্তিযোদ্ধা, কিছু ব্যতিক্রমী বুদ্ধিজীবী ও মানুষ ছাড়া। এ বিভাজন সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগ সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য একথা প্রচার করলেও জনগণ তা জানে। জনগণ জানে '৭১-এর মার্চে শেখ মুজিবের কার্যক্রমের কথা। ২৫-শে মার্চে বন্দীত্ববরণের কথা। হাসিনার এ প্রচারে আর কিছু না হোক প্রশাসনের সকল সংস্থায় বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে, বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, বুদ্ধিজীবী মহলে, ধর্মীয় অঙ্গনে, যা রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফলে দেশের ও জাতির জীবনে নেমে এসেছে সংকট ও বিবিধ সমস্যা।

আওয়ামী লীগ সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে পূর্ববর্তী সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়। তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও তাদের ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে বলে চার/সাড়ে চার বছর ধরে তারা যে মাঠ গরম করা বক্তৃতা দিচ্ছে— প্রথম দিকে কেউ কেউ একথা বিশ্বাস করলেও, এখন সকলে বুঝেছে বর্তমান (১৯৯৬—২০০১) সরকারের এটি ভাঁওতাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার এক অপকৌশল মাত্র। এদের অপরাগতা, ব্যর্থতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাস, রাহাজানি, হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই, লুট আরও কত কি। পররাষ্ট্রনীতিতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। ভারতপ্রীতির যে উদাহরণ তারা সৃষ্টি করেছে তাতে সকলে হতবাক ও লজ্জিত হয়ে পড়েছে। খালেদা জিয়ার আমলের উন্নয়নের ধারাকে বৃদ্ধি করা দূরে থাক, তাকে স্ব-স্থানে ধরে রাখতে পারেননি হাসিনা, বরং তার নিম্নগতির কারণে জনগণের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিশেষে আমি একথা বলতে চাই আজকের স্বাধীনতা ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সহস্র বছরের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মহান ফসল। তবে যুগে যুগে এর আঙ্গিকগত পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে। এ পরিবর্তন পরাশক্তির হিংস্রতা ও সর্বগ্রাসী চেতনার কারণ। এ সর্বগ্রাসী চেতনায় আত্মাহুতি দিয়েছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা। ইংরেজদের আগ্রাসী থাবা বিস্তারকে প্রতিহত করতে গিয়ে স্বাধীনতার অগ্রদূত সিরাজকে প্রাণ দিতে হল। মীরজাফর, জগৎশেঠের দল বিশ্বাসঘাতকতা করল। এ বাংলাদেশী জাতীয়তার আঙ্গিকে শোভা পেত বৃহৎ বাংলা, যার ব্যাপ্তি ছিল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা পর্যন্ত। এরও পূর্বে এ দেশের বাংলা ভাষার ব্যবহার সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে বন্ধ করে দিয়েছিল বাংলাদেশের মৌলবাদী বর্ণহিন্দু শাসক সেনরাজাগণ। তারা এদেশের মাতৃভাষাকে অপবিত্র জ্ঞান করে তা রাজভাষা বা রাজদরবার থেকে শুধু দূরেই রাখেনি, ধর্মের ভয় দেখিয়ে এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি পিপাসু জনগণকে এদেশের

www.nagorikpathagar.org

জনগণের জীবন ও এদের সংস্কৃতিকে লেখার মাধ্যমে আলোকিত করতে দেয়নি। ফলে দশম থেকে দ্বাদশ সাল পর্যন্ত এদেশের মানুষকে অন্ধকারে থাকতে হয়। সেজন্য সেকালকে অন্ধকার যুগ বলা হয়ে থাকে। মুসলমান শাসকগণ দ্বাদশ শতাব্দীতে এদেশ জয় করে নিয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং এ জাতীয়তাবাদের পথ ধরেই বাংলা ভাষা এদেশের রাজদরবারে স্থান পায়।

ভারতের বর্ণহিন্দু প্রতিষ্ঠিত আধিপত্যবাদী শিক্ষিত মৌলবাদী ব্রাহ্মণ্য সমাজ ইংরেজ শাসনকার্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে এসে ইংরেজদের সুনজরে আসেন এবং তারাই ইংরেজদের পরামর্শ দিয়ে এবং ইংরেজ রাজত্বের ধূর্ত ইংরেজ কর্মকর্তাদের সঙ্গে থেকে ভারতে মুসলিম বিরোধী চেতনার সৃষ্টি করেন। ইংরেজগণ দেখলেন এককালের শাসক মুসলমানদের এদের সহযোগিতায় দমন করতে হবে। অপরদিকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ দেখলেন একদিন না একদিন ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থানে এবং তাদের ধর্মের উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতার কারণে ভারতে স্থায়িভাবে তারা বসবাস করবে। কাজেই একজাতিসত্তার কথা তুলে ইংরেজদের সহযোগিতায় মুসলমানদের ভারত থেকে বিতাড়িত করা যায় কিনা— ভেবে দেখ। ইংরেজ শাসক অত্যন্ত ধূরন্ধর ছিল। তারা বর্ণহিন্দুদের এ মনোভাবের কথা জানতো— আর জানতো বলেই নিজেদের প্রয়োজনে ভারতের প্রদেশ বা আঞ্চলিক বিদ্রোহে এদের ব্যবহার করতো। এছাড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজ সকলকে দাস করে রাখার কারণে ও তা থেকে বেরিয়ে এসে যেন তাদের আধিপত্যবাদ থেকে মুসলমানদের সহযোগিতায় স্বকীয় আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম না হয় সেজন্য মুসলমানদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখার এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় বর্ণহিন্দু সমাজ ও বুদ্ধিজীবিগণ। তারা দেখেছে যে কোন অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ভারতের শূদ্র সমাজ মুসলমানদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছে। সিরাজদ্দৌলা, টিপুসুলতানদের শুধু মুসলমানই সাহায্য করেননি, হিন্দু সম্প্রদায়ও তাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন। সেজন্য মুসলমানদের উচ্ছেদ করতে পারলে এসব শূদ্র হিন্দু বা হিন্দু জনগণ তাদের শাসনের বাইরে যেতে পারবে না। ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ব্যতীত স্বদেশীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হবে না। তাদের আর একটি কৌশল ছিল স্ব-অঞ্চলের জাতি বলতে হিন্দু জাতি, মুসলমান জাতি নয়, বুদ্ধিজীবীরাও এ চেতনা নিয়ে কাজ করতেন। সেজন্য বাঙ্গালী বলতে তারা হিন্দুদের বুঝাতেন, মুসলমানদের নয়। তাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতেও সে ভাষা ব্যবহার করা হতো। তাদের লেখায় দেখি, "বাঙ্গালী ও মুসলমানদের মধ্যে খেলা হচ্ছিল।" অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানদের খেলাকে তারা এভাবে প্রকাশ করত।

এ ধারণার বশবর্তী হয়ে বালগঙ্গাধর তিলক দক্ষিণ মারাঠার অত্যাচারী বর্গীপ্রধান শিবাজীকে কলকাতায় সর্বভারতীয় জাতীয় নেতা বলে প্রকাশ ও প্রচার করে 'শিবাজী উৎসব'-এর প্রচলন করতে চান। অবশ্য নটরাজ গিরীশচন্দ্রের কারণে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তিনি তাঁর নাটক "নবাব সিরাজদ্দৌলা" লিখে প্রকাশ ও মঞ্চায়নের মাধ্যমে প্রমাণ করেন, নবাব সিরাজদ্দৌলা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নেতা; অন্য কেউ নয়। জনগণও তা সমর্থন কর। তিলকের সর্বভারতীয় জাতীয় নেতাকে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন

www.nagorikpathagar.org

তিরোহিত হয়। বাংলাদেশ আক্রমণকারী বর্গী শিবাজী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ফলে বিতাড়িত হন। তবুও ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। সেকালের বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাস বিকৃতিকারিগণ বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদকে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এখনকার তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের মতই বিলীন করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করতে থাকেন।

১৯০৫ সালের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে কলকাতার রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সমাজ সেবকগণ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সেটাও বর্ণহিন্দুদের স্বার্থের প্রয়োজনে ও তাদের রাজনৈতিক স্বার্থেই সংঘটিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসও তাদের সেই মৌলবাদী প্রেরণাজাত একটি উপন্যাস। তখন অবশ্য বাংলাদেশের মুসলমানদের বিশেষ করে পুর্ব ও উত্তরবঙ্গের বিভক্তিকে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বিভক্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। যার সত্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। তবে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন যদি নিরপেক্ষ হতো বা অসাম্প্রদায়িক হতো তাতে কোন আপত্তি ছিল না। আপাতত অন্য কেউ যেন না বুঝতে পারে সেজন্য একে যতই অসাম্প্রদায়িক বলুক না কেন, আদতে কলকাতাকেন্দ্রিক এ আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক ছিল না। প্রথমত সর্বভারতীয় জাতীয়তার নিরিখে সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনার আলোকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়েছিল। যেন ভারতীয় জাতিসত্তার বা বর্ণবাদী জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠাই ছিল সে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। সেজন্য হয়ত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" তৎসঙ্গে সর্বভারতীয় চেতনার বহি:প্রকাশ ঘটে রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতা 'শিবাজী উৎসব' লেখায়। এটি রবীন্দ্রনাথের দ্বৈত চেতনার ফসল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখিত নাটক 'শাজাহান'–নাটকের দর্শনে ও গানে সর্বভারতীয় চেতনাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা যতই সোচ্চার ভাষায় উচ্চারণ করুক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাংলাদেশী জাতিসত্তা ও অসাম্প্রদায়িক ভাবধারায় পরিচালিত হয়েছিল। না—তা ছিল না। তাহলে তারই পথরেখায় আমরা আজ অবিভক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ পেতাম যা পরিপূর্ণ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আলোকপুষ্ট বাংলাদেশ হতো। এ বাংলাদেশ পেলে হয়ত আজ বাঙালি ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নিয়ে অত বেশি করে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন পড়ত না। যা আজ সেটাই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার ছিল, তারাই সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাসিম, মওলানা ভাসানী, শরৎবসু, চিত্তরঞ্জন দাসদের অবিভক্ত বাংলা স্থাপনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। ১৯৪৭ সালের প্রথম মাসগুলেতে তাঁরা যখন অবিভক্ত বাংলার স্বাধীনতা দাবী করেন, তখন ১৯০৫ সালের উত্তরসূরি হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীসহ কংগ্রেস ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতারা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব ভেঙ্গে ভারত-পাকিস্তান করতে চান। তাঁরা বাংলাদেশকে পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। অবিভক্ত বাংলার বেশির ভাগ সদস্য অবিভক্ত বাংলার পক্ষে রায় দিলেও হিন্দু সাংসদগণ (সামান্য বাদে) বিপক্ষে রায় দেন। এর আসল কারণই হলো একজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত শাসিত হলে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজন নেই, কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে হলে অবশ্যই বাংলাদেশকে ভাঙ্গতে হবে। বহুজাতিতত্ত্বের পথ

www.nagorikpathagar.org

উন্মুক্ত করা যাবে না। কাজেই তাঁদের দর্শন পূর্ব-পাকিস্তান (তৎকালীন) বা বর্তমান বাংলাদেশকে সিকিমের মত অঙ্গীভূত করা।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানের নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দী, ফজলুল হক, ভাসানী, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিব, এ্যাডভোকেট মনসুর, শামসুল হক প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তানকে ঠিক রেখে এদেশের স্বায়ত্তশাসনের জন্য এগিয়ে যান। '৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন, '৫৪ সালের নির্বাচনে কিন্তু তরুণ সমাজ সেটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান এবং ভাসানী, তাজউদ্দীন স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে থাকেন। অলি আহাদ, ভাষা মতিন, গাজীউল হকেরাও ভাষা-আন্দোলনের মাঝ দিয়ে সে পথে এগিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও '৭০-এর নির্বাচন মুজিবকে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে স্থির রাখেন, ফলে অগ্রসরমান জনগণের সঙ্গে মুজিবের পার্থক্য বা ব্যবধান বাড়তে থাকে। তাজউদ্দীন-ওসমানী জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন।

ইয়াহিয়া ক্ষমতা না দেয়ায় মুক্তিযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে। জিয়া তাঁর আবাল্যের জ্বালা ও বৈষম্যজাত আঘাতের কারণে চট্টগ্রামে সামরিক অফিসার ও সেপাইদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তাঁর স্বাধীনতা বিরোধী চেতনার কারণে '৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে মুজিব বন্দীত্ববরণ করলে জিয়া কালবিলম্ব না করে তাঁর সামরিক বাহিনীদের নিয়ে কালুরঘাট রেডিও কেন্দ্রে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করে এবং তৎপর তাজউদ্দীনের প্রধানমন্ত্রীত্বে প্রবাসী সরকার গঠিত হয় এবং মুক্তিবাহিনীর মাধ্যমে পাকবাহিনীকে সরিয়ে দেয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ওসমানী এ মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং ভাসানী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান হয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬-ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

পরবর্তিকালে ৭০-এর নির্বাচিত প্রধান মুজিবকে ক্ষমতাদানের পর ১৯৭২–৭৫ দেশে দূর্ভিক্ষ, হত্যা, ধর্ষণে দেশ ভরে যায় এবং মুজিব ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য একদলীয় বাকশাল শাসন প্রবর্তন করে সকলের সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করেন। অতঃপর ৭৫-এর ৭-ই নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে জিয়াকে বন্দীমুক্ত করে তাঁর কাছে বাংলাদেশের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। জিয়া গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারসহ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পথে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। পরে খালেদার নেতৃত্বে স্বৈরশাসক এরশাদকে সরিয়ে দিয়ে গণভোটের মাধ্যমে জিয়ার উত্তরসূরি বি. এন. পি.-এর চেয়ারপার্সন স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসেন ও জিয়ার উন্নয়নের ধারাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান এবং পূর্ণ গণতন্ত্র প্রদান করেন।

ড. এমাজউদ্দীন— 'জিয়া : জাতীয় জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়'-প্রবন্ধে বলেন, "জিয়া এ মাটির শ্রেষ্ঠতম সন্তানদের একজন। স্বাধীনতার ঘোষণা দান এবং তাও এমন এক সময়ে, প্রকৃত প্রস্তাবে জাতি যখন সম্বিতহারা অবস্থায়, মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম সৈনিকদের অন্যতম, জেড ফোর্সের সংগঠক, ৭-ই নভেম্বরের পরে বাংলাদেশ রাজনীতির প্রধান রূপকার জিয়া এ জাতির ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একটি

www.nagorikpathagar.org

উজ্জ্বল অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের ডাইরীতে জিয়া নিজেই লিখেছিলেন, জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা কখনও মুছে যায় না। স্মৃতি থেকে সে ঘটনা যদি হয় একটি যুদ্ধের। যদি তা হয় একটি স্বাধীনতাযুদ্ধের, তখন স্মৃতি হয় একটি জীবন্ত ইতিহাস। "স্বাধীনতাযুদ্ধের বীর সেনানী জিয়াউর রহমানের স্মৃতিও আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। তাঁকে স্মরণ করি গভীর শ্রদ্ধার সাথে।"

বেগম খালেদা জিয়া ও বি. এন. পি. এ দেশের আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে আপোসহীন নেত্রীর মত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। সরকারে থাকাকালে এবং বিরোধী দলে অবস্থান কালেও এদেশে তাঁর সংগ্রামী ও ইতিহাসের ঘটনাগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আমি খালেদা জিয়ার রাজনীতি হতে এ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। "রাজনীতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার পদক্ষেপ সঠিক এবং সঠিক বলেই খালেদার উচ্চারণ আজ হয়েছে জনগণের সুস্পষ্ট উচ্চারণ। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ মূর্ত হয়েছে— খালেদা জিয়ার সরব ও সুস্পষ্ট কণ্ঠে। এ রাজনীতির ছন্দপতন হয় না। স্তিমিত হয় না। স্তিমিত হয় না এর গতি। এ রাজনীতিই কালে বিজয় স্তম্ভ স্পর্শ করবে।"

এসব আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে হয় বি. এন. পি. স্বাধীনতাযুদ্ধের রক্তসাগর ও মুক্তিযুদ্ধের অনলকুণ্ডের জ্বালা নিয়ে উঠে আসা এক মুক্তিযুদ্ধস্নাত রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দল— যা স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া কর্তৃক সৃষ্ট এবং তিনি যার কাণ্ডারী। এ দলেরই উত্তরসূরি গণতন্ত্রের মানসকন্যা বেগম খালেদা জিয়া, বি. এন. পি.-র চেয়ারপার্সন। এ দলকে ধারণ করে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র-শিক্ষক, কর্মজীবী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, কৃষক, মজুর, নর-নারীসহ দেশের সকল জনগণ। এদেশের জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের পথে এ-দল এগিয়ে যাবেই— এ-দল যে অমৃতের ফসল। এ কে রুখবে সে সাধ্য কারো নেই।

❑

www.nagorikpathagar.org

"স্বাধীনতাযুদ্ধের আলোকে জিয়া খালেদা : বি. এন. পি." গ্রন্থ রচনায় সহযোগী গ্রন্থ : প্রবন্ধ : পত্র-পত্রিকাপঞ্জী—

গ্রন্থপঞ্জী

১। জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ— সম্পাদক : ড. এমাজউদ্দীন আহমদ— প্রথম প্রকাশ— ২০০০।

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ— ড. এমাজউদ্দীন আহমদ— প্রথম প্রকাশ— বই মেলা— ২০০০।

৩। আঞ্চলিক সহযোগিতা জাতীয় নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রবন্ধ— ড. এমাজউদ্দীন আহমদ— প্রথম প্রকাশ— ১৯৯৯।

৪। বাংলাদেশ : সমাজ এবং রাজনীতির চালচিত্র— ড. এমাজউদ্দীন আহমদ— প্রথম প্রকাশ— ২০০০।

৫। স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী আমরা— সম্পাদক, অধ্যাপক খোন্দকার মকবুল হোসেন।

৬। আধুনিক রাষ্ট্র— আর এম ম্যাকাইভার, অনুবাদক— ড. এমাজউদ্দীন আহমদ— বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ—১৯৯৬।

৭। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিল পত্র (১ম খণ্ড হতে ১৬ খণ্ড) সম্পাদক, হাসান হাফিজুর রহমান।

৮। Bangladesh Document—vol.2

৯। সেক্টর কমান্ডাররা বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা—সম্পাদক, শাহরিয়ার কবির।

১০। জিয়াউর রহমান স্মারক গ্রন্থ— সম্পাদক, রুহুল আমিন।

১১। স্বাধীনতার ঘোষণা স্মারক গ্রন্থ— সম্পাদক, এস এম বিপাশ আনোয়ার।

১২। একাত্তরের দিনগুলি— জাহানারা ইমাম।

১৩। বাংলাদেশ : এলিগেসি অব ব্লাড— এ্যান্থনী ম্যাস কার্পহাস : অনুবাদ— বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ, অনুবাদক— মো: শাহজাহান।

১৪। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস— মোহাম্মদ হান্নান।

১৫। সংস্কৃতির সংকট— বদরুদ্দিন উমর— প্রকাশকাল—১৯৬৭।

১৬। ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ ও কতিপয় দলিল— বদরুদ্দিন উমর।

১৭। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম— রফিকুল ইসলাম।

১৮। যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস— আবুল হাসেম চৌধুরী।

১৯। বাংলাদেশ : সাম্প্রতিককালের রাজনীতির গতি—প্রকৃতি, প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ।

প্রবন্ধপঞ্জী

১। ভূমিকা— বেগম খালেদা জিয়া : গ্রন্থ— জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ।

২। মুখবন্ধ— ড. এমাজউদ্দীন আহমদ : গ্রন্থ— জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ।

৩। একটি জাতির জন্ম— জিয়াউর রহমান (রাষ্ট্রপতি)।

৪। আমাদের পথ— জিয়াউর রহমান (রাষ্ট্রপতি)।

৫। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ— জিয়ারউর রহমান (রাষ্ট্রপতি)।

৬। স্বাধীন জাতির স্বাধীন উপলব্ধি— জিয়াউর রহমান (রাষ্ট্রপতি)।

৭। বিশ্বরাজনীতিতে রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমান— অধ্যাপক শাম্‌স-উল-হক।

৮। জননেতা জিয়াউর রহমান— দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ।

৯। জিয়াউর রহমান—আমার সাক্ষ্য— জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান।

১০। আরেকটি জিয়াউর রহমান চাই— অধ্যাপক ড. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী।

১১। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ— খোন্দকার আব্দুল হামিদ।

১২। শিক্ষাঙ্গনে শহীদ জিয়ার অবদান— সৈয়দ আলী আশরাফ।

১৩। শহীদ জিয়া ও গণশিক্ষা— ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

১৪। মেজর জিয়া— স্বাধীনতার ঘোষণা— আলহাজ্জ কর্ণেল ওলি আহমদ।

১৫। শহীদ জিয়াউর রহমান : একটি মূল্যায়ন— অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা।

১৬। যে আদর্শের বিকল্প নেই — অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ।

১৭। প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান— অধ্যাপক মুহাম্মদ আফসার উদ্দীন।

www.nagorikpathagar.org

১৮। মৃত জিয়ার দাপট— মাহবুব আনাম।
১৯। আরেক জিয়াউর রহমান— আখ্‌তার উল আলম।
২০। সাংবাদিকদের প্রিয় জিয়া— রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ।
২১। জিয়া : আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি— আমানুল্লাহ করিম।
২২। মানুষ ও নেতা শহীদ জিয়াউর রহমান— এম রেজাউল করিম।
২৩। শহীদ জিয়া স্মরণে— লে. জেনালের (অব:) মাহবুবুর রহমান।
২৪। জাতি গঠনের মহানায়ক শহীদ জিয়া— সাদেক খান।
২৫। জিয়া শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব— অধ্যাপক কে এ এম শাহাদত হোসেন মণ্ডল।
২৬। দরকার মেধাবী নেতৃত্ব— কর্নেল (অব:) আকবর হোসেন।
২৭। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান— একটি মূল্যায়ন।
২৮। অভিশপ্ত সার্কিট হাউজ— ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা।
২৯। কালজয়ী জিয়া ও জাতীয়তাবাদে উত্তরণ— মেজর জেনারেল (অব:) জেড এ খান।
৩০। স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণতা — অধ্যাপক সাঈদ-উর-রহমান।
৩১। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ— অধ্যাপক জসীম উদ্দীন আহমদ।
৩২। বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন— ১৯৯৪।
৩৩। ইতিহাসের জিয়া বনাম মুজিবের ইতিহাস— অধ্যাপক মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার।
৩৪। জিয়া : স্বাধীনতার ঘোষক ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তক— কাজী সিরাজ।
৩৫। জিয়াউর রহমান : স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ধারাবাহিক নাম — ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী।
৩৬। জিয়াউর রহমানের বৈদেশিক নীতি— ড. তারেক শামসুর রহমান ।
৩৭। একজন প্রেসিডেন্ট— সৈয়দ আবদাল আহমদ।
৩৮। জিয়ার উৎপাদনের রাজনীতি : গ্রাম সরকার— মেজর (অব:) মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান।
৩৯। জিয়াউর রহমানের অর্থনৈতিক দিক-নির্দেশনা— অধ্যাপক হারুন-অর রশিদ খান।
৪০। শহীদ জিয়া— এ কে এম শাসুল বারী মিঞা মোহন।
৪১। জিয়া এক ভয় তাড়ানিয়া নাম— শেখ নুরুল ইসলাম।
৪২। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান : এক টুকরো স্মৃতি—হোসেন মাহমুদ।
৪৩। ৭-ই সভেম্বর : জিয়াউর রহমান এবং নবধারা— মুন্সী আবদুল মান্নান।
৪৪। শহীদ জিয়া : স্বাধীনতা ঘোষণা ও প্রাসঙ্গিক ইতিহাস— ঋদ্ধি আকতার নওয়াজ।
৪৫। বাংলাদেশ কেঁদেছিল— সামাদ সরকার।
৪৬। স্বপ্নদ্রষ্টা জিয়া— খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ।
৪৭। স্বাধীনতার ঘোষণা ও শহীদ জিয়া— ড. মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ।
৪৮। এই কাননের ফুল— আনোয়ার জাহিদ।
৪৯। আমার শিক্ষক— তারেক রহমান।
৫০। বাংলাদেশে গণতন্ত্র এবং জিয়া— প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ।
৫১। সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী— মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম।
৫২। আমাদের সংস্কৃতি — আমাদের রাজনীতি— আমাদের কথা— অধ্যাপক খোন্দকার মকবুল হোসেন।
৫৩। নিরাপদ বাংলাদেশ— ২৬ শে মার্চের প্রত্যাশা— প্রফেসর ডক্টর কে এ এম সাহাদত হোসেন মণ্ডল।
৫৪। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা— বাংলাদেশের কি লাভ হবে?— প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ।
৫৫। ইসলাম এবং মানবাধিকার— প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ।
৫৬। একুশে ফেব্রুয়ারী— প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ।
৫৭। মুক্তিযোদ্ধারাই এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান— ড. এমাজউদ্দীন আহমদ।
৫৮। আমাদের প্রবহমান রাজনীতিকে বুঝতে হলে— ড. এমাজউদ্দীন আহমদ ।
৫৯। জীবনের শেষ নেই— প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ।

www.nagorikpathagar.org

সহযোগী পত্র-পত্রিকাপঞ্জী

ক ঃ ১। জনকণ্ঠ — ১২ মে, ১৯৯৮
২। জনকণ্ঠ — ২২ জুন, ১৯৯৮
৩। জনকণ্ঠ — ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৩
৪। জনকণ্ঠ — ১২ মে, ১৯৯৮

খ ঃ ১। দিনকাল — ৩ জুন, ১৯৯৮
২। দিনকাল — ২১ জুন, ১৯৯৮
৩। দিনকাল — ১৭ এপ্রিল, ১৯৯৮
৪। দিনকাল — ২ অক্টোবর, ১৯৯৮
৫। দিনকাল — ৭ নভেম্বর, ১৯৯৮
৬। দিনকাল — ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮
৭। দিনকাল — ২৪ মার্চ, ১৯৯৯
৮। দিনকাল — ৫ এপ্রিল, ১৯৯৯
৯। দিনকাল — ৯ এপ্রিল, ১৯৯৯
১০। দিনকাল — ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৯
১১। দিনকাল — ৭ মে, ১৯৯৯
১২। দিনকাল — ৩০ এপ্রিল, ১৯৯৯
১৩। দিনকাল — ২১ মে, ১৯৯৯
১৪। দিনকাল — ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯
১৫। দিনকাল — ৩০ মে, ১৯৯৯
১৬। দিনকাল — ৭ জুন, ১৯৯৯
১৭। দিনকাল — ১১ জুন, ১৯৯৯
১৮। দিনকাল — ২৫ জুন, ১৯৯৯
১৯। দিনকাল — ২৯ জুন, ১৯৯৯
২০। দিনকাল — ৯ জুলাই, ১৯৯৯
২১। দিনকাল — ১৫ জুলাই, ১৯৯৯
২২। দিনকাল — ২৩ জুলাই, ১৯৯৯
২৩। দিনকাল — ৩০ জুলাই, ১৯৯৯
২৪। দিনকাল — ৫ আগস্ট, ১৯৯৯
২৫। দিনকাল — ৬ আগস্ট, ১৯৯৯
২৬। দিনকাল — ১৩ আগস্ট, ১৯৯৯
২৭। দিনকাল — ১৪ আগস্ট, ১৯৯৯
২৮। দিনকাল — ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮
২৯। দিনকাল — ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮
৩০। দিনকাল — ২৭ আগস্ট, ১৯৯৯
৩১। দিনকাল — ১৭ সেপ্টেম্বর; ১৯৯৯
৩২। দিনকাল — ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯
৩৩। দিনকাল — ৯ অক্টোবর, ১৯৯৯
৩৪। দিনকাল — ১৬ অক্টোবর, ১৯৯৯
৩৫। দিনকাল — ২০ অক্টোবর, ১৯৯৯
৩৬। দিনকাল — ১৩ নভেম্বর, ১৯৯৯
৩৭। দিনকাল — ২৬ মার্চ, ১৯৯৯

গ ঃ ১। ইনকিলাব — ১১ নভেম্বর. ১৯৯৭
২। ইনকিলাব — ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
৩। ইনকিলাব — ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

www.nagorikpathagar.org

৪। ইনকিলাব — ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
৫। ইনকিলাব — ১২ এপ্রিল, ১৯৯৮
৬। ইনকিলাব — ৯ নভেম্বর, ১৯৯৭
৭। ইনকিলাব — ৩ মার্চ, ১৯৯৮
৮। ইনকিলাব — ১১ জুন, ১৯৯৮
৯। ইনকিলাব — ১৪ জানুয়ারি, ১৯৯৮
১০। ইনকিলাব — ৯ নভেম্বর, ১৯৯৮
১১। ইনকিলাব — ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৮
১২। ইনকিলাব — ১১ জুলাই, ১৯৯৮
১৩। ইনকিলাব — ১৬ মে, ১৯৯৮
১৪। ইনকিলাব — ২৮ মে, ১৯৯৮
১৫। ইনকিলাব — ১৫ জুন, ১৯৯৮
১৬। ইনকিলাব — ২৭ জুলাই, ১৯৯৮
১৭। ইনকিলাব — ১০ আগস্ট, ১৯৯৮
১৮। ইনকিলাব — ১৭ আগস্ট, ১৯৯৮
১৯। ইনকিলাব — ২৪ মার্চ, ১৯৯৯
২০। ইনকিলাব — ২১ এপ্রিল, ১৯৯৯
২১। ইনকিলাব — ১৬ জুন, ১৯৯৯
২২। ইনকিলাব — ১৮ জুন, ১৯৯৯
২৩। ইনকিলাব — ৪ জুলাই, ১৯৯৯
২৪। ইনকিলাব — ৯ আগস্ট, ১৯৯৯
২৫। ইনকিলাব — ২০ আগস্ট, ১৯৯৯
২৬। ইনকিলাব — ২ আগস্ট, ১৯৯৯

ঘ ঃ ১। আজকের কাগজ — ৭ নভেম্বর, ১৯৯৮
২। আজকের কাগজ — ১৭ মার্চ, ১৯৯৯
৩। আজকের কাগজ — ২৫ মার্চ, ১৯৯৯
৪। আজকের কাগজ — ১৯ এপ্রিল, ১৯৯৯
৫। আজকের কাগজ — ২৪ মে, ১৯৯৯
৬। আজকের কাগজ — ১৮ জুন, ১৯৯৯
৭। আজকের কাগজ — ৮ জুলাই, ১৯৯৯
৮। আজকের কাগজ — ২২ আগস্ট, ১৯৯৯
৯। আজকের কাগজ — ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯
১০। আজকের কাগজ — ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯
১১। আজকের কাগজ — ২৬ অক্টোবর, ১৯৯৯
১২। আজকের কাগজ — ১ নভেম্বর, ১৯৯৯
১৩। আজকের কাগজ — ১১ এপ্রিল, ১৯৯৯
১৪। আজকের কাগজ — ৫ জুন, ১৯৯৯
১৫। আজকের কাগজ — ২০ মার্চ, ২০০০

ঙ ঃ ১। ভোরের কাগজ — ১৯ জুন, ১৯৯৫
২। ভোরের কাগজ — ২২ মার্চ, ১৯৯৯
৩। ভোরের কাগজ — ২২ মে, ১৯৯৯
৪। ভোরের কাগজ — ১৮ জুলাই, ১৯৯৯

চ ঃ ১। মানবজমিন — ২ মার্চ, ১৯৯৮
২। মানবজমিন — ৪ মে, ১৯৯৮
৩। মানবজমিন — ২২ জুন, ১৯৯৮

www.nagorikpathagar.org

৪। মানবজমিন — ৯ আগস্ট, ১৯৯৮
৫। মানবজমিন — ১৫ মার্চ, ১৯৯৯
৬। মানবজমিন — ৬ এপ্রিল, ১৯৯৯
৭। মানবজমিন — ২৪ এপ্রিল, ১৯৯৯
৮। মানবজমিন — ১৫ মে, ১৯৯৯
৯। মানবজমিন — ২২ মে, ১৯৯৯
১০। মানবজমিন — ১২ জুন, ১৯৯৯
১১। মানবজমিন — ৯ জুলাই, ১৯৯৯
১২। মানবজমিন — ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮
১৩। মানবজমিন — ৮ আগস্ট, ১৯৯৯
১৪। মানবজমিন — ২০ জুলাই, ১৯৯৯
১৫। মানবজমিন — ৬ নভেম্বর, ১৯৯৯
১৬। মানবজমিন — ৫ এপ্রিল, ২০০০

ছ ঃ ১। আজ ও আগামীকাল — ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৮

জ ঃ ১। দৈনিক করতোয়া — ৬ জানুয়ারি, ১৯৯৬

ঝ ঃ ১। দৈ: সোনার বাংলা — ৩ নভেম্বর, ১৯৯৬

ঞ ঃ ১। ইত্তেফাক — ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮
২। ইত্তেফাক — ১১ অক্টোবর, ১৯৯৭
৩। ইত্তেফাক — ৩ জানুয়ারি, ১৯৯৯
৪। ইত্তেফাক — ১১ জুলাই, ১৯৯৯
৫। ইত্তেফাক — ২৪ জুলাই, ১৯৯৯
৬। ইত্তেফাক — ২৮ মার্চ, ১৯৯৯
৭। ইত্তেফাক — ৮ মার্চ, ২০০০

ট ঃ ১। বাংলাবাজার পত্রিকা — ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯
২। বাংলাবাজার পত্রিকা — ২৬ মার্চ, ১৯৯৯
৩। বাংলাবাজার পত্রিকা — ২৭ এপ্রিল, ১৯৯৯
৪। বাংলাবাজার পত্রিকা — ২১ আগস্ট, ১৯৯৯
৫। বাংলাবাজার পত্রিকা — ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯
৬। বাংলাবাজার পত্রিকা — ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯
৭। বাংলাবাজার পত্রিকা — ৬ নভেম্বর, ১৯৯৯

ঠ ঃ ১। পাক্ষিক পালাবদল — ১৫ জানুয়ারি, ১৯৯৮
২। পাক্ষিক পালাবদল — ১৫ মার্চ, ১৯৯৮
৩। পাক্ষিক পালাবদল — ১৫ জুলাই, ১৯৯৯
৪। পাক্ষিক পালাবদল — ৩১ জুলাই, ১৯৯৮
৫। পাক্ষিক পালাবদল — ৩১ জুলাই, ১৯৯৯
৬। পাক্ষিক পালাবদল — ৩১ আগস্ট, ১৯৯৯
৭। পাক্ষিক পালাবদল — ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

ড ঃ ১। মুক্তকণ্ঠ — ১ অক্টোবর, ১৯৯৮
২। মুক্তকণ্ঠ — ৭ নভেম্বর, ১৯৯৮

ঢ ঃ ১। আমরাও আসছি — ২৬ মার্চ, ১৯৯৯

ণ ঃ ১। সাপ্তাহিক রোববার — ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

ত ঃ ১। যুগান্তর — ৬ এপ্রিল, ২০০০
২। যুগান্তর — ১২ মার্চ, ২০০০
৩। যুগান্তর — ১৭ এপ্রিল, ২০০০

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তাসলীমা বিনতে মুহাম্মদ
www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার

রীমা বিনতে মুজাহিদ

www.pathagar.com